আজ শুভদিনে

শক্তিপদ রাজগুরু

ভৈরব পুস্তকালয়
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট. কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
সাহিত্যমালা
৯৮/২, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া
১২ আশ্বিন, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ :
সত্য চক্রবর্ত্তী

মুদ্রক :
ভৈরব মুদ্রণ
৪৫, মাণিক বোস ঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বড়বাড়িটা আজ নতুন সাজে সেজেছে।

নহবৎ বসেছে, দেউড়ির মাথায় দারোয়ান শোভা সিংয়ের শোভাও আজ বেড়ে গেছে। মাথায় হলুদ পাগড়ী, পায়ে তেল চকচকে জুতো পরে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে গোঁফে চাড়া দেয়।

দেউড়ি পার হয়ে কাঁকর-ঢালা পথটা চলে গেছে সামনের সদর কাছারির দিকে, একপাশে পড়ে অন্দর-মহলের পথ। এখানে বাগানটারও রূপ বদলেছে।

ওদিকে বিরাট আয়োজন চলেছে। লোকজন যাতায়াত করছে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে।

সদর নায়েব গোবিন্দপদ, সরকার বিষ্টুচরণ সকলেই হৈ-চৈ করছে। একপাশে একজন আমলা বসেছে। মহাল থেকে আসছে ভার-বন্দী দই, বাঁক-বন্দী মাছ। রাশি রাশি আনাজপত্র।

অনেক খাতক প্রজারাও এটা-সেটা পাঠিয়েছে। সদর আমলা খাতায় লিখে চলেছে হেঁকে হেঁকে।

—গদাধর সামন্ত, সাং কোত্‌লুপুর—দহি দুই বাঁক। পত্তনিদার মনোহর মুখুটি, সাং ঐ—মাছ একমণ। নীলু দে, সাং কৃষ্ণবাটি—মাছ দুইমণ, আলু তিনবস্তা।

বিষ্টু সরকার বলে চলেছে সদর নায়েবকে দেখে,

—ওহে মতিলাল, সব ঠিকঠাক লিখো, খাজনার বেলায় সেই মত ওয়াশীল দিতে হবে বাবা। এ খাওয়া তো খাওয়া নয়, ওগরাতে হবে।

ওদিকে অন্দর থেকে মানদা ঝিকে বার হতে দেখে এদিক-ওদিক চেয়ে বিষ্টু সরকার ওই দিকেই এগিয়ে যায়।

মানদা এ-বাড়ির বেশ জাঁকিয়ে-বসা ঝি, অন্দরের অন্যতম কর্ত্রীই বলা যায়। সানাই-এর স্বর উঠেছে সারা বাড়িতে। লোকজনের কলরব মিশেছে তার সঙ্গে। বিরাট বাড়িখানায় ফুটে উঠেছে উৎসব-মুখর একটি পরিবেশ। মানদার কাজ বেড়ে গেছে। একটু দম ফেলবার সময় নেই। এরই মধ্যে সে রঙীন পাছাপাড় শাড়ি পরেছে; গায়ে হালকা গোলাপী রং-এর ব্লাউজ।

মুখটি পানের রসে রাঙা ওর মনের খুশিভরা অবস্থাটার মতই। নিটোল দেহে একটা বিচিত্র লাস্য ; মানদাও এই আনন্দের দিনে সেজেছে।

বিষ্টু সরকার বলে,

—দুটো পান দে মানদা ! বেশ লাগছে তোকে কিন্তু।

ওর ভালো লাগে, তবু মানদা খিঁচিয়ে ওঠে,

—পান কোথায় পাব যখন-তখন ?

বিষ্টু রসিকতা করে ওঠে,—তোর ঠোঁট তো রাঙা হয়েই আছে।

মানদা কি জবাব দিতে গিয়ে থামল, নায়েব গোবিন্দপদ চটিজুতোর শব্দ করতে করতে এইদিকেই আসছে। বিষ্টু সরকার তখনই গলা তুলে হাঁক দেয় বেশ মাতব্বরী চালে। ও যেন এই সব কাজ নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে।

—ওহে মদন, যারা জিনিসপত্র আনছে, অতিথিশালায় তাদের সিধে পাঠিয়ে দিতে বল। কোন অযত্ন যেন না হয়···বিয়ে-বাড়ি···শুভদিন।

হাসে মানদা,

—নিজের তো হলই ন পরের তদারক করে করেই শখ মেটাও গো, এ্যা।

বিষ্টু সরকার গজগজ করে,

—থাম দিকি তুই। বড় ধারালো তোর জিভটা।

মানদা হাসতে হাসতে খুঁট থেকে পান দুটো বের করে বলে,

—পান নেবে না ? কি গো ?

বিষ্টু সরকার একটু থামলো। মানদার দিকে চেয়ে থাকে। বিষ্টু সরকার এ-বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরেই আছে। জমিদার বসন্তনারায়ণের তখন যৌবন-কাল। বিষ্টু সরকার দেখেছে তখন এ-বাড়ির বোল-বোলাও। সে-সব বেশ কয়েকবছর আগেকার কথা।

তখন এ-বাড়ির একমাত্র সন্তান উদয়ও ছোট। ক্রমশঃ নতুন মনিব উদয়নারায়ণ বড় হয়ে ওঠে।

সে এক অন্য ধাতের মানুষ। যৌবনে সে জমিদারী মেজাজের ভালোটুকু কতটা পেয়েছে জানে না বিষ্টু সরকার। কিন্তু দেখেছে উদয়নারায়ণ এখন থেকেই দুর্বার ; জমিদারীর সঙ্গে খারাপ নেশাটাই পেয়েছে। প্রচুর টাকা চলে যাচ্ছে কোন রন্ধ্রপথে।

বিষ্টুচরণ দেখেছে মাত্র। আকাশ-বাতাসে উঠেছে দিন-বদলের আভাষ।

এতকালের সেই প্রতিষ্ঠা—দাপট ওই জমিদারী নাকি এইবার ঝরাপাতার মত ঝরে যাবে।

কিন্তু এদের কোন খেয়ালই নেই।

মানদা দেখছে বিষ্টু সরকারকে।

—কি হল গো তোমার ?

পান দুটো মুখে দিয়ে বিষ্টু বলে,

—বিয়ের এতো লহর তো হচ্ছে রে, বলি হবে কিছু ? পাগলা ঘোড়া বশ মানবে ?

মানদা হাসে। ওর মিষ্টি হাসিটুকুর দিকে চেয়ে থাকে বিষ্টু সরকার।

মানদা বলে,

—হবে গো হবে। ও ঘোড়া দেখবে ঠিক বশ মানবে। বৌরাণীও কম নয়, বুঝলে ?

বিষ্টু যেন বিশ্বাস করতে পারে না। তবু যদি নতুন বৌ ওই বেবশ উদয়নারায়ণকে শায়েস্তা করতে পারে মঙ্গলই হবে। নইলে এই বিরাট সর্বনাশার মুখে ওরা সবাই ভেসে যাবে।

বিষ্টু বলে,—হলেই ভালো। যা দিনকাল আসছে—কে জানে কি হবে।

মানদা হাসে,—তোমার দেখছি ভাবনা বেশি গো।

হেসে বিষ্টু গদগদস্বরে জবাব দেয়,—তোর জন্য মানদা—

—মরণ! কে আমার আপনজন এলো রে ? মানদা সর্বাঙ্গে লহর তুলে চলে গেল।

বিষ্টু তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

সরকারের মেজাজ বিগড়ে গেছে।

ওদিকে দেউড়ি দিয়ে হন্ হন্ করে একটি ছোকরা এগিয়ে আসছে। পরনে একটা হাতে-কাচা ধুতি আর পাঞ্জাবিটা যেন হাঁড়ি থেকে বের করে আনা হয়েছে এমনি লাট-পাট হয়ে গেছে তার ভাঁজগুলো। হাতে ঝোলানো একটা হাঁড়ি, আর বগলে গামছায় মোড়া একটা ছোট পুঁটলি মত। এই বেশে এই বাড়িতে কেউ ঢুকে সোজা কাছারির দিকে এগিয়ে যাবে ভাবতে পারেনি তারা। ইতিজনের এখানে প্রবেশ অধিকার নেই।

এ্যাই—কাঁহা যাতা হ্যায় ? আরে এ ছোকরা!

দারোয়ানের নিষেধ শোনে না সে। এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

আমলাও ওকে কি বলতে যায় তাও সে কান করে শোনে না। সটান কাছারিঘরে জমিদারবাবুর খাসকামরার দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন ওখানে কারো যাবার হুকুম নেই। আমলারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

এ-সময় জমিদার বসন্তনারায়ণ তাঁর বন্ধু-মোসাহেব পরিবৃত হয়ে হয়তো রসালাপ করছেন। কে জানে বাবুদের হয়তো দু-এক ঢোক পানীয়ও চলেছে। হাসি-মশকরা হচ্ছে নানা কথা নিয়ে। সুতরাং ব্যাপারটা গোপনীয়। এ-সময় কারো যাবার হুকুম নেই।

তাছাড়া ওই ছোকরা যদি ঘরেই ঢোকে, বিপদ হবে বিষ্টুচরণের। তাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় বিষ্টু। ওকে ডাকছে,

—ও মশাই। বলি ওহে অ ছোকরা! দাঁড়াও, দাঁড়াও!

ছোকরার ওর দিকে নজর নেই। সে অবাক হয়ে মস্ত বাড়িটাকে দেখছে, দেউড়ির মাথায় নহবৎখানায় সানাইওয়ালাদের বাজনায় মাথা নাড়ছে, দারোয়ানকে পরোয়া না করেই এগিয়ে আসছে।

বিষ্টুচরণের ডাকে বিরক্ত হয়ে চাইল সে। বেশ চড়াস্বরে বলে,

—আমাকে বলছেন?

বিষ্টু ততক্ষণে এসে গেছে কাছে। বলে,

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা, হন্ হন্ করে যাওয়া হচ্ছে কোন্খানে? কোথাকার প্রজা হে তুমি? মহাল, তৌজি, খতিয়ান, খাস খতিয়ান, সাকিন বল দিকি আগে!

হাসে ছোকরা। বলে ওঠে,

—মহাল-খতিয়ান-তালুক—ও-সব আমার নেই। ছিলও না কোনকালে। আমি প্রফুল্ল।

বিষ্টু ওর জবাবে জলে ওঠে। বিকৃত কণ্ঠে বলে,

—শুনে প্রফুল্ল হলাম। এখন মানে মানে ওদিক থেকে সরে এসে আমাদের প্রফুল্ল কর দিকি। ওটা বড়বাবুর খাসকামরা। ওদিকে যাবার হুকুম নেই। সরে এসো।

হাসে প্রফুল্ল,

—তালুইমশাইকে প্রণাম করতে যাচ্ছি। আরে, হাঁ করে রইলে যে? তালুইমশাই বোঝ না? আমি নতুন কুটুম—

বিষ্টু সরকার চটে ওঠে,—রসিকতা হচ্ছে? এই মধু সিং—

মধু সিং সদর পাইক, সরকার মশায়ের ডাকে তখনই এসে হাজির হয় হন্তদন্ত হয়ে। চমকে উঠেছে প্রফুল্ল—

—আরে, এ-সব আবার কি ব্যাপার! এলাম কুটুমবাড়িতে—পথ ছাড়ুন দিকি মশায়! খাতির করে নিয়ে যাবেন, তা না ওই ভোজপুরী ডেকে কি তাড়াবেন নাকি?

তবু বিষ্টু সরকার সহজে ওকে বড়বাবুর কামরায় যেতে দিতে রাজী নয়, বিশেষ করে এই সময়। তাছাড়া কোথাকার কে একটা বাউণ্ডুলেকে ওখানে কর্তার ঘরে যেতে দিতে পারে না। তাই শোনায়,—সরে এসো ওখান থেকে। সরে এসো বলছি।

ইতিমধ্যে ভোজপুরী দারোয়ানও এসে হাজির হয়েছে। সেও করণীয় একটা কাজ পেয়ে বেশ ভারি গলায় বলে,

—নেহি, চলিয়ে বাবু।

প্রফুল্ল ওদের দিকে চেয়ে দেখছে। এমনি ব্যবহার পাবে তা ভাবেনি সে। অনেক আশা নিয়েই প্রফুল্ল আসছিল, কিন্তু পথের মধ্যিখানে ওদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে সে অবাক হয়েছে।

—চলিয়ে। দারোয়ান এসে ওর হাতটাই ধরেছে।

প্রফুল্ল প্রথমে হকচকিয়ে গিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করে, ছিটকে পড়েছে বগলের পুঁটলিটা। একটা ঝটকা দিয়েই বুঝেছে এর কাছ থেকে হাত ছাড়াতে গেলে একটু কষ্টই করতে হবে।

কি ভাবছে প্রফুল্ল।

গরীব হলেও মান-সম্মানবোধ তার আছে একটু। এখানে এসে এমনি ব্যবহার পাবে জানলে আসতো না।

তবু মনে হয় চাকর-বাকররা এমনিই। এ-বাড়ির মানুষগুলোকে কিছুটা চিনেছে সে। তাদের এত খারাপ মনে হয়নি।

ওরা জানে না প্রফুল্লকে এরা এমনিভাবে অপমান করতে চায়। তাই প্রফুল্ল এদের হাত এড়িয়ে যেভাবেই হোক খোদ কর্তা ওই বসন্তনারায়ণবাবুর সঙ্গেই দেখা করবে।

তার বোন সুমিতার কথাও মনে পড়ে যায়। সুমিতা তার একমাত্র বোন।

সেই-ই এসেছে এ-বাড়ির বৌ হয়ে। এত সমারোহ তারই আসাকে কেন্দ্র করে। প্রফুল্ল তাই এদের অপমানটা গায়ে মাখে না।

কি ভাবছে সে। দারোয়ান তাড়া দেয়।

—এ বাবু। চলো, বাহার চলো।

প্রফুল্ল নড়ে না। ঠায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছে, তার উর্বর মস্তিষ্কে তখুনিই বুদ্ধিটা এসে যায়।

বসন্তনারায়ণ চৌধুরী এ দিগরের একজন নামকরা জমিদার।

জমিদারীর ভিতটা ভিতরে ভিতরে নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। ভাবনায় পড়েছেন বসন্তনারায়ণ। তাঁর ভাবনা-চিন্তার কারণ ওই একমাত্র সন্তান উদয়নারায়ণ। অনেকদিন আগেই তার মা মারা যায়।

বসন্তনারায়ণবাবুর স্ত্রীকে হারিয়েও সেই শোক ভোলবার চেষ্টা করেছিলেন, সংসারের ভার পড়েছে তাঁর বোনের ওপর।

কিন্তু একমাত্র সন্তান উদয় তবু মানুষ হল না। সে কেমন যেন বেপরোয়াই হয়ে রইল। লেখাপড়ায় তার মন নেই, স্কুলের গণ্ডী পার হতে পারলো না অনেক চেষ্টা করেও।

অবশ্য চেষ্টাটা তার চেয়ে তার বাবা বসন্তনারায়ণেরই ছিল বেশি। আশা করেছিলেন ছেলেকে আইন পাশ করিয়ে জমিদারী এষ্টেটে বসিয়ে নিজে অবসর নেবেন।

কিন্তু বসন্তনারায়ণের সে-আশা ব্যর্থই হয়েছে নিদারুণভাবে। উদয় পড়াশোনা ছেড়ে গান-বাজনা নিয়ে পড়েছে। তাতেও অমত করেননি বসন্তনারায়ণ।

দেখেছেন উদয় কোন ওস্তাদকে বাড়িতে এনে বেহালা শিখছে।

কিন্তু ক্রমশঃ উদয়ের সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে আসে তাঁর। রাজীব-পুরের বাগানবাড়িতে আরও অনেকেই নাকি আসে। বাঈজীদেরও আনা-গোনা হয়। মহফিল্ চলে।

টাকাও খরচা হয় প্রচুর এবং সে টাকা জোর করেই আদায় করে নিয়ে যায় উদয় কাছারি থেকে।

শুনেছেন মদও নাকি ধরেছে উদয়।

ধাপে ধাপে নেমে চলেছে উদয়।

বসন্তনারায়ণের ভাবনাটা তাকে নিয়েই। কোনমতে তাকে ফেরাতে পারেননি তিনি। সব চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে টাকারও টান পড়ছে। আদায়-উশুল নেই, অথচ খরচ আছে। লাটের কিস্তি দিতে হবে। তাই নিজেই সেবার গেছেন পুরন্দর মহালে। প্রজাদের ওপর চাপ দিয়েই বাকি খাজনাপত্র আদায় করতে হবে।

তার জন্য কড়া ব্যবস্থাই করেছেন তিনি। পাইক-গোমস্তা, নায়েবদেরও কড়া হুকুম দিয়েছেন।

—কোন মাপ্-টাপ্ চলবে না। পুরো আদায় করে নেবে।

মনে মনে ভয়ও পেয়েছেন। কে জানে জমিদারী আসলে টিকবে কিনা! নানা কথা উঠছে কানাঘুসোয়। তাই যা পারেন আদায় করে নিতে চেষ্টা করেন তিনি।

বোধহয় জুলুমের মাত্রাটা তাই বেশিই হয়ে উঠেছে।

সেদিন বিকেলে কাছারির বাইরে কার সতেজ কণ্ঠস্বরে একটু অবাক হন তিনি। কে প্রতিবাদ করতে এসেছে। গোমস্তারা বাধা দেয়।

কিন্তু বসন্তবাবুর ঘরের ভিতর এসে ঢোকে একটি মেয়ে। সুন্দর চেহারা। চোখে-মুখে কাঠিন্য, রেগে উঠছে সে। সুন্দর মুখখানায় সেই রাগের চিহ্ন। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে পরাজিত গোমস্তা-পাইকের দল।

—হুজুর, ও কিছুতেই কথা শুনল না।

বসন্তবাবু মেয়েটিকে দেখছেন। বিকেলের একটু আলো পড়েছে ওর মুখে। ওর ডাগর চোখ দুটোতে ফুটে উঠেছিল রাগের জ্বালা, ক্রমশঃ সেটা মিলিয়ে আসছে।

সেও দেখছে ওই কঠিন দীর্ঘ মানুষটিকে।

গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে বসন্তনারায়ণ ধীরকণ্ঠে বলেন,

বসো মা।

এ যেন হুকুমই। তবু প্রচ্ছন্ন একটু স্নেহের কমলতা ফুটে উঠেছে সেই কণ্ঠস্বরে। মেয়েটি বসল। একটু যেন লজ্জা আর ভয় এসেছে তার মনে।

তবু পরিষ্কার কণ্ঠে মেয়েটি জানায়,

—আমরা গরীব, দাদারও কাজকম্মো নেই। মা একা, কোন্‌দিক

সামলাবেন? এত টাকা খাজনা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আপনার গোমস্তা একসঙ্গে চার বছরের খাজনা না দিলে অস্থাবর ক্রোক করে সবকিছু নিয়ে আসবে। তাই আপনার কাছে এলাম।

বসন্তনারায়ণ চুপ করে ওর বলিষ্ঠ কণ্ঠ আর ওই তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে চলেছেন। বলেন,

—কিন্তু জমিদারকেও তো সরকারকে খাজনা দিতে হয় মা।

—আপনাদের অনেক আছে। আমাদের তো কিছুই নেই। ওই ভিটেটুকু টিকে আছে, আর একটু জমি, জোর করে নিতে চান নিয়ে নিন। আমরা অন্য কোথাও চলে যাবো।

একটু দম নিয়ে বলে চলেছে মেয়েটি,

আপনিও এই কথা বলবেন জানলে আসতাম না।

উঠে পড়েছে সে। বসন্তনারায়ণ ওর এই তেজোদৃপ্ত মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন।

—বসো মা। দেখছি তোমাদের জমাটা। ওহে বিষ্টুচরণ!

গোমস্তা বিষ্টু হেঁট হয়ে খাতাপত্র নিয়ে এগিয়ে আসে।

খাজনাটা ওদের মকুব হয়ে যায়।

—এবার খুশি হয়েছো মা?

সুমিতারও ওই কঠিন লোকটিকে ভালো লাগে। তাদের প্রতি তিনি দয়া করেছেন।

তাই কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য সে হেঁট হয়ে প্রণাম করে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বের হয়ে আসে।

—এসো মা। বসন্তনারায়ণ ওর দিকে চেয়ে কি ভাবছেন।

বিকেলের আলো ম্লান হয়ে এল, পাখি ডাকছে গাছ-গাছালির মাথায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে ফুটে ওঠে দু-একটা তারা। তারাফুল ফুটেছে আকাশের অসীম আঙিনায়।

উদয়ের কথা ভাবছেন তিনি।

বেপরোয়া সেই ছেলেটিকে হয়তো ফেরাতে পারে অমনি কোন মেয়ে তার ব্যক্তিত্ব আছে, তেজ আছে।

রূপও তেমনি।

হয়তো অমনি কোন মেয়ে তার সংসারে এলে ভেঙে-পড়া সংসার আবার প্রীতির বাঁধনে জোড়া লাগবে। উদয়কেও ওর রূপ দিয়ে, গুণ দিয়ে বিমুগ্ধ করে তাকে আবার ফেরাতে পারবে।

নায়েব-গোমস্তারা একটু অবাক হয়েছে।

এমনিতে জমিদার বসন্তনারায়ণ বেশ দুঁদে লোক। তাঁর কাছে সহজে কেউ এগোতে পারে না।

কিন্তু এই মেয়েটি শুধু এগোয়নি তাঁর কাছে, এগিয়েছে সতেজে। মুখের ওপর তার কথাগুলো জানিয়ে কাজ উদ্ধার করে বের হয়ে গেছে।

বিষ্টুচরণ!

ভিতরের ঘরে এতক্ষণ কোন শব্দই শোনা যায়নি। বোধহয় হুজুর তন্দ্রামগ্নই ছিলেন, গুড়গুড়ির শব্দও ওঠেনি।

ভিতর থেকে ওই ভরাটি গলার শব্দ শুনে এগিয়ে যায় বিষ্টু।

প্রণাম করে দাঁড়ালো।

বলেন বসন্তনারায়ণ,

—ওই মেয়েটিকে চেনো? ওর মা-দাদার সঙ্গে পরিচয় আছে?

একটু অবাক হয় বিষ্টু সরকার।

এ-গ্রামের সব খবরই সে রাখে। জানে সে ওই সুমিতা—তার দাদা যাত্রার দলের গাইয়ে ছোকরা ওই প্রফুল্লকে। ওদের বাড়ির খবর জানে, শুনেছেও নানা কথা। তাই জানায় বিষ্টুচরণ,

—আজ্ঞে চিনি। সত্যিই ওরা গরীব, মেয়েটিকে নিয়ে মায়ের ভাবনার শেষ নেই। বিয়ে-থা দিতে পারছে না ভালো ঘরে। তাই শুনছিলাম পাশের গ্রামের জোতদার কন্দর্পনারায়ণ নাকি ওকে চতুর্থ পক্ষ করে ঘরে নিয়ে যেতে চায়।

—বল কি হে! অবাক হন বসন্তনারায়ণ।

একটা ছবি মনের মধ্যে ভাসে। নিজের একমাত্র ছেলে উদয়নারায়ণের সঙ্গে ওকে মানাবে ভালো। রূপবতী একটি পরমা-সুন্দরী মেয়ে।

টাকার দরকার তাঁর নেই। ভগবান অনেক দিয়েছেন।

মেয়েটিকে দেখতে অনেকটা যেন তাঁর সেই ছেলেবেলার ভালোলাগা একটি কচি মুখের মতই। বিষ্টুর মুখে কথাটা শুনে একটু বেদনাবোধও করেন ওর জন্য। নায়েবও এসে পড়ে।

সেও বলে চলেছে,

—আজ্ঞে একটি মেয়ে, আর ছেলেটি তেমন মানুষ হয়নি, এই নিয়েই ওর মা বিধবা হয়েছে। গরীব অনাথা। কি আর করবে বলুন ?

বসন্তবাবু কথাটা তখনই স্থির করেন। এ মেয়েকে ছেলের বউ করে তিনিই বাড়িতে নিয়ে আসবেন। এও যেন একটা প্রতিষ্ঠা-অর্জনের পথ। হতেও পারে।

তাই বলেছিলেন নায়েবকে,

—তুমি সব ব্যবস্থা কর, ও মেয়েকে আমিই পুত্রবধূ করে নিয়ে যাব। ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলে এসো।

—আজ্ঞে !

নায়েব যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারেনি।

আজ মোসাহেবের দল সেই কথাটাই আলোচনা করছে। বসন্তনারায়ণ গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী পরেছেন, দুহাতে গোটা আষ্টেক বড় বড় আংটি, পাঞ্জাবীর ওপর পরেছেন সরু মফচেন হার। কোঁচানো দামী ধুতির কোঁচটা কার্পেটের ওপর দিয়ে লতিয়ে গেছে।

ফরসি টানছেন থেকে থেকে, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য মাঝে মাঝে আসছে সুন্দর গ্লাসে রঙীন পানীয়। হাসির ধুম পড়েছে।

কে বলে ওঠে,—আজ্ঞে, কীর্তি একটা দেখালেন যাহোক, গরীবের কন্যাদায় —যা দুটো টাকা নিয়ে যা, এ দান নয় বাবা। পথের মেয়েকে তুলে এনে রাজরাণী বানিয়ে দেওয়া হে !

মুরলীধর গলার কাছে পানীয়টা ঢেলে চোখ বুজে গিলে বলে ওঠে,

—একমাত্র বিশ্বকর্মা করেছিল, আর করছে আমাদের বসন্তবাবু। গরীবের মা-বাপ ! তবে বুঝলে পতিত, কন্দর্প যা আপসাচ্ছে না ? উরে বাসরে ! ভেবেছিল চতুর্থ পক্ষ করে নিয়ে যাবে, তা তো হল না। বসন্তবাবুর নজরে পড়েছে—মায়ের দিন বদলে গেল।

বসন্তনারায়ণ মৃদু মৃদু হেসে বলেন,

—কি যে বল পতিত। কি এমন পুণ্যকাজ করলাম। এ তো মানুষেরই উপকার করা। কন্দর্প টা খুব বেড়েছিল। মাথায় পা দিতে চাইছিল কিনা !

পতিত বলে ওঠে,

—তাই পা-টা মুমড়ে মট্ মটাং। পা পিছলে আলুর দম।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে থাকে গোলাপী নেশার আমেজে।

—কি জানো? গরীবের দুঃখটা কেমন দেখতে পারি না। তাই চেষ্টা করি উপকার করতে।

এমন সময় বাইরে একটা চিৎকার শোনা যায়। কে যেন এইদিকে এগিয়ে আসছে।

—ও তালুইমশায়! তালুইমশায়!

—কে!

বিরক্ত হন বসন্তবাবু।

দেখা যায়, হন্তদন্ত হয়ে প্রফুল্ল ঢুকছে। একহাতে ঝুলছে সেই মিষ্টির হাড়িটা, খুলে পড়েছে গামছায় বাঁধা পুঁটলি। পাঞ্জাবীটা ছিঁড়ে গেছে ধস্তাধস্তিতে, চুলগুলো উস্কোখুস্কো।

পিছনে তখনও তাড়া করে আসছে বিষ্টু সরকার আর মধু সিং। কিন্তু প্রফুল্ল ওদের যেন কানামাছি খেলে এথাম-ওথামের পাশ কাটিয়ে একেবারে এসে বসন্তনারায়ণের খাসকামরায় উদয় হয়েছে। হাঁপাচ্ছে সে এই লুকো-চুরি খেলায়। বসন্তনারায়ণ অবাক হয়ে গেছেন। ওঁর মুখেচোখে ফুটে উঠেছে বিরক্তি আর বিস্ময়। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন,

তুমি আবার কে? এখানে কেন?

প্রফুল্ল ততক্ষণে একটু নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়েছে। বিষ্টু সরকার, মধু সিং দুজনের কর্তৃত্ব এখানে খতম হয়ে গেছে।

প্রফুল্ল এগিয়ে এসে বেশ হাসিভরে প্রণাম করে বসন্তনারায়ণকে। পায়ের ছাপ পড়ে গালিচাতে।

প্রফুল্ল বলে—আজ্ঞে, চিনতে পারছেন না? আমি প্রফুল্ল।

—প্রফুল্ল! অবাক হন বসন্তনারায়ণ।

প্রফুল্ল বলে—বাঃ রে! ভুলে গেলেন? আমি উদয়ের শালা। সুমিতা, মানে নতুন বৌ-এর ভাই, প্রফুল্ল!

একটু বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলেন বসন্তনারায়ণ,—প্রফুল্ল! তা এখানে কেন?

প্রফুল্ল অবাক। বলে ওঠে,

—বাঃ রে! নেমতন্ন করলেন তোমার বোনের বৌভাতে যাবে, আপনি নিজে, কত করে বললেন। মা তাই পাঠালো, পিতৃতুল্য একজন মস্তলোক বলছেন, যা—যেতে হয়। তিন্তু ময়রা কি বাকিতে রসগোল্লা দেয়! তবু

বললাম, যাব জমিদারবাবুর বাড়ি। ব্যস্‌, এক হাঁড়িতেই সুড়সুড় করে তিনু ময়রা দু-ডুসের রসগোল্লা দিয়ে দিলে! উদয় ভায়া ভালো আছে তো? সুমির জন্য মা তেঁতুলের আচার আর কাজলীগাছের আমের আমসত্ত্ব দিয়েছে, খেয়ে দেখবেন।

বসন্তনারায়ণের মুখখানা কালো হয়ে ওঠে। বলে ওঠেন,

—বিষ্টু, একে অতিথিশালায় ব্যবস্থা করে দাও।

প্রফুল্ল ক্ষুণ্ণ হয়,

—তালুইমশায়, সুমির সঙ্গে দেখা হবে না? মা বলেছে ওকে বলে আসবি—

—যাও এখন। বসন্তনারায়ণ ধমকে ওঠেন কঠিন স্বরে।

—এসো। বিষ্টু ওকে নিয়ে যায় দরজার ওদিকে।

সদর নায়েব গোবিন্দপদও গোলমাল শুনে এসে পড়েছে। তাকেই বলে ওঠেন বসন্তনারায়ণ,—বাইরের লোক এসে কি এখানেও গোলমাল করবে?

গোবিন্দ জানায়,—আজ্ঞে, বললে উদয়বাবুর সম্বন্ধী, নতুন কুটুম।

বসন্তনারায়ণ জবাব দেন,

—ওর বোনের বিয়ের পর সে এ-বাড়ির বৌ হয়ে গেছে। যখন-তখন তার দেখা পাওয়া যায় না। কথাটা ওকে জানিয়ে দেবেন।

গোবিন্দপদ চুপ করে বের হয়ে গেল।

সানাইয়ের সুর ভেসে আসে বড়বাড়িটার ভিতর। এত দেওয়ালের প্রহরা দিয়েও বাতাসকে আটকানো যায়নি। বাইরের সেই কলরব-কোলাহলও শোনা যায় এখানে। দীয়তাং ভুজ্যতাং চলেছে।

বড়বাড়িটা কুটুম-স্বজনের ভিড়ে ভরে গেছে।

নতুন বৌ সুস্মিতা এ-বাড়িতে এসে একটু ঘাবড়ে গেছে। সামান্য ঘরের মেয়ে, অত্যন্ত গরীব তারা। এখানে এই প্রাচুর্য আর অফুরাণ ছড়াছড়ির মাঝে এসে হারিয়ে গেছে সে।

বিশাল থামগুলো, ওই লম্বা বারান্দা কেমন যেন ভয় ধরায় তার মনে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

বাড়ীর কর্ত্রী বলতে তার পিসশাশুড়ী মনোরমা। বয়স্কা ভদ্রমহিলা, বিধবা হবার পর থেকেই দাদার সংসারের হাল ধরেছেন। এ-বাড়ির তিনিই সব। অন্দরমহলেই নয় বসন্তনারায়ণের ওপরও বোনের প্রভাব অনেকখানি। এস্টেটের কাজকর্মও তাঁর পরামর্শ মত চলে, নায়েব-গোমস্তা-আমলারাও জানে এ-বাড়ির কর্ত্রী কে।

সুমিতা ক্রমশঃ জেনেছে খবরটা, তার শাশুড়ী অনেক আগেই মারা যান ওই একমাত্র সন্তান উদয়কে রেখে। সেই থেকে পিসীমাই ওকে মানুষ করেছেন।

আজ পিসীমা বের করেছেন শাশুড়ীর সিন্দুক থেকে সেই পুরনো গহনাগুলো। দামী বেনারসী শাড়ি আর সেই সেকেলে গহনার ভিড়ে একটি গ্রামের মেয়ে সুমিতা কি এক অজানা পুলক, লজ্জা আর ভয়ের রাজত্বে হারিয়ে গেছে। এই বিরাট জাঁকজমক সে চোখেও দেখেনি।

বেশ বুঝতে পেরেছে, এই বড়বাড়ির আজ বউ সে। এখানের অনেক সম্মান, অনেক দায়িত্ব পড়েছে তার ঘাড়েই

তার শাশুড়ীর ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করেছে দুজনে। ওই স্থির ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে। দুচোখে ওঁর কেমন নীরব আশীর্বাদ আর অভয়ের ছায়া।

পরম পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন তিনি।

পিসীমা বলে চললেন,

—সব তীর্থ ই ঘুরেছিল সে। অনেক আশা ছিল, উদয় বড় হবে, এমনি বউ আসবে তার ঘরে। সাবিত্রীতীর্থে গিয়েছিল। সেখান থেকে সেই ভাবী বউয়ের জন্য এনেছিল তীর্থের নোয়া। আজ সবই হল বাছা, সে রইল না। এ-সব ফেলে সে চলে গেল।

সুমিতা ওই ছবির দিকে চেয়ে থাকে। তার হাতে উঠেছে তাঁরই আনা শুভকামনা মেশানো সেই সোনায় মোড়া সাবিত্রীর অক্ষয় লোহা।

এইবার সুমিতা এ-বাড়ির বউ হয়ে এসেছে।

উদয় বলে ওঠে,—তোমাদের সব হল? তাহলে পিসীমা এখন ছুটি দাও দিকি!

উদয় ক-দিন ধরে হাঁপিয়ে উঠেছে। তার জগৎ ছিল আলাদা। গান-বাজনা আর আনন্দের জগৎ। এখানে শুধু কর্তব্য। ওই অপরিচিত মেয়েটিকে

দেখেছে সে। মনে হয়েছে উদয়কে ওরা বাঁধতেই চেয়েছে নানাভাবে। তাই যেন হাঁপিয়ে উঠেছে উদয় এই ক-দিনেই।

পিসীমা বলেন,—দাঁড়া বাছা। এসব তো মানতে হবে।

পিসীমাকে উদয় জানায়,

—বিয়ের নামে এত নাকানি-চোবানি তা কে জানত?

কোনরকমে একটু বের হয়ে যেন বাঁচে উদয়।

কিন্তু এ-বাড়ির সীমানা থেকে বের হবার উপায় নেই সুমিতার! বেশ বুঝতে পারে এর কঠিন বাঁধনে সে বাঁধা পড়েছে।

পিসিমা বলেন,

—উদয়ের সব দায়িত্ব কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে বৌমা। বড় অবুঝ ও। ওকে বুঝিয়ে মানিয়ে নিতে হবে। পারবে তো মা?

সুমিতা একটা দিনেই এই বড়বাড়ির জীবনের সঙ্গে কেমন মিশিয়ে নিতে চায় নিজেকে। ওই উদয়কেও দেখেছে কি কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে। এ সৌভাগ্য, এত পাওয়ার স্বপ্নও সে দেখেনি।

উদয়কে ও দেখেছে, এখনও চেনেনি তাকে। মনে হয় অন্য ধবনের একটি ছেলে। তবু অজানা একটা আত্মীয়তার স্পর্শ ফুটে ওঠে তার মনে।

মাথা নাড়ে সুমিতা। এটুকু তাকে করতেই হবে। নিজের ঘর, নিজের স্বামী—তাকে তার মনোমত করে গড়ে তুলবে সে।

চিরন্তন নারীর অন্তরের সেই স্বপ্ন তাকে মুগ্ধ করেছে। সুমিতা ভয় জড়ানো চোখে চেয়ে থাকে মনোরমার দিকে। মনোরমা ওকে বুকে টেনে নেন, আদর করেন।

বলে ওঠেন,

—পারবি মা! ঠাকুরের ডাক। তিনিই সব করে দেবেন।

বাইরে খাবার আয়োজন চলেছে। বড় উঠানে বসেছে প্রজাপাটকরা। বিশাল দালানে জায়গা হয়েছে নিমন্ত্রিত অতিথিদের। গণ্যমান্য অনেকেই বসেছেন, বসন্তনারায়ণ নিজে তদারক করছেন; ঘুরছে সদর নায়েব, বিষ্টুচরণ আরও অনেকে। গমগম করছে সেই ম্যারাপবাঁধা বিরাট ঠাঁইটা।

প্রফুল্ল উঠে আসছে বারান্দায়। নিচে সে বসেনি। চোখে-মুখে তার খুশির আবেশ। এতবড় ক্রিয়াকাণ্ডের সে-ই যেন অন্যতম উপলক্ষ্য!

বারান্দায় গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যেই বসে পড়ে সে।

চারদিকে সাজ-পোশাকের বাহার। বাবুদের গোঁফ, পাঞ্জাবী আর আংটি ঝলমল করছে। ওরই মাঝে ওই আধময়লা কাপড় আর পাঞ্জাবী পরা প্রফুল্লকে বসতে দেখে ওরা সঙ্কুচিত হয়। বসন্তনারায়ণ এগিয়ে আসেন।

—তুমি এখানে বসলে যে?

প্রফুল্ল বলে,—কেন তালুইমশায়?

—উঠে এস। উনি বসবেন এখানে।

একজন গণ্যমান্য লোককে বসিয়ে দিলেন তিনি। বলে ওঠেন সেই ভদ্রলোক,—না, না, ছোকরা বসেছে বসুক। আমি না হয় পরেই বসবো।

প্রফুল্ল বলে,—আমি এ-বাড়িরই লোক, মানে উদয়ের সম্বন্ধী। আমি পরে বসবো। আপনিই বসুন!

ভদ্রলোক অবাক হয়ে ওই হতদরিদ্র ছেলেটার দিকে চাইলেন।

—তুমি উদয়ের সম্বন্ধী?

বসন্তনারায়ণ গুম হয়ে যান।

প্রফুল্ল উঠে এল। ওদিকে পরিবেশন শুরু হয়েছে।

প্রফুল্ল বসবার জন্য আর খালি জায়গা পায় না।

পরিবেশনকারীদের মধ্যে ব্যস্ততা পড়েছে। প্রফুল্ল ওই দিকেই এগিয়ে যায়। পাড়াগাঁয়ের ছেলে সে। এমন অপচয় দেখেনি কখনও, তাই বিশ্রী লাগে। সদর নায়েবকে বলে,

—ও নায়েবমশায়, এসব কি? এত অপচয়, ছিঃ ছিঃ!

নায়েবমশাই ওর দিকে চাইল মুখ তুলে।

প্রফুল্ল শেষকালে এতবড় অপব্যয় থেকে বাঁচাবার জন্য নিজেই বালতি নিয়ে নেমে পড়ল আসরে।

—আমি হাত লাগাই মশায়। ফৌত করে দেবেন যে!

এতক্ষণ একটা কাজ না পেয়ে প্রফুল্ল হাঁপিয়ে উঠেছিল, এইবার সে খুশি মনে কাজে লেগেছে।

বসন্তনারায়ণ ওর দিকে একবার চাইলেন মাত্র।

প্রফুল্ল ঘেমে উঠেছে। বলে,

—কি পরিবেশনকারী সব এনেছেন তালুইমশায়, আমাকে বললেও তো পারতেন! পুরন্দরপুর থেকে স্রেফ একটি দল এনে নামিয়ে দিতাম, দেখতেন পরিবেশন কাকে বলে!

গলা নামিয়ে বলে প্রফুল্ল,

—ভাঁড়ারের দিকে একটু নজর রাখুন দিকি। দু-চার হাঁড়ি মিষ্টি, মাছ হাতে হাতেই সাফ হয়ে যাচ্ছে। চোরের কাণ্ড দেখছি।

বসন্তনারায়ণ ওর কথায় কানই দিলেন না।

প্রফুল্ল ব্যস্ত হয়ে হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল।

—এদিকে কপির তরকারী আসুক। তরকারী?

সুমিতা শুনেছে প্রফুল্ল এসেছে। তারই দাদা। মনটা কেমন করে ওঠে তার। দাদার সঙ্গে দেখা করার ভাগ্য এখনও হয়নি।

এ-বাড়িতে যখন-তখন কারও সঙ্গে দেখা হয় না। কে জানে তার দাদা কোথায় আছে, কি খাচ্ছে! আদর-যত্ন কিছু পেল কিনা সে খবরও জানে না।

মানদা ঝি ইতিমধ্যে সুমিতাকে চিনে নিয়েছে।

দজ্জাল হলেও মেয়েটা এমনিতে বেশ ভালো। সুমিতা প্রথমে ওকে এ-বাড়ির ঝি বলে চিনতে পারেনি। ভেবেছিল কোন আত্মীয়া হবে। ওর প্রাধান্য, কথাবার্তা আর সাজ-পোশাক দেখে ঝি বলে মনেই হয় না।

সুমিতা ওর দিকে চেয়ে থাকে। এ-বাড়িতে কথা বলার মতও একজন কেউ নেই। সবাই কোন আলাদা জগতের লোক।

মানদাই ওকে প্রণাম করে বলে,

—শূন্যি ঘর এবার পূন্ন হল বৌদিমণি।

এতবড় বাড়িতে তবু সুমিতা ওর সঙ্গে কথা বলে হালকা হয়।

খবরটা সে-ই আনে সুমিতার কাছে।

—তোমার দাদা এয়েছেন গো।

—তাই নাকি! খুশিতে ফেটে পড়ে সুমিতা—কই রে? দাদা ভেতরে এল না?

পরক্ষণেই বুঝতে পারে এখানে সব সময় দেখা হবে না।. তাছাড়া

গরীবের ঘরের মেয়ে সে, তার দাদার জন্য অভ্যর্থনার কেমন আয়োজন হবে কে জানে! তাই বোধহয় ক্ষুন্নমনেই প্রশ্ন করে মানদাকে,

—কোথায় আছে দাদা?

সুমিতার কথায় জবাব দেয় মানদা,

—ওই মুখপোড়া সরকারই কি বলেছিল, তা বাবু অতিথিশালায় তেনার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

—অতিথিশালায়! সুমিতা ওদের হৃদয়হীনতায় যেন অবাক হয়।

তার দাদার তার বাড়িতে আসবার অধিকার নেই। মানদা বলে ওঠে,

—তুমি একটু বসবার ঘরে চল বৌদি, আমি দেখে আসছি কোথায় রয়েছেন তিনি।

সুমিতা ব্যাকুলকণ্ঠে বলে,—একবার ডেকে আনবি?

বিকেল হয়ে আসছে, বিরাট বাড়িটাকে ঘিরে তখনও কোলাহল চলেছে।

জানলা দিয়ে দেখা যায় কাতারে কাতারে লোক খেয়ে চলেছে। দুদিন ধরে এই কাজই চলেছে। তারপর আছে অনেক উৎসব। যাত্রা-গান-জলসা—শুনেছে নাচিয়েও নাকি আনা হয়েছে কলকাতা থেকে।

সুমিতার মনে হয়, এত উৎসব আর অপচয় আর কেনই বা করা! এদের অনেক আছে. তাই কিছুটা অপব্যয়ই করে তারা খুশি হয়।

বাগানের গাছের মাথায় সূর্যের আলো নেমেছে।

মানদা ঝি কাজের লোক। খুঁজে খুঁজে ঠিক বের করে এনেছে প্রফুল্লকে; কিন্তু বৌদির দাদাকে এই অবস্থায় দেখবে কল্পনাই করেনি সে। জামা-কাপড় আটপৌরে, তাতে লেগেছে ডাল-তরকারীর দাগ। কোমরে গামছা বেঁধে বালতি হাতে দৌড়াদৌড়ি করছে। তাকেই খুঁজে-পেতে নিয়ে আসে মানদা এখানে।

প্রফুল্ল এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল নাওয়া-খাওয়ার কথা। কাজের মধ্যেই ডুবেছিল সে।

ঝিকে দেখে বলে,—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ। আসুন আমার সঙ্গে।

প্রফুল্ল তখন তরকারীর বালতি নিয়ে ব্যস্ত। বলে ওঠে,

—কি নিয়ে যাব? তরকারী-ডাল-মাছ! কোন্ দিকে?

হাসে মানদা,

—ওসব রেখে আসুন। বৌদিমণি আপনাকে ডাকছেন।

অবাক হয় প্রফুল্ল,

—ও, সুমি ডাকছে? তাই বলুন।

ওসব নামিয়ে রেখে সেই অবস্থাতেই এগিয়ে যায় প্রফুল্ল।

বড়বাড়ির অন্দরের বিচিত্র রাজ্যে প্রবেশ করে সে। মার্বেল পাথরে ঢাকা মেঝে।

মাথায় কোথায় ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে। দামী আসবাবপত্র—এ যেন অন্য জগৎ। একটা মস্ত আয়নায় নিজের চেহারাটাও দেখেছে সে। সেখানে তার মত ডাল-তরকারী মাখা লোক বেমানান; তবু এগিয়ে যায় সে। ঘরের মধ্যে ঢুকে চমকে ওঠে,—সুমি!

সুমিতাকে এই বেশে দেখবে কল্পনা করেনি সে। পরনে দামী শাড়ি, সারা শাড়ি থেকে ছটা বের হচ্ছে জরির। গায়ে প্রচুর গহনা। সুমিতাকে আরও সুন্দর, আরও রূপবতী দেখায়। এ যেন সেই গরীব বোনটি তার নয়, অন্য কেউ।

সুমিতা দাদার ওই বিচিত্র সাজবেশের দিকে চেয়ে থাকে।

—একি! এসব কি করেছো? সারাগায়ে কি মেখেছো?

প্রফুল্ল বলে ওঠে নিজের দিকে চেয়ে,

—ও, এই অবস্থা! আরে, তোর শ্বশুরবাড়ির কর্মচারী লোকজন সব চোর, বুঝলি? পরিবেশনের নামে সব এদিক-ওদিক করছে। নিজের চোখের ওপর তোদের এসব ক্ষতি দেখতে পারি কি করে বল? তাই লেগে গেলাম নিজেই। বুঝলি, বরবাদ হচ্ছে প্রচুর।

সুমিতা দাদার চেহারার দিকে চেয়ে থাকে।

—স্নান-খাওয়া হয়েছে তোমার?

হাসে প্রফুল্ল,—সে হবে।

সুমিতা বেশ বোঝে সে-সব কিছু হয়নি এখনও পর্যন্ত। দাদাকে সে চেনে। বলে ওঠে মানদাকে,—কিছু খাবার দিয়ে যাও দিকি এখানে।

মানদা চলে গেল খাবার আনতে।

সুমিতা বলে গলা নামিয়ে,

—এ-বাড়িতে এসব অপচয় হয়। এইটাই এদের শখ। তুমি বাপু এদিকে আর নজর দিও না। গিয়ে স্নান-টান করে কাপড়-চোপড় ছেড়ে একটু ভদ্রস্থ হয়ে থাকো।

প্রফুল্ল কি ভাবছে। বলে ওঠে সুমিতা,—ওসব এনেছো? কাপড়-চোপড়!

সুমিতা জানে তাদের সংসারের অবস্থার কথা। প্রফুল্ল কি ভাবছিল। বলে সে,

—সেই লালপাড় ধুতি আর নীল হাফসার্ট, যেটা সাবান দিয়ে কেচেছিলি, সেই দুটো এনেছি।

সুমিতা চুপ করে কি ভাবছে, এ-বাড়ির পরিবেশে দাদা একেবারেই বেমানান। এখানে এসে সে কি রকম আদর-আপ্যায়ন পেয়েছে তার নমুনাও বুঝেছে সে।

মনে হয় সুমিতার, দাদা না এলেই ভালো করতো।

সেও যেন ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এ-বাড়ির বৌ হয়ে এসে।

মানদা ইতিমধ্যে খাবার এনে দেয়।

প্রফুল্ল বুঝতে পারে খিদেটা কি রকম লেগেছিল। এতক্ষণ নানা কাজে আর ওই সোরগোলের মাঝে বুঝতে পারেনি, এইবার পারে। গোগ্রাসে গিলছে মিষ্টিগুলো। ওর মুখে-চোখে খিদের ছাপটা ফুটে ওঠে।

উঠে গিয়ে সুমিতার বলতে ইচ্ছে হয়, ও যেন এখান থেকে চলে যায়। কিন্তু তা পারে না।

অতীতের সেই দিনগুলো—মা-দাদা সব কেমন নিবিড় স্মৃতির মত তার জীবনে জড়িয়ে আছে। তাদের বাড়ির কথা মনে পড়ে।

প্রফুল্ল বলে,

—হ্যা রে, তোকে একবার যেতে দেবে তো? মা বলছিল জোড়ে যেতে হয় অষ্টমঙ্গলায়। তা, উদয়কেও বলবো ভাবছি।

সুস্মিতা চুপ করে থাকে।

বলে চলেছে প্রফুল্ল,

—আমি তো তালুইমশায়কে বললাম, তা কোন জবাবই দিলেন না। তা, উদয়কে দেখছি না? সে কোথায়? তার সঙ্গে দেখা করেই না হয় শুধোব কথাটা।

—কেন? সুমিতা এ-বাড়ির হৃদয়হীনতাকে আজ স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছে।

সুমিতার মনে সেই ফেলে-আসা দিনগুলো, সেই সবুজ পরিবেশ, মায়ের কথা মনে পড়ে। একটা ছোট্ট খড়ের ঘর যে তার জীবনে এত নিবিড় ঠাঁই দখল করেছিল, তা জানে না সুস্মিতা। তার তুলনায় এত বড় বাড়িটা তার মনে এনেছে শূন্যতা আর অজানা ভয়ের ছায়া।

সন্ধ্যা নামছে। বিরাট হলঘরটায় বসেছে গানের আসর। উদয়নারায়ণ শখ করে বাড়িতে ওস্তাদ রেখে শিখেছে বেহালা বাজানো। আরও অনেক নিমন্ত্রিত গাইয়ে এসেছে। শ্রোতারাও এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তি।

আতর ছিটানো হচ্ছে আতরপাশ দিয়ে। গালিচা পাতা, চারপাশে ফুলদানিতে ফুলগুলো সাজানো। বেহালার সুর উঠছে। বাজাচ্ছে উদয়। শ্রোতাদের মুখে মাঝে মাঝে প্রশংসা ফুটে ওঠে।

এমন সময় এই আসরে ঢোকে প্রফুল্ল। পরনে লালপাড় মোটা ধুতি আর সাবান-কাচা সেই নীল হাফসার্ট।

আগে অন্য আসর সে দেখেছিল, সেই বসন্তবাবুর আসর।

আজ সন্ধ্যায় আবার তেমনি আর এক আসরের মধ্যে এসে সে হকচকিয়ে গেছে।

মেঝেতে লাল কার্পেট পাতা, কার্পেটের ওপাশে বসেছে সারেঙ্গী, তবলচী। একজন বাঈজী নাচছে সেই কার্পেটের ওপর। সাদা একটি বিন্দুর মত ঝকমক করছে তার রুপোলী পেশোয়াজ পরা মূর্তিটা।

উদয় যেন এখানে অন্য মানুষ। প্রফুল্ল অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। সারা হলঘরে ছড়িয়ে পড়েছে সেই সুর।

উদয়নারায়ণের মত শৌখিন সঙ্গতিয়া বেশ আজ মন দিয়ে বাজিয়ে চলেছে।

প্রফুল্ল অবাক হয়ে এসব কাণ্ড দেখছে।

ঝাড়-লণ্ঠনগুলো জ্বলছে, বাতাসে উঠছে আতরের সুবাস। গ্লাসে রঙীন পানীয় ওদের হাতে হাতে।

একটু চমকে ওঠে প্রফুল্ল।

উদয়ের সামনেও একটা দামী ট্রেতে করে মদ রয়েছে।

নাচের সোমে এসে থামলে সারা হলে একটা বাহবা ধ্বনি পড়ে যায়। বাতাসে উড়ছে নোট—ছোট-বড় নোট, বাঈজীর দিকে ছুঁড়ছে ওরা।

উদয়নারায়ণের হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে কে বেহালা নামিয়ে নিয়ে মদের গ্লাসটা তুলে দিল।

প্রফুল্ল এসবের সঙ্গে পরিচিত নয়। গ্রামের ছেলে, বড়জোর যাত্রার দলে দেখেছে কিছু কিছু অভিনয় মাত্র। ওদের হাততালি থামলে এগিয়ে আসে।

সকলেই ওর দিকে চাইল।

কে বলে জড়িত কণ্ঠে,—তুমি কে বাবা? নাচবে? তা, বাইজীর নাচের পর তোমার নাচ জমবে না বাবা।

উদয় ওকে এখানে দেখে অবাক হয়।

বলে প্রফুল্ল,—বেশ বাজনায় হাত তো হে তোমার।

উদয় ওর দিকে চাইল। কেমন চিনতে পারে।

—তা আপনি, মানে তুমি এখানে কেন?

প্রফুল্ল এরই মধ্যে বসতে যাবে। বলে ওঠে,

—গান-বাজনা একটু ভালো লাগে, শুনলাম গান-টান হচ্ছে—তা চলে এলাম। তোমার দারোয়ানরা তো আটকায় আর কি! বাবা, আমি হচ্ছি বাবুর বড়কুটুম! বুঝলে, মানে 'ব্রাদার ইন ল' যাকে বলে—তবে প্রভুরা ছাড়লেন। কই হে, হোক গান-টান এক-আধটু। না হয় নাচ! তবে নাচে বটে মদন অপেরার কংস ধাড়া, কপালে বোতল নিয়ে তালে তালে যা নাচে—ফাসকেলাস!

উদয় ও তার বন্ধু-বান্ধবরা বেশ বিব্রত বোধ করে।

একজন মোসাহেব শোনায়,

—বোতল নিয়ে কেউ নাচে না বাবা, গলায় ঢালে। এমন বেতালা বকছ কেন বাওয়া! একটু ঢাল দিকি। চলে এসব?

উদয় কড়াস্বরে বলে প্রফুল্লকে,—তুমি এখন এসো।

প্রফুল্লর কোন কথাই বলা হয়নি, বিয়ের পর যাবার কথাটাও বলা হয়নি

উদয়কে। অথচ তাকে চলে যেতে বলছে এখনিই। প্রফুল্ল কি ভাবছে মোসাহেবদের মধ্যে একটু গুঞ্জরণ ওঠে। তারা বিরক্ত হয়েছে।

প্রফুল্ল বলে,—একটু কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

উদয়ের ওসব বাজে কথার সময় নেই। বলে,

—ওসব পরে হবে। তুমি এখন এসো। এখানে কথা বলার সময় নেই।

প্রফুল্ল উঠে পড়ল। বলে,—বেশ। বেশ।

একজন চাকর বাইরে দাঁড়িয়েছিল। প্রফুল্লকে বলে সে,

—তখনই বললাম যাবেন না এখন।

হাসে প্রফুল্ল,

—তোরা কি জানিস! মানে, বড়সম্বন্ধীই তো, গুরুজন—একটু ফুর্তি-টুর্তি করছে, ছেলেমানুষ—আমিই চলে এলাম। করুক, এই তো বয়েস।

প্রফুল্ল তবু এসব অপমান-হেনস্থা গায়ে মাখে না। পেছনে হলঘরে তখন আবার সুর উঠেছে। ওখানে ওই সুরের রাজ্যে প্রফুল্লর কোন আমন্ত্রণ নেই! ওরা তাকে অপমান করেই তাড়িয়ে দিয়েছে।

রাত্রি নেমেছে। আলোকমালায় সাজানো একটা মস্ত বাড়ি, লোকজন, ওই সুর—সবকিছু মিলিয়ে একটা স্বপ্নপুরী গড়ে উঠেছে। প্রফুল্ল এই জগতের বাইরের মানুষ। বাইরে থেকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ওই অচেনা জগতের দিকে চেয়ে দেখে সে। এখানকার সে কেউ নয়। তেলে-জলে মেশে না কখনও। হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সরে দাঁড়াল প্রফুল্ল।

বিষ্টু সরকারের বয়স হয়েছে। চোখেও কম দেখে। অনেকদিন এ-বাড়িতে কাজ করছে, কিন্তু সংসারের অবস্থা তার বদলায়নি।

অপ্রিয় কাজ যা করে, তা চাকরি রাখার জন্যই করে। নইলে তত বেশি ঘুণ পোকা সে নয়। তাই সেই দরিদ্রই রয়ে গেছে সে।

বাড়ি ফিরছে কাজের শেষে। হঠাৎ আঁধারে ওখানে প্রফুল্লর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েই থমকে দাঁড়াল। একটু অবাক হয়।

—শালাবাবু! মানে, বাবুর শালা তো আপনি?

—হ্যাঁ। প্রফুল্ল একটু বুক ফুলিয়েই জবাব দেয়।

—তা, রাতের বেলায় এখানে কি করছেন মশায়? বাড়িতে নাচ-গান-তামাশা চলেছে। কুটুম মানুষ—

হাসে প্রফুল্ল। ওর হাসিতে একটা বেদনার আভাষ ফুটে ওঠে। দেখেছে কেমন করে সব ঠাঁই থেকেই বিতাড়িত হয়েছে সে। তবু গায়ে মাখে না এসব।

বিষ্টু সরকার জানে বড়বাড়ির অন্তরের সেই কাঠিন্যের পরিচয়। ওরা মানুষকে সম্মান দেয় নিজেদেরই প্রয়োজনে, প্রফুল্লকে তাদের কোন প্রয়োজন নেই। তাই সে রবাহূতের দলে।

এমনি অনাদরে অবহেলাতেই পড়ে আছে।

বিষ্টু সরকার শুধায়,—থাকা হচ্ছে ক-দিন?

প্রফুল্ল কথাটা ভেবেছে। জবাব দেয়,

—কালই যাব ভাবছি। মানে, অনেক কাজ ফেলে এসেছি. থাকাতো সম্ভব নয়।

এখানে ওর মন টেকেনি। ভাল লাগেনি এদের।

সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে প্রফুল্ল,—তা, সুমি ভালোই থাকবে এখানে, কি বলেন সরকারমশায়?

সরকার ওর কথায় একটু বিস্মিত হয়।

—না থাকার কি আছে? জমিদারী রাখতে পারলে সব ঠাটবাটই চলবে।

—মানে, উদয়—তোমাদের ওই বাবু হে, ও যেন কেমন কেমন।

হাসে বিষ্টু সরকার। বলে,

—জানেন তো বড়লোকের ছেলে—ওসব এক-আটটু থাকবেই। সবদিক বজায় রেখে চললেই মঙ্গল, যা দিনকাল পড়েছে। চলি। প্রাতঃপেন্নাম।

বিষ্টু সরকার চলে গেল। তখনও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে প্রফুল্ল।

সারা মনে কি যেন চিন্তার ছায়া, কেমন ভালো লাগে না তার। সুমিতার কথা মনে পড়ে।

তার বোন যেন হারিয়ে গেল ওই বিশাল বাড়িটার আড়ালে।

রাত্রি নামছে। সুমিতা এখানের জীবনে এখনও পরিচিত হয়ে ওঠেনি। কেমন ভয় ভয় লাগে। সানাইয়ের ক্ষীণ সুরটা রাতের আঁধারে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসে জাগে মিষ্টি ফুলের সৌরভ।

ফুলশয্যার রাত্রি আজ। জীবনের একটি স্বপ্ন-দেখা রাত্রি। বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে অনেক ঠাট্টা-রসিকতা করেছে। সারা জীবন যাকে নিয়ে চলতে হবে তাকে আজ নতুন করে চেনার তিথি।

অনেক আশা আর স্বপ্ন জাগে মনে।

বিরাট ঘরখানার মাঝে বার্নিশ-করা দামী খাট। চারদিকে ওর ফুলের সাজ। সুমিতার সর্বাঙ্গে ফুলের গহনা ও ফুলের সাজ।

রাতের আঁধারে বাগানের দিক থেকে ভেসে আসে দু-একটা রাত-জাগা পাখির ডাক। ক-দিন সারা দেহ-মনে যেন ঝড় বয়ে গেছে। কোথা থেকে কোথায় উঠে এসেছে সে। কুটির থেকে রাজপ্রাসাদ। গ্রামের সমবয়সী বন্ধুরা হিংসা করেছে ওর সৌভাগ্যে।

আজ সেই পরম কামনার একটি শুভরাত্রি।

চুপ করে বসে আছে সুমিতা।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে ওঠে।

ঘরে ঢুকছে উদয়নারায়ণ। কোঁচাটা লুটিয়ে আছে, গায়ে দামী সিল্কের পাঞ্জাবী, গলায় ফুলের মালা।

ওর দিকে চেয়ে থাকে সুমিতা।

একটি মানুষ, তাকে ঘিরেই আজ থেকে জীবনের সব স্বপ্ন আর সাধনা শুরু হবে। একটা সাড়া জাগে সুমিতার মনে। সারা পৃথিবী যেন ওই ফুলের গন্ধ আর পাখির ডাকে ভরা।

উদয় এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরেছে।

একটি কামনামদির স্পর্শ জাগে ওর সারা মনে।

উদয় ওকে দেখছে। সুমিতার দুচোখ কি আবেশে বুজে আসে। উদয় জানে না এই ছন্দ। বেহালার তারে ছন্দ তোলে, লাস্য খোঁজে বাঈজীর দেহহিল্লোলে, তার কটাক্ষে। সে একটি অনাঘ্রাতা কুমারীমনের জগতের এই সুরের মাতনের সংবাদ রাখে না।

—সুমিতা।

বীণার সবগুলো তারে যেন একটি সুরেলা ছন্দ জাগে।

এগিয়ে যায় সুমিতা, জীবনের এই তার প্রথম জাগরণের পুণ্যক্ষণ।

হঠাৎ কাছে গিয়ে চমকে উঠে। বাতাসে কোথায় ঝড় বইছে, হাহাকার জাগে বাগানের গাছের পাতায় পাতায়। অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে সুমিতা,—মদ খেয়েছো তুমি! মদ খাও?

হাসে উদয়।

—তা, এক-আধটু খাই বইকি। তাছাড়া এতবড় উৎসব, আজ খাবো না? ওটা খেতে হয়। ও কিছু না। এসো।

সুমিতার সারা দেহ-মন পাথরের মত কঠিন স্তব্ধ হয়ে যায়। একটি নিমেষে সে বদলে গেছে। মনের সেই সুর ফুরিয়ে গেছে, পরিণত হয়েছে নীরব হাহাকারে।

সারা শরীরে কেমন একটা জ্বালা ফুটে ওঠে।

উদয় ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। সুমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। উদয় বিড় বিড় করে,

—লজ্জা? তা ভালো, লজ্জা নারীর ভূষণ।

সুমিতার অজ্ঞাতেই দুচোখে কেমন জলে ভরে ওঠে। উদয় ওর মনের এসব খবর রাখে না। ও জানে না সুমিতা কতখানি আঘাত পেয়েছে আজ।

দেহ-মনে একটা বুভুক্ষা জাগে উদয়ের। ওটা তার সহজাত।

ওকে কাছে টেনে নেয়। সুমিতার মনে যেন অসাড় আঁধার নামে। সে হারিয়ে চলেছে।

কান্না আসে বুক ঠেলে।

সৌদামিনী স্বামী মারা যাবার পর অনেক কষ্টে ওই ছেলেমেয়ে দুজনকে মানুষ করেছে। সুমিতাকে নিয়েই ভাবনায় পড়েছিল সে। শরীর, অনাথা বিধবার মেয়ে। থাকুক না রূপ-গুণ, লেখাপড়াও জানুক—তবু তার বিয়ে নিয়েই ভাবনা হয়েছিল। কিন্তু সে রাজ-বাড়িতেই গিয়েছে।

আজ ভালো ঘরেই বিয়ে হয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়েছে সৌদামিনী।

প্রফুল্ল ফিরেছে সুমিতার ওখান থেকে। সে বেশ জেনেছে সুমিতাকে আর সহজে তারা পাঠাবে না। তাদের বাড়ির মেয়ে ছিল যখন সুমিতা তখন আলাদা কথা। এখন সে ও-বাড়ির বৌ, তাকে পাঠানো না পাঠানো তাদের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে। তাছাড়া ওরা যে সুমিতার অতীতকে অস্বীকার করে এটা টের পেয়েছে প্রফুল্ল।

মাকে আসল কথাটা বলতে পারে না প্রফুল্ল।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করে,—কেমন দেখলি ঘর-বাড়ি? খুব মস্ত লোক-বিরাট বাড়ি না রে?

হাসে প্রফুল্ল। বলে,

—এলাহি ব্যাপার। একেবারে যাকে বলে দীয়তাং ভুজ্যতাং, আর জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি। ওদের দেখলাম এসব দিকে নজর নেই, আমি তো ভাঁড়ার আগলাতে গেলাম। ওমা, তা সুমি কি বললে জানো? বললে এদের এমন সব চলে, এটাই রেওয়াজ লুটপাট হতে দাও।

—তাই নাকি! তা হ্যাঁরে, কি কি গহনা দিয়েছে?

—তা দেখিনি, তবে তোমার মেয়েকে সোনায় মুড়ে দিয়েছে। মস্ত বাড়ি, তেমনি ব্যাপার।

তবু প্রফুল্লর মনে কোথায় বিরক্তির ভাব। সেটাকে বেশ চেপে প্রফুল্ল বলে,

—তেল দাও, চান করে আসি।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করে,—হ্যাঁরে, নতুন কুটুম গেলি, তা মানখাতির করেছে তো? প্রফুল্লর ক-দিনই শরীরের ওপর ধকল গেছে ওই হৈ-চৈ ব্যাপারে। থাকা-খাওয়ারও অসুবিধা হয়েছে। তাছাড়া সবচেয়ে বিশ্রী ঠেকেছে ওদের ব্যবহার। আসার সময় বসন্তনারায়ণ—উদয় কেউ তার সঙ্গে দেখাও করেনি।

কর্মচারীদেরই আসার কথাটা জানিয়ে এসেছে। সুমিতার সঙ্গেও দেখা করার সুযোগ হয়নি। সে ক-দিন ধরে মনে মনে কষ্টই পেয়েছে সেখানে।

প্রফুল্ল কি বলতে গিয়ে থামল, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ও-বাড়ির সেই ঘটনাগুলো। বসন্তনারায়ণ, ওই উদয়নারায়ণ—সবাই যেন এক ধাঁচেরই। নিচের দিকে চায় না ওরা। মাকে সে-সব কথা জানাতে চায় না। তাই জবাব দেয় মায়ের কথায়,

—তা করেছে বইকি! খুব খাতির যত্ন করেছে ওরা।

—কি দিয়ে বিদায় করলে হ্যাঁরে, ধুতি জোড় কিছুই তো দেখছি না।

ওসব কথা খেয়াল ছিল না প্রফুল্লর। বিদায়-সম্মানি—এসব দিকেই সে যায়নি। হাসে প্রফুল্ল,

—বড়লোকের কাণ্ডই আলাদা। একি হেঁজি-পেঁজির ঘর, যে, হাতে ধরিয়ে

কাপড়খানা ? লোকের হাতে দিয়ে পাঠাবে ওসব। আমিই বা নিজে হাতে করে বয়ে আনবো কেন ? আমার কি মান-সম্মান নেই ? কি যে বলো মা ?

কিন্তু সে-সব কিছুই আসেনি।

সৌদামিনী আশা করেছিল স্মিতাকেও পাঠাবে। একবার মায়েরও সাধ যায় দুজনকে একসঙ্গে দেখতে, তাও আসেনি উদয়। ওদের নাকি আসার রেওয়াজ নেই।

মায়ের মনে হয় মেয়েকে পর করেই দিয়েছে একেবারে।

প্রফুল্ল কোনরকমে টুইশানি আর দু-চার ঘর যজমান—এই নিয়েই পুজো-আচ্চা করে দিন চালায়। লক্ষ্মীপুজো-ষষ্ঠীপুজোর কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন নিয়ে এলে সেদিন মায়ের মন কাঁদে। মেয়ের কথা মনে পড়ে।

—হ্যাঁরে, এত ফলমূল—আজ স্মি থাকলে তবু খেতো।

হাসে প্রফুল্ল।

—তোমার স্মির বাড়িতে এসবের অভাব নেই মা। সেখানে নিত্যি-সেবার ব্যবস্থা আছে। নিতুই পায়সান্ন হয়। ওসব ছাড় দিকি।

মায়ের মন তবু বাধা মানে না।

বলে,—একবার গিয়ে বলগে না তোর তালুইকে, যদি দুদিনের জন্য পাঠান। আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। কবে কি হয়, তবু দেখে যাবো না একবার !

প্রফুল্ল জবাব দিতে গিয়ে কাকে আসতে দেখে থামল।

দীনু মুখুজ্যে পুরন্দরপুরের একজন মাতব্বর ব্যক্তি, সে-ই যোগাযোগ করিয়েছিল কন্দর্পবাবুর সঙ্গে স্মিতার বিয়ের। কন্দর্পবাবুর না হয় বয়স হয়েছিল, কিন্তু পাত্র হিসেবে মন্দ কি। তবু কন্দর্পবাবুও দীনুর উপর খুশি থাকতেন। দীনু সাতপাঁচ করে এর-ওর মামলার তদ্বির করে কিছু পয়সা করেছে। সুদি কারবারও আছে। কোনরকমে ধাপে ধাপে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে সে। আরও কিছু আশা রাখে।

তাই কন্দর্পনারায়ণকে খুশি করতে চেয়েছিল ওই বিয়ের যোগাযোগ করে। সবপ্রায় ঠিকই এমন সময় ওই ঘটনা ঘটে গেল।

দীনু মুখুজ্যেরও কিছু আমদানী হত, সেটাও ফস্কে গেল একেবারে।

কন্দর্পনারায়ণ পাত্রীপক্ষকেও কিছু নগদ টাকা দিত, প্রফুল্লদের অবস্থা সে

জানে। টাকার দায়ে বাস্তুজমিটুকু অবাধ বন্ধক পড়ে আছে। তাই সব দিক দিয়েই কন্দর্পকে মেয়ে দিলে সুবিধা হত ওদের।

কিন্তু তা হয়নি।

তাই দীনু মুখুজ্যের মনে একটু ঝাল রয়ে গেছে।

খবরটা সে-ও পেয়েছে, প্রফুল্লকে নাকি তারা বিদায়ও করেনি। বেশ বড় গলা করেই দীনু খবরটা চাউর করে গ্রামে।

দীনু মুখুজ্যেকে বাড়ি ঢুকতে দেখে চুপ করল প্রফুল্ল।

দীনু মুখুজ্যে একটা মোড়া টেনে নিয়ে যুৎ করে বসে বলে,

—তাহলে সবই তো চুকে গেল প্রফুল্ল। এইবার ভালো জামাই করেছে, কথায় বলে না, মেয়ের ভালো বর হলে, সাতছেলেব কাজ চলে। ঠাকরুণেরই বা ভাবনা কি! আমার টাকা ক-টা ফেলে দাও এইবার। বসতবাড়ি বন্ধক থাকবে, সে তো জামাইয়ের অপমান গো! রাজার শ্বশুরবাড়ি বলে কথা! কি গো বৌঠান?

সৌদামিনী চুপ করে থাকে।

প্রফুল্ল বলে,—তারা দিলেই বা নেব কেন ওদের টাকা?

হাসতে থাকে দীনু মুখুজ্যে দাঁত-পড়া মাড়ি বের করে। বলে,

—দিলে নেয় না এমন কাউকে তো এই বয়েস অবধি দেখিনি বাবা! কন্দর্পবাবুর টাকা তো নিতে চেয়েছিল রে তোর মা। এইদিকের সম্বন্ধের কথা আসতে ভাবলি তোরা, ওরাই বেশি দেবে। এখন শুনি লবডঙ্কা। পাত্তাই দেয়নি তোকে, খুব গিয়েছিলি বৌভাতে, দিলে কিছু?

যাকগে বাবা, আমাকে রেহাই দে, তাহলেই হল। কারও বাড়ি আমি চাই না বাবা। এমনিতেই আমার বদনামের শেষ নেই, আর ওসব কুড়োতে চাই না। আমার নায্য পাওনাটুকু পেলেই খুশি হবো। ব্যস।

দীনু মুখুজ্যে কথাগুলো তীরের মত ওদের মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। চুপ করে থাকে সৌদামিনী। সুমিতার শ্বশুরবাড়ির কথাও শোনে। প্রফুল্লর মুখটা কালো হয়ে ওঠে। মা বোধহয় ওদের সেই ব্যবহারের কথা শুনেছে।

প্রফুল্ল মায়ের সামনে ধরা পড়ে গেছে। সুমিতার ওখান থেকে ফিরে এসে সে আসল কথাগুলো বলেনি। মা কষ্ট পাবে ভেবেই ওসব ঘটনা চেপে গিয়েছিল।

ধূর্ত দীনু মুখুজ্যে চোট-খাওয়া সাপের মত গর্জে ফিরছে। সে-ই ওসব খবর বের করেছে নানাভাবে।

লোকটাকে ভয় করে প্রফুল্ল। এমনিতে ভয়ানক ধূর্ত। গ্রামের অনেকেই ওর কাছে নানাভাবে বাঁধা পড়ে আছে। আজ ওই দীনু মুখুজ্যের কাছেই দেনার দায়ে তাদের বাস্তুভূমি, কিছু ধানজমিও বন্ধক পড়ে আছে। ছাড়াবার সাধ্য নেই প্রফুল্লর।

তাই চুপ করেই দীনু মুখুজ্যের কথাগুলো হজম করে যায়। মনে হয় এবার ওর অত্যাচারের পর্ব আরও বাড়বে। নানাভাবে সে বিব্রত—অপমানিত করবে তাদের।

মা কি ভাবছে। তার মুখেও বেদনার ছবি ফুটে উঠেছে।

প্রফুল্ল বলে,

—বুঝলে মা, ওরা খুশি হয়নি। সুমির যে এমনি বিরাট বাড়িতে বিয়ে হবে ভাবেনি ওরা। তাই হিংসা করে।

সৌদামিনী চুপ করে থাকে।

প্রফুল্ল মনে মনে রোজগারের কথা ভাবছে। ওর গলাও ভাল। গানও শিখেছে। অনেক যাত্রার দলের অধিকারীও তাকে দলে মাইনে দিয়ে নেবার কথা বলেছিল, কিন্তু যায়নি প্রফুল্ল। মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই প্রফুল্ল বেশ তেজদৃপ্ত স্বরে বলে,

—বোন-ভগ্নীপতি বড়লোক তো আমার কি? ভারি তো ক-টা টাকা, দোব একদিন মুখের ওপর ফেলে। কি ভাবে দীনুকাকা?

প্রফুল্ল সেই দিনের স্বপ্ন দেখে।

উৎসব থেমে গেছে। মনের সেই উন্মাদনা, আকস্মিক খেয়ালটাও কমে আসছে। বসন্তনারায়ণ ক্রমশঃ অনুভব করেন ঝোঁকের মাথায় একটা মস্ত ভুল করেই বসেছেন তিনি। এতদিন সেটা ভাবেননি, এইবার ভাবছেন তাই নিয়ে।

উদয়নারায়ণের জন্য সম্বন্ধ এসেছিল তার এক পরিচিত ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকে। সতীশবাবু হালফিল বড়লোক, ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ রোজগার

করেছেন। বিয়েতে তাঁকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি নাকি কাজের চাপে আসতে পারেননি। তিনি যে এড়িয়ে গেছেন ইচ্ছা করেই, এটাও জানা যায়।

বেশ বুঝেছিলেন বসন্তনারায়ণ একটা ভুল তিনি করেছেন শুকনো মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে। দায়ে-অদায়ে সতীশবাবুই মাঝে-সাঝে টাকাকড়ি দিতেন। বিয়ের ঝোঁকের মাথায় প্রচুর টাকা বেহিসেবী খরচ করে একটু বিব্রত হয়ে গেছেন তিনি। এবার হিসেব দেখতে গিয়ে টের পান জমার ঘরে শুধু শূন্যই। সামনেই বৎসরান্তের সাল গুজারী খাজনা জমা দিতে হবে কালেক্‌টরিতে। টাকার দরকার। অন্ততঃ হাজার দশেক টাকা।

তারই জন্যে চিঠি লিখে নায়েব গোবিন্দপদকে পাঠিয়েছিলেন তিনি সতীশ-বাবুর কাছে। গোবিন্দপদ ফিরে এসেছে শুধু হাতেই।

সতীশবাবু চিঠির উত্তর লিখেও সৌজন্য জানাননি। মুখে বলে পাঠিয়েছেন, এখন নাকি তাঁর টাকার টানাটানি। থাকলে ভেবে দেখতেন।

গোবিন্দপদর কথাটা শুনে চুপ করে থাকেন বসন্তনারায়ণ। এতদিন সতীশবাবু যে আশা নিয়ে টাকা দিতেন, সে আশা আর নেই। তাই সব সম্পর্কও তুলে দিয়েছেন তিনি।

শুধু তাই নয়, গোবিন্দ নায়েবের মুখে বলে পাঠিয়েছেন আগেকার সেই বকেয়া টাকার কথাও। তাঁর এই সময় সেই টাকাগুলো পেলে কাজে লাগবে। অনেকদিন হয়ে গেছে, বসন্তবাবু যদি এইবার সেটা মিটিয়ে দেন ভাল হয়। সতীশবাবু এই বিয়ের পর থেকেই হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। রেগে উঠেছেন তখন থেকেই।

বসন্তনারায়ণ ভাবনায় পড়েন। এবার চারিদিকে তাঁর ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে। তবু কালেক্‌টরির খাজনা দিতেই হবে।

নায়েবই বলে,—টাকার যোগাড় করছি আমি, তবে তিন মাসের রোকায় দিতে হবে। আর সুদও লাগবে একটু বেশি।

—তাই করুন।

বসন্তনারায়ণ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। বেশ মনে হয় গরীবের ঘরের একটা মেয়েকে এনেই তিনি এমনি করে বিপদ ডেকেছেন, এবং এইবার থেকে এ বিপদ বেড়েই চলবে।

নায়েব বলে চলেছে,

—নানা খবর শুনছি ; জমিদারী নাকি সরকার নিয়ে নেবে। এসব খবর যতীশবাবুও বলছিলেন।

হাসেন বসন্তনারায়ণ।

—তোমার আমার দিন পার হয়ে যাবে গোবিন্দ।

তবু কেমন যেন কথাটা মনে গেঁথে থেকে যায় বসন্তনারায়ণের। বেশ অনুভব করছেন এবার শুধু ভাঙার পালাই, আঘাতও আসবে একের পর এক।

বিকেল হয়ে আসছে।

সুমিতা কয়েক মাসের মধ্যে বেশ বুঝেছে এ-বাড়িতে সে যেন সোনার খাঁচার বন্দী জীব। চারিদিকে তার শক্ত প্রাচীর। মুক্তির কোন আশ্বাস এখানে নেই। পিসীমা মনোরমাও সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকেন। সুমিতা এটা-সেটা করতে যায়, মানদা এবং আরও দু-একজন কেউ এসে বাধা দেয়।

—এসব কি করছ বৌদিমণি! সাবান কাচবে তুমি?

মাত্র কয়েকটা রুমাল, না হয় টেবিলের কভার, না হয় দু-একটা তোয়ালে, তাও কাচবার উপায় নেই। ওরা হাত থেকে কেড়ে নেয়।

বলে সুমিতা,—কেন, বাড়িতে তো এসব করতাম!

মানদা জবাব দেয়,—সে যা করতে করতে, এখানে এসব করার কথা নয়। সর দিকি। আমরা আছি কি করতে?

মশলা ঝাড়াই, মায় সুপারী কাটা পর্যন্ত নিষেধ।

হাসে সুমিতা,—তোরা কি আমাকে আলমারিতে পুতুল করে সাজিয়ে রাখবি?

সুমিতার তবু মনের একটাই একটা শূন্যতা রয়ে গেছে।

যাকে ঘিরে সবকিছু স্বপ্ন, সেই উদয় কেমন যেন দূরে দূরেই রয়ে যায়। তাকে নিজের মতে আনতে পারেনি, পারেনি নিজের পথে আনতে। সে তেমনিই বেবশ রয়ে গেছে। উদয়কে এখনও চিনতে পারেনি সুমিতা।

তবু সে স্বপ্ন দেখে একদিন সব তার ঠিক হয়ে যাবে, বেবশ ওই মানুষটাকে পোমানাতে পারবে সে। এ-বাড়িতে তাকে আনা হয়েছে ওই একটি কাজের জন্যই।

উদয় কাজকর্ম কিছুই করে না, কাছারিতেও বসে না। যা করে সেটাকে পুরোপুরি অ-কাজই বলা যায়। সেটা ক্রমশঃ টের পেয়েছে সুমিতা। বাজনা শেখার সখটা তার নেশাতেই পরিণত হয়েছে। সেই নেশার ঘোরে সে কোন্

অন্ধকার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। বাঈজীও আছে বাগানবাড়িতে। তার পেছনে বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ হচ্ছে। সুমিতাকে সে এড়িয়ে চলে। কিন্তু সুমিতাও তাই মনে মনে কঠিন হয়ে উঠেছে। উদয়কে পথে আনতে পারে সে।

মনের এই সান্ত্বনার জন্যই যেন ঠাকুরবাড়িতে যায়।

শ্বেতপাথরঢাকা মন্দিরের পই সুন্দর দেবতার দিকে চেয়ে দুচোখ বেয়ে জল নামে। মালা গাঁথে, পুজোর আয়োজন করে।

তবু একটা কাজের মধ্যে মনের সেই জ্বালা খানিকটা ভোলবার চেষ্টা করে পিসীমা জানেন সুমিতার জীবনের এই ব্যর্থতার খবর।

মন্দিরের আরতির সময় তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিতা। দেবতার মুখে পড়েছে পঞ্চপ্রদীপের আলো, কেমন উজ্জ্বল দেখায়।

মনে মনে আকুতি জানায় সুমিতা ওই দেবতার পায়ে। ওর নম্র নমস্কারে সারা মন লুটিয়ে পড়ে। কামনা জানায়, আমাকে সার্থক কর। আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর ঠাকুর।

পিসীমা সমবেদনার চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকেন। সান্ত্বনা দেন,— ঠাকুর দয়াময়, বুঝলি মা। সব কামনা সে পূর্ণ করবেই।

তবু কোথায় একটা নীরব জ্বালা জাগে সুমিতার সারা মনে।

সন্ধ্যা হয়। দেউড়ির একক আলোটা জ্বলছে, ছাদের উপর থেকে দেখা যায় আঁধারে ওই আলোটুকু। বাগানের গাছে গাছে ফুলগুলো সব জেগে উঠেছে, বাতাসে তাদের সুবাসের খবর ছড়িয়ে যায় চারিদিকে। নীরব কান্নায় যেন কাঁদছে ব্যর্থ কোন নারী।

উদয়ের মনের খবর সে পায়নি। অধিক রাত্রে আসে উদয় কোথা থেকে আড্ডা মেরে, না হয় বাগানবাড়ি থেকে। সন্ধ্যার দিকে সে বাড়ি ফেরে না। এটা বসন্তনারায়ণও টের পেয়েছেন। হতাশ হয়েছেন তিনিও।

সুমিতা চুপ করে বসে আছে নিজের ঘরে।

এই দিককার বারান্দা হয়ে আজ বসন্তনারায়ণ নিজের মহলে যাচ্ছেন, হঠাৎ যেন ইচ্ছে করে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুমিতাকে সামনে দেখে।

বসন্তনারায়ণের চোখেমুখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

আজই গোবিন্দ নায়েব সেই খবরটা দিয়েছে। সতীশবাবু টাকা দেননি, তাছাড়া নাকি জমিদারীই থাকবে না এবার।

সতীশবাবু সেই খবর পেয়েছেন, তাই বোধহয় আর তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চান না। তাছাড়া উদয়ের বিয়েও তিনি দেননি তাঁর মেয়ের সঙ্গে। সতীশবাবু এতে অপমানিতই হয়েছেন।

বসন্তনারায়ণ একজন প্রকৃত বন্ধুকে হারিয়েছেন নিজের এই ভুলের জন্যই। তবু যদি সুমিতা এ-বাড়ির বৌ হয়ে এসে উদয়কে ফেরাতে পারতো, তিনি এই ক্ষতিও সহ্য করতে পারতেন।

উদয় কাজকর্ম দেখতো—জমিদারীর শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে যদি কোন ব্যবসা-পত্র সুরু করতো তাহলে হয়তো শেষরক্ষা হতে পারতো। বসন্তনারায়ণবা আশ্বস্ত হতেন।

কিন্তু তাও হয়নি। উদয় তেমনি বেবশই রয়ে গেছে।

সুমিতাব রূপ দেখেই ভুলেছেন তিনি। ওর ব্যক্তিত্ব এ-বাড়ির মানুষদের মনে কোন রেখাপাতই করেনি।

তাই উদয় ওকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

বসন্তনারায়ণবাবুর সামনে জমাট অন্ধকার। কোথাও কোন আশা—সান্ত্বনা নেই। সুমিতাও তাকে নিদারুণভাবে ব্যর্থ করেছে।

এত ক্ষতি সয়েও যাকে এ-বাড়িতে আনলেন, সে এ-বাড়ির গৃহলক্ষ্মী নয়—অশুভ অমঙ্গলের দূত হয়ে উঠেছে।

সুমিতা এ-বাড়িতে আসার পর থেকেই কেমন জটিলতা আর বাধা আসতে সুরু করেছে একটার পর একটা।

বসন্তনারায়ণ সুমিতাকে দেখে একটু গম্ভীর হয়ে ওঠেন।

ওঁর মুখ-চোখে ফুটে ওঠে কঠোর কঠিন একটু ভাব। বসন্তনারায়ণ প্রশ্ন করেন,

—উদয় ফিরেছে?

সুমিতা ওই প্রশ্নের আড়ালে কি শাসনের আভাষ আছে সেটা বুঝতে পেরেছে। সুমিতা সেই নির্দেশ যে পালন করতে পারেনি এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বসন্তনারায়ণ।

সুমিতার মনে সেই ব্যর্থতার বেদনা বুক ঠেলে আসে। কথা বলবার সাধ্য তার নেই।

মাথা নাড়ে সুমিতা,

—এখনও ফেরেননি।

বসন্তনারায়ণবাবু একবার ওর মুখের দিকে চাইলেন।

সুমিতা জানে ওই নীরব দৃষ্টির অর্থ। সবই জানেন বসন্তবাবু, বেশ জানেন উদয় গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরে। জেনে-শুনেও একটা নীরব আঘাত দেবার জন্যই কথাটা জিজ্ঞাসা করে গেলেন। ওর সেই নির্দেশ যে পালিত হয়নি, সুমিতাকে সেইটাই জানিয়ে গেছেন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিতা। বুঝেছে উদয়ের এই স্বভাবটার জন্য তিনি যেন পরোক্ষভাবে সুমিতাকেই দায়ী করেন আজও। সুমিতা উদয়কে ফেরাতে পারেনি ওই পথ থেকে। এ-বাড়ির অন্তরে যে কঠিন শাসনের ভ্রূকুটি রয়ে গেছে তা বেশ অনুভব করেছে সুমিতা। নিজের পরাজয়টাকেই বড় করে দেখে সে হেরে গেছে।

রাত হয়ে গেছে। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। ঝি-চাকররাও শুয়ে পড়েছে। সুমিতার চোখে ঘুম নেই। সারা মনে নীরব চিন্তার ছায়া। নারকেল গাছের পাতায় রাতের বাতাস নাড়া দেয়, ভীত আর্তরবে মর্মর তুলেছে ওই গাছগুলো। দু-একটা রাতজাগা পাখি আর্তনাদ করে ওঠে। উদয়কে ঘরে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইল সুমিতা।

উদয়ের ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবার মত অবস্থা নেই। আজ উদয় ওর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়।

সুমিতা এতদিন শুধু নীরবে দুঃখই পেয়ে এসেছে, আজ সে বুঝেছে প্রতিবাদ করতে হবে। বলে উদয়,

—এখনও বাসর জাগিয়ে আছ যে? ঘুমোওনি?

সুমিতা এগিয়ে আসে না। জানলার কাছ থেকেই জবাব দেয় শুকনো কণ্ঠে,—ঘুম আসছে না।

উদয় কোনরকমে জামাটা টেনে খুলে ওদিকে ফেলে দিয়ে বলে,

—আমার কিন্তু খুব ঘুম আসছে।

সুমিতা বলবার চেষ্টা করে,—বাবা খোঁজ করছিলেন তুমি ফিরেছ কিনা।

বিড়বিড় করে বলে চলেছে উদয়,—খোঁজ করতে দাও। ওসব ছাড় দিকি,

ঘোতে দাও এখন। ওরা খুঁজবেই। ওরা খুঁজবে, তুমি খুঁজবে। যেতে দাও।

সুমিতা বলবে ভেবেছিল অনেক কথা, সব কেমন ঘুলিয়ে যায়। ওর দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। উদয় বিছানায় এলিয়ে পড়েছে। অসাড়ে ঘুমোচ্ছে ও। যেন প্রাণহীন, বিবেকহীন একটি জড়পদার্থ। সুমিতার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে, নিজেকে এত অসহায় কখনও বোধ করেনি সে।

উদয়নারায়ণ সে খোঁজও রাখেনি, একটি নারী কি নীরব বেদনা বুকে নিয়ে পাশেই শুয়ে আছে। দুজনে যেন দুটি অজানা দ্বীপ। দুজনকে ঘিরে রয়েছে ঊর্মিমুখর সমুদ্র আর লবণাক্ত অতল বারিরাশি। সব বিচ্ছিন্ন—সম্পর্কহীন।

সুমিতা মনে মনে কি ভাবছে।

উদয়ের এই অবজ্ঞার মূল একটা কোথাও আছে। তারই অনুসন্ধান করছে সে। তারাগুলো জ্বলছে—হু হু রাতের বাতাসে জাগে দীর্ঘশ্বাস।

মানদা ঝি এ-বাড়ির জীবনের সঙ্গে অনেকদিন পরিচিত। অনেক কিছুই দেখছে সে। কাছারিবাড়িতেও তার যাতায়াত আছে। মানদা এ-বাড়িরই একজন হয়ে উঠেছে।

বিষ্টু সরকার দুপুরবেলায় একটু ঝিমোচ্ছে খাতা-ঘরে বসে। এদিক-ওদিকে চোখ ঘোরাতে দেখা যায় বাঁধা স্তূপীকৃত রেকর্ড, পড়চা, জমাবন্দী, খতিয়ানের খাতা।

কাঠের হাতবাক্সের এ-পাশে মাটির দোয়াতদান, ওরই গর্তে চাট্টি বালি রাখা আছে কালি শুকোবার জন্য। কাৎ হয়ে বিষ্টু সরকার ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে। এ-সময় কাছারি প্রায় নির্জন হয়ে যায়। প্রজাপাটকরা চলে গেছে, বসন্তনারায়ণও উঠে গেছেন দোতলায়। ফিরবেন সেই বিকেলে জলটল খেয়ে।

বিষ্টু সরকার এই সুযোগে দিবানিদ্রাটা সেরে নিচ্ছে। হঠাৎ মানদা এসে চাট্টি বালি নিয়ে ওর নাকের খোঁদলে দু-একদানা ফেলে দিতেই প্রচণ্ড শব্দে হেঁচে ওঠে বিষ্টুচরণ। একটা—দুটো—যেন বোমা ফাটছে।

সদ্য-ঘুম-ভাঙা লাল চোখ মেলে মানদাকে দেখেই ওর দিকে চাইল বিষ্টু। রাগতে গিয়ে পারে না। সেই রাগ রাগ ভাবটা মুখ থেকে মুছে গিয়ে হালকা হাসি ফুটে ওঠে।

—মানদা…কথাটা বলতেও পারে না।

প্রবল বেগে আর একটা হাঁচি আসে,—হ্যাচ্চো।

মানদা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খিলখিলিয়ে হাসছে। হাসি থামিয়ে বলে,

—এখনি ঘুম! ওরে বাবা! এ যে কুম্ভকন্নো গো!

সরকার একটু ধাতস্থ হয়ে বলে,—ঘুমই দেখলি, এবার ঘুম ছুটে যাবে সে তো ভাবছিস না মানদা?

—কেন গো? নাও, পানটা ধর।

মানদা চেপে বসছে একটা টুলে। বিষ্টুচরণ এক গেলাস জল খেয়ে পান মুখে দিয়ে বলে,

—আবার কি! জমিদারী-টমিদারী সব নিয়ে নিচ্ছে সরকার। আম ঘুম তো যেতে বসেছে, কিন্তু যাদের সমূহ বিপদ তাদের এখনও হুঁশই নেই। তোদের বাবুর কথা বলছি। ওই ছোটবাবুর কথা। বুঝলি, যখন সব্বোনা আসে তখন মানুষের মতিভ্রম হয় রে। ওরও তাই হয়েছে।

মানদা কথাগুলো ভাবছে। এতদিন এসব ভাবেনি। অন্দরে বৌরাণী দেখে থেকে এসব ভাবছে সে। লক্ষ্মী প্রতিমার মত মেয়েকে পায়ের নি ফেলে রেখেছে ছোটবাবু। তার দিকে ফিরেও চায় না।

বিষ্টু সরকার বলে,—এদিকে দেনায় ডুবছে সব, বদখেয়াল তবু ছাড়েনি। মুজরোর খরচা গেছে তিনশো টাকা। ক-দিন এমন করে চলবে কে জানে?

মানদা এদিক-ওদিক চেয়ে বলে,—আবার মুজরো? কে এল গা?

—কে জানে কোন্ বাঈ? বাগানবাড়িতে রয়েছেন। বিষ্টু জবাব দেয়।

মানদা কথাটা ভাবছে।

সে-ও দেখেছে উদয়নারায়ণ কেমন যেন মাত্রা ছাড়িয়ে চলেছে। বৌদির জন্য কষ্ট হয়। ও শুধু চোখের জলই ফেলছে।

বলে চলেছে সরকার,—দেখা যাক, লপ্চপানি কদ্দিন টেঁকে। তারপরই ফৌত!

মানদা বলে ওঠে,—তোমার তো তালে ঘুম আর হবে না এমনি যুৎ করে!

—হবে কোত্থেকে! এইবার শুনছি জমিদারী যাবার কথা হলে খাসমহল জমি এদিক-সেদিক সব পেছনের তারিখ দিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে বন্দোবস্ত করতে হবে। ওইটুকু গেলেই তখন জমিদারী উঠবে সিকেয়। ব্যস, হা গেল—তারপর?

মানদা ভাবনায় পড়েছে। বলে ওঠে বিষ্টু,—তারপর! কথাটা তো
নলি না মান্থ। কত করে তোকে বললাম!

হাসছে মানদা।

সরকার একটা জায়গাতে অত্যন্ত দুর্বল। কেমন যেন নেশা লেগেছে
চার। মানদা ওর দিকে চেয়ে হাসছে।

—ওই তোর দোষ মান্থ। এত হাসিস না।

সরকারের কথায় বলে ওঠে মানদা,

—তবে কি কাঁদব? এ-বাড়ির সবাই তো কাঁদে, আমিই না হয় হাসলাম
একটু। ক্ষেতি আছে?

সরকার ওর দিকে চেয়ে থাকে। হাসলে মানকে অনেক সুন্দর দেখায়।

দুপুরের মিষ্টি রোদ লেগেছে নারকেল গাছের চিরল পাতায়। শুদ্ধ
বাড়িটা। বাগানের দিক থেকে একটানা উদাস সুরে একটা ঘুঘুর ডাক ভেসে
আসে, তাতে মিশেছে ওই দূর সবুজ বেণুবনসীমা ঘেরা মাঠ থেকে ভেসে আসা
কোন রাখালবাঁশীর মেঠো সুর।

বিকেলে শ্বশুরমশায়ের জলখাবার নিজে তৈরি করে সুমিতা।

আজও জলখাবার নিয়ে চলেছে তাঁর ঘরের দিকে। ঘরের সামনে এসে
ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ভিতরে যাবার সাধ্য তার নেই।

বাইর থেকে কথাগুলো শুনে চমকে উঠেছে সুমিতা।

বসন্তনারায়ণ ক-দিন ধরেই ভাবছিলেন কথাগুলো। আজ বোনকে না
বলে পারেন না। একটা বিহিত হওয়া দরকার। চুপ করে এইসব আর সহ্য
করা যায় না। অন্যসময় হলে তিনি হয়তো এসব নিয়ে এতখানি ভাবতেন
না। কিন্তু এবার দিন বদলাচ্ছে।

এতদিনের জমিদারীর এই সচ্ছল জীবনযাত্রার গতিরুদ্ধ হয়ে যাবে, ছিটকে
পড়বে বিরাট বনস্পতি—এতদিনের নিশ্চিন্ত জীবন। উদয় তবু এসব কথা
ভাবেনি। সে এখনও তেমনিই রয়ে গেছে। অন্যভাবে বাঁচার পথ খুঁজতে
হবে একথাটা তার মনে একবারও উদয় হয়নি। সুমিতাও সেটা বোঝাতে
পারেনি তাকে। বসন্তনারায়ণ বৌ-এর উপর মনে মনে রেগে উঠেছেন।

এতদিন ভেবেছিলেন বিয়ের পর নতুন বৌ এসে উদয়ের ভার নেবে। রূ
ওর আছে। সুমিতা সেই রূপ দিয়েই উদয়কে ভোলাবে, পথে আনবে।

সেই আশাতেই এতদিন পর্যন্ত অনেক কিছু সহ্য করে অপেক্ষা করেছিলেন

কিন্তু তা হয়নি।

উদয় তেমনিই রয়ে গেল। বরং বেড়েই চলেছে। কোন এক বাঈজী
নাকি ঘরে ফিরে আসছে বাগানবাড়িতে।

এদিকে সতীশবাবুর মত বন্ধুকে হারিয়েছেন নিজের ভুলে।

ওদিকে কন্দর্প মুখুজ্যের ভাবী চতুর্থ পক্ষের বৌকে এখানে আনার জন্য
কন্দর্পও ক্ষেপে উঠেছে। দুটো কেসও শুরু হয়েছে। ঘরে-বাইরে শত্রু
হয়ে গেছে অনেক।

তারপর সামনে ভীষণ বিপদ। জমিদারী যদি সত্যি সত্যিই চলে যায়
কোথায় দাঁড়াবেন তাঁরা ভাবতেই পারেন না। কিছু টাকা নগদ দেবে, কিছু
পাওয়া যাবে খাসমহল ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে দিয়ে। কিন্তু একবারই পাওয়া
যাবে মাত্র সে টাকা।

কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করলে—কোন পথ হবে বাঁচার, না হলে সমূহ বিপদ
বসন্তনারায়ণ সব দিক থেকে ভাবনায় পড়েছেন। তাই বলেন আজ বোনকে
সেই কথাগুলোই বসন্তনারায়ণ।

সুমিতা ঘরের বাইরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

বসন্তনারায়ণ বলে চলেছেন,

—সব হিসেব আমার ভুল হয়ে গেল মনো। ভেবেছিলাম বিয়ের পর
উদয় একটু সমঝে চলবে বৌমা তাকে শোধরাবে—তাও হল না। এদিকে
সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে। উদয় মানুষ না হলে কোথায় দাঁড়াতে হবে কে
জানে? আজ মনে হয় মস্ত ভুল করেছি ওই গরীবের ঘর থেকে মেয়ে এনে
তখন এসব কথা ভাবিনি।

মনোরমা দাদার দিকে চেয়ে থাকেন। বসন্তনারায়ণের মুখেচোখে চিন্তার
ছায়া নামে।

বলে চলেছেন তিনি,—লক্ষ্মী বলে যাকে ঘরে আনলাম, দেখলাম সে লক্ষ্মী
নয় অলক্ষ্মী। নাহলে বিয়ের পর ওর আসার সঙ্গে সঙ্গেই এমনি করে
চারিদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসে?

মনোরমা বলে ওঠেন,—এসব তোমার ভুল ধারণা। কীই বা বয়েস

বৌমার, আমিও বলব, উদয়কেও তুমি একটু বল দাদা। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বল— বৌমার কি দোষ?

বসন্তনারায়ণ বলেন,—সবই আমার অদৃষ্টের দোষ মনো। তবে কি জানিস? গরীবের মেয়ে এই সম্পদের মধ্যে এসে ওর আসল সম্পদের কথা ভুলে গেছে। গহনা শাড়ি সম্পদ নিয়েই ভুলে থাকলো, স্বামীর দিকে নজর দেবে কখন?

বাইরে সুমিতা কথাটা শুনে চমকে ওঠে। এটা সত্য নয়। ভিতরের ঘরে মনোরমা বাধা দেবার চেষ্টা করেন।

—না দাদা, বৌমা তেমন নয়। উদয়ই—

বসন্তনারায়ণ হতাশ স্বরে বলেন,—অল্প বয়সে ওর মা মারা গেল। মা-মরা ছেলেকে তখন আদরই দিয়েছি, তখন ভাবিনি যে এই আদরই ওর সর্বনাশ ডেকে আনবে। ওকে শাসন করতে বল মনো।

সুমিতা ঘরে ঢুকতে গিয়ে থেমেছে। কথাগুলো ওর কানে গরম সীসের মত একটা তীব্র জ্বালাকর অনুভূতি আনে। দরজার ভিতরে ঢুকবে কিনা ভাবছে সুমিতা।

নিজের সারা শরীর কাঁপছে। মুখে-চোখে লাল আভা ফুটে উঠেছে। এদিক-ওদিক দেখছে। কোন ঝি-চাকরের নজরে যেন না পড়ে। কেমন দুঃসহ লজ্জা বোধ হয় সুমিতার। সরে আসবার পথও নেই।

এ তারই অক্ষমতার পরিচয়।

শুধু তাই নয়—মেয়েদের সবচেয়ে দুরপনেয় কলঙ্ক ওই লক্ষ্মীশ্রীহারা—সেই নামেই ওকে অভিসিক্ত করতে চান বসন্তনারায়ণ। মনে হয় গরীবের ঘরের কাঙাল মেয়ে রাজবাড়িতে এসে যা পেয়েছে সেইটুকু নিয়েই তৃপ্ত হয়ে গেছে। তার চেয়ে বড় কিছু পাবার চোখ তার নেই। এ-কথাটা ওরা ভাবে। ওদিকের বারান্দায় কাকে দেখে জ্ঞান ফেরে তার।

মানদা ওকে দেখছে। কি ভেবে সুমিতা সাহসে বুক বেঁধে ঘরের ভিতর ঢুকল খাবার নিয়ে।

বসন্তনারায়ণ চুপ করে গেলেন, মনোরমাও। সুমিতা লক্ষ্য করে, বসন্তনারায়ণ তাকে দেখছেন সন্ধানী দৃষ্টিতে। ওঁর সেই দৃষ্টিতে খুশির কোন ভাব নেই।

চিন্তার কালো মেঘ নেমেছে। কি যেন সর্বনাশের ছায়া ঘনিয়ে আসছে।

সুমিতারই ভয় করে ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে। নিজের দৈন্যটাই বড় হয়ে ওঠে।

চুপ করে খাবার দিয়ে বের হয়ে এল সে।

মানদা তার জন্যই অপেক্ষা করছিল বাইরের বারান্দায়।

সুমিতা বের হয়ে নিজের ঘরের দিকে চলেছে। মানদা ওকে দেখছে। সুমিতার সুন্দর ফর্সা মুখখানা কেমন লাল হয়ে উঠেছে বেদনায়, অপমানে।

সুমিতা নিজের ঘরে এসে চুপ করে বসল। মনটা ভাল নেই। উদয় বের হয়ে গেছে দুপুরে খাওয়ার পর, এখনও ফেরেনি।

তার দিকে ফিরেও চায় না এ-বাড়ির কেউ।

পাথরের শক্ত বাড়িটার মত এ-বাড়ির মানুষগুলোর অন্তরও শক্ত, দয়া-মায়াহীন। এরা সমবেতভাবে যেন পরিহাস করছে একটি গরীবের মেয়েকে। দয়া করে এখানে ঠাঁই দিয়ে তাকে দলে পিষে টিপে নিঃশেষ করতে চায়। কেউ তার দিকে মুখ তুলেও চায় না।

উদয়ও তাই নির্বিকার, নিরাসক্ত। দয়া করে এই বাড়িতে স্ত্রীর অধিকার দিয়েছে, তাই নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হবে সুমিতাকে। এর বেশি চাওয়ার অধিকার যেন নেই।

এই কথাটা সে বিশ্বাস করতে চায় না। সুমিতা আঘাতের পর আঘাতে কঠিন হয়ে উঠেছে।

উদয়নারায়ণ কি যেন দুর্বার স্রোতের আবর্তে ভেসে চলেছে।

হীরা বাঈজী এসেছিল তার বিয়ের সময়, তখনই কেমন নেশা লেগেছিল উদয়ের তরুণ মনে। মদের চোখে ওকে দেখেছিল, শুনেছিল ওর গানের সুর। গোলাপী নেশার আমেজে ওর নাচের তালে ঘূর্ণায়মান সুগঠিত দেহ-ভঙ্গিমা উদয়ের সারা মনে তুফান তুলেছিল। তাই হীরা বাঈজীকেই আবার এনেছে উদয় বাগানবাড়িতে। তার সঙ্গে বেহালা সঙ্গত করে তৃপ্তি পায় উদয়।

ক্রমশঃ লুব্ধ পতঙ্গের মত সে এগিয়ে এসেছে ওর দিকে। হীরাও তা জানে। তাই সে-ও এই সুযোগে কিছু গুছিয়ে নিতে চায়।

বাগানবাড়িতে নাচের মুজরো চলেছে। উদয়নারায়ণ নিজেই ওর গানের সঙ্গে বেহালা বাজায়। ঠুংরীর করুণ সুর উঠেছে রাতের বাতাসে।

পিয়া সনে মিলন কি আশ সখি রে।

ব্যাকুল কামনায় কোন অন্তর তীব্র বেদনায় নীল হয়ে রাতের আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

উদয়ের মনে কোন ভাবনা-চিন্তা রেখাপাতও করে না।

উদয় তার নিজের জগৎ নিয়েই রয়েছে।

এখানে প্রত্যহের কোন সমস্যার কালো আঁধার নামে না। জীবন এখানে বাধা-বন্ধহীন।

বাইরের জগতের অভাব, কষ্ট এখানে প্রকাশ করে না, ভবিষ্যৎ এর কোন ভাবনাই এই উছল জীবনের গতিকে রুদ্ধ করে না।

কিছু ইয়ারবক্সীও আছে উদয়ের। মধুর লোভে মৌমাছি ভিড় করে ফুলকে কেন্দ্র করে, তেমনি উদয়ের টাকার জন্য আর মদের লোভে তারাও ভিড় করে উদয়ের চারিপাশে।

বাগানে বাঁধানো পুকুরের চাতালে হীরা বাঈজীর নাচগানের আসর বসেছে। চাঁদের আলো উছলে পড়ে পুকুরের জলে। রাতজাগা দু'একটা পাখী কলরব করে আবার থেমে যায়।

রাত নেমেছে।

মহফিল শেষ হয়ে গেছে। ইয়ারবক্সীর দল জানে রাত গভীরেও উদয়-নারায়ণ এখানে থাকবে, প্রায়ই থাকে। তাই তারা পান ভোজন পর্ব শেষ করে উদয়নারায়ণের জুড়ি গাড়িতে সমাসীন হয়ে ফিরে গেছে যে যার ঘরে।

উদয় একাই রয়েছে এই স্বপ্নপুরীতে, চোখে নেশার গোলাপী আমেজ। দেখছে সে হীরা বাঈজীর যৌবন মাতাল দেহটাকে।

উদয় ওই দেহ যমুনায় যেন নিজেকে নিঃশেষ করতে চায়।

হীরা বাঈজীও দেখেছে ব্যাপারটা।

উদয়নারায়ণের বেহালার হাত সত্যিই মিষ্টি আর বাজায়ও অপূর্ব। হীরা বাঈজী তাই ওর বেহালায় মুগ্ধ হয়েছিল।

হীরাবাঈও জাত শিল্পী।

কিন্তু ভাগ্যদোষে এই পথে আসতে বাধ্য হয়েছে। তবু তার শিল্পীসত্বার বিলোপ ঘটাতে সে চায় না। তাই উদয় নারায়ণের এই বাড়াবাড়িটাকে সেও ঠিক পছন্দ করে না।

নানাভাবে এড়াতে চেয়েছে ওকে।

কিন্তু উদয়নারায়ণ ধীরে ধীরে কি মোহের অতলে হারিয়ে গেছে।

হীরা বাঈজী বলে—বাবুজী, রাত হয়েছে। ঘরে যাবেন না ?

—ঘর! জড়িতকণ্ঠে বিড়বিড় করে উদয়।

দুহাতে সে হীরার নরম নিটোল দেহটাকে যেন অধিকার করতে চায়। উদয় বলে,

—ঘর, তুমিই আমার সব হীরা! আর আমার কিছু নেই কেউ নেই!

হীরা বলে—এসব কি বলছেন বাবুজী! এতবড় খানদানের ছেলে আপনি! চলুন গাড়িতে উঠবেন।

হীরা আজ ওকে এড়াতে চায়।

উদয়ও সেটা বুঝেছে। বলে সে—এড়াতে চাও আমাকে ?

হীরা নিজেকে ওর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে বলে।

—না। কাল আবার সন্ধ্যায় আপনার এন্তাজার করবো—আজ যান।

উদয়ের চেতনাটা নেশার ঘোরে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। হীরার গায়ে ভর দিয়ে উঠল উদয়।

কাল ফিরিয়ে দেবে না তো ?

হীরা বলে—না।

কোচম্যানেও ধরাধরি করে ছোট হুজুরের নড়বড়ে দেহটাকে গাড়িতে তুলে বাড়ির দিকে রওনা হোল।

রাত কত জানে না সুমিতা।

তার জীবনে এমনি বহু জাগার রাত্রি কেটেছে কি ব্যর্থ প্রতীক্ষায়। উদয় নারায়ণ, তার স্বামীর এই নেশাকে সে দূর করতে পারেনি।

এ তারই অক্ষমতা, নারী জীবনের চরম ব্যর্থতা।

সুমিতা জানে না কি তার দোষ, তার স্বামী কি চায় ? অথচ দেখেছে এ বাড়িতে তার শ্বশুরমশায় থেকে সুরু করে প্রায় সকলেই তার নিজের স্বামীকে বশে আনার অক্ষমতার জন্য নীরবে তাকেই দোষী করেছে।

সুমিতা যেন তার কর্তব্য পালন করতে পারেনি।

কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি সে করেনি। চেষ্টা করেছে সুমিতা নানাভাবে তার স্বামীকে ওই বাইরের নেশা থেকে ফিরিয়ে আনতে ঘরের মধ্যে। কিন্তু

পারে নি। বার বার হার মানতে হয়েছে তাকে। তবু চেষ্টার ত্রুটি সে করেনি।

রূপ যৌবনের কমতি তার নেই। আজও সুমিতা নিজেকে সাজিয়ে তুলে স্বামীর পথ চেয়ে রাত জেগে আছে বাসরসজ্জিকার বেশে। হয়তো আজও বিফল হবে এই প্রতীক্ষা, ক্রমশঃ সুমিতার নারীমনও বিদ্রোহ করতে চায়।

স্তব্ধ রাত্রি। দেউড়ির আলোটা জ্বলছে হঠাৎ দূর থেকে জুড়ি গাড়ির শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে চাইল সুমিতা।

চমকে ওঠে, গাড়িটা ফিরেছে। সুমিতার মনে হয় উদয় আজ ফিরেছে তার ঘরে।

তারই জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকে সুমিতা।

উদয়কে ঢুকতে দেখে থামল সুমিতা। একটা ঝড়ো কাকের মত ঢুকছে সে। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো, দামী পাঞ্জাবীতে পানের দাগ। কোঁচাটা লুটোচ্ছে। সুমিতাকে দেখে চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করে,

—তুমি?

সুমিতা জ্বালাভরা কণ্ঠে বলে,—কেন, চিনতে পারছ না?

—চিনব কি করে, এ যে বাঈজীর মত সেজেছ মাইরী!

দপ্ করে জলে ওঠে সুমিতা। বাঈজীর মত সেজেছে সে! নিজেকে অনেকখানিই অপমান করেছে সুমিতা।

মাথার ফুলসাজ খুলে ফেলে টেনে, ছিটিয়ে ফেলে দেয় সব কিছু। নীরব রাগে জ্বলছে সে।

এগিয়ে আসে সুমিতা।

—বাঈজী ছাড়া তোমার নজরে আর কিছু পড়ে না?

ওর কথায় অবাক হয়েছে উদয়। বলে ওঠে,

—ওরা ভালো। খুব ভালো।

ঘৃণাভরে চেয়ে থাকে সুমিতা। লোকটার সারা মনে কেমন যেন থিক থিক করছে নরকের পূতিগন্ধ।

বলে ওঠে,—বাড়ির কথা, আমার কথা—কিছুই মনে পড়ে না? বাবা কি বলেন তাও শোন না?

হাসছে উদয়।

—ওসব ছেড়ে দাও। হীরা কি বলে জানো? আমাদের হীরা বাঈজী?

লুট লে, লে মুসাফির
জিন্দগী ছুট্‌ কে যায়।
জিন্দগী ফির মিলে তো
জোয়ানী ফির না আয়॥

মুসাফির, জীবন চলে যাচ্ছে, মজা লুটে নে। আসছে জন্মে যদি বা কখনো ফিরে আসো, যৌবন ফিরে পাবে কিনা তা জানা নেই। তাই যে কদিন আছো লুটে নাও।

সুমিতা ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলে,

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তুমি কি মানুষ, না—

কথাটা উচ্চারণ করতে সুমিতার বাধে। তার সারা মন নীরব জ্বালায় ভরে উঠেছে। আজ সে প্রতারিত। এতবড় বাড়িটা, ওই লোকগুলো তাকে নিঃশেষে ঠকিয়েছে। মনে মনে শক্ত হবার চেষ্টা করে সুমিতা।

শক্ত তাকে হতেই হবে। এ-বাড়ির অন্তরের সেই কাঠিন্যকে সে জয় করবে।

উদয় ওর দিকে চেয়ে আছে।

সুমিতা কি ভাবছে। বাগানবাড়ি···হীরা বাঈজী···। উদয় কেমন যেন বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সুমিতার দিকে। এগিয়ে আসে উদয়।

—রাগ করেছ? ওকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করে।

সুমিতা ওর দিকে চাইল। উদয়ের হাতখানা ওর হাতে, কেমন যেন পাষাণের বুকে ধীরে ধীরে সাড়া জাগছে।

সুমিতার সারা দেহ-মন কাঁপছে। সে ওকে এমনি করে নিজের কাছে টেনে নিতে চায়। পথহারা ওই মানুষটা জীবনের সত্যকার ভালোবাসার স্পর্শ পায়নি। কোথায় একটা অন্তহীন শূন্যতা রয়ে গেছে। সেই শূন্যতার বেদনাকে ভোলবার জন্য সে ওই নেশার অতলে ডুবিয়ে দিতে চায় নিজেকে। সুমিতার মনের সেই কথাটা সমবেদনা আর ভালোবাসার রঙে ভরে ওঠে। উদয়কে সে-ও আজ কাছে পেতে চায়। ওর সেই বেদনার ভাগী হতে চায়।

সুমিতার সব বাধা দূর হয়ে গেছে। এমন করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সে ওকে বাঁধতে চায়, তুষ্ট হতে চায়, জয় করতে চায়। আজ সব সে ভুলে গেছে।

উদয়ের বুকে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিঃস্ব হতে চায় সুমিতা। রাতের আঁধারে তারাগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে, মুছে গেছে তাদের সব দীপ্তি। চারিদিকে নেমেছে অতল প্রশান্তির আশ্বাস।

সকালের আলোটা আজ অনেক মিষ্টি আর রঙীন বলে বোধ হয়। সুমিতার মনে একটা সুর জাগে। ভালোলাগার সুর।

আজ সে উদয়কে জয় করেছে। এমনি করেই তিলে তিলে সে ওকে বাঁধবে। সব কাজগুলো হালকা খুশিভরে করে চলেছে।

পিসীমা ওর দিকে চাইলেন। একটু অবাক হয়েছেন পিসিমা। উদয়ও বাড়ি ফিরেছে ক-দিন পরে। কেমন যেন সুমিতাকে আজ অনেক সুন্দর দেখায়।

সকালের প্রথম আলোতেই সে মহিমময়ী হয়ে উঠেছে। নিজেই চা তৈরি করে এনেছে আজ সুমিতা।

উদয় তখনও ঘুমোচ্ছে।

—এ্যাই! উদয় ওর ডাকে চোখ মেলে চাইল।

কি যেন স্বপ্ন দেখছিল উদয় ভোরের আবছা অন্ধকারে।

সারা মনে তার সুরের নেশা। হীরা বাঈজী একটি আলোকবিন্দুর মত সেই আঁধার রাতে জেগে আছে। ওর নিটোল দেহের স্পর্শের উত্তাপে সে কাল সুমিতাকে পেতে চেয়েছিল। উদয়ের সারা মনে এখনও সেই নেশার ঘোর রয়েছে। সুমিতা নয়, ওর মাঝে হীরাকেই পেতে চেয়েছে একটি উন্মত্ত পুরুষ। ভাগ্যাহতা নারী এই নির্মম ছলনার কথা জানে না। সে সামান্য পাওয়ার খুশিতেই ভরপুর, স্বপ্নময়ী হয়ে উঠেছে।

সুমিতার ডাকে সেই সুরটা মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে গেল হীরা। উদয় চোখ মেলে দেখে, দাঁড়িয়ে আছে সুমিতা। সদ্য স্নান সেরেছে, মুখে মিষ্টি হাসির আভা।

বলে ওঠে সুমিতা,—চা নাও। উঠতে হবে না? বেলা হয়ে গেছে।

উদয় শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

সুমিতাকে দেখছে সে। মনে তখনও সেই রাতের নেশায় ঘোর ছুটে যায়নি। উদয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না।

ধীরে ধীরে গতরাত্রের সেই একটা মুহূর্ত তার স্মরণে আসে। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিল উদয়।

চা-টা হাত বাড়িয়ে নিল মাত্র, কোন জবাব দিল না। উদয় হেরে গেছে ওর ছলনায়। স্নিমিতার খুশিভরা মন ওর কোন খবরই রাখে না। সে আজ সব ফিরে পেয়েছে।

উদয় ভাবে, কি যেন একটা ভুল করে ফেলেছে সে।

ওই স্নিমিতাকে কোনদিনই সে মেনে নিতে পারেনি। অতি গরীবের ঘরের মেয়ে, সব কিছুতেই সে অবহেলা করে, ঘৃণা করে। রূপ আছে, চোখ ধাঁধায়, তাতেই উদয় ভুল করেছিল গত রাত্রে।

তার তুলনায় হীরা অনেক উঁচুতে! ওর গান, নাচ, দেহ-ভঙ্গিমা সব কিছু মিলিয়ে মনে হয় ও যেন কোন রহস্যময়ী, অধরা। সুরের মায়ায় সে মোহময়ী। তার তুলনায় স্নিমিতা অনেক সাধারণ, সেখানে ওর কোন মোহ নেই।

উদয়ের মনে ধীরে ধীরে গতরাত্রের কথা মনে পড়ে। ক-দিন বাড়িই আসেনি সে। বাগানবাড়িতেই পড়েছিল। গান-বাজনা হয়েছে। হীরাকে কালই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে টাকা দিতে হবে, তাছাড়া কিছু ভাল রকম ইনামও দিতে হবে। টাকার দরকার। তার হাতে টাকা কিছুই নেই।

তাই ওই টাকার সন্ধানেই এসেছিল সে। কিন্তু স্নিমিতার ঘরে এসে ওর নেশাগ্রস্ত মন সেই কথাগুলো ভুলে গেছে।

আজ সকালে সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দেয় উদয়ের কাছে। চা খেয়ে উঠল সে।

স্নিমিতার মনে খুশির আবেশ। সে বলে,

—চান করবার জল দিতে বলিগে। স্নান করে খাবার খেয়ে নাও। কি খাবে বলো? কাল সন্দেশ করেছিলাম তাই দিতে বলি, আর বাগানের আম।

উদয়ের এসব ভাল লাগে না। ওকে এড়াতে চায়। তাছাড়া ওই টাকার দরকারেও তাকে নিচে কাছারিতে যেতে হবে। জামাটা পরতে থাকে। স্নিমিতা অবাক হয়।

—বেরুবে নাকি? এখনিই?

উদয় জবাব দিল,—না। নিচে কাছারিতে যেতে হবে। কাজ আছে।

—দেরি করো না কিন্তু।

সুমিতা মনে মনে খুশিই হয়েছে। হয়তো এবার থেকে কাছারির কাজ-কর্ম দেখবে সে।

উদয় চটি পরে নেমে গেল নিচের ওই বাহির-মহলের দিকে।

উদয় সদর নায়েবের কামরার দিকে এগিয়ে যায়। কাছারিতে আজ ভিড় জমেছে। লোকজন এসেছে অনেক।

বসন্তনারায়ণ নিজের ঘরে বসে কি সব কাগজপত্র দেখছেন, বারান্দায় উদয়কে দেখে একটু অবাক হন। এদিকে বড় একটা আসে না সে। তবু যেন সুমতি হয়েছে উদয়ের যে, কাছারিঘরে ঢুকেছে উদয়। সদর নায়েবের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। উদয়কে দেখে সদর নায়েব গোবিন্দপদ মুখ তুলে চাইল।

উদয় বলে,—কিছু টাকার দরকার আমার।

সদর নায়েব ওর দিকে চেয়ে থাকে। মুখে-চোখে ওর অত্যাচারের কালো-ছায়া। উদয় এতটুকুও বদলায়নি এটা বেশ বুঝেছে গোবিন্দপদ।

জবাব দেয় নায়েব,—টাকা তো নেই ক্যাশে।

—নেই! উদয় অবাক হয়,—বলুন, দেবেন না।

বলে চলেছে নায়েব,—কর্তাবাবুর হুকুম নেই। এ-মাসে অনেক টাকাই নিয়েছেন আপনি। এর বেশি দিতে কর্তাবাবুর হুকুম নেই। তাছাড়া টাকাও নেই তহবিলে।

—অঃ!

সরে এল উদয়। রেগে উঠেছে সে মনে মনে।

বাবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থামল। কেমন ভয় হয়।

ওদিকে হীরাকে টাকা দেবার কথা আজ। ক-দিন থেকেই বলছে সে টাকার কথা। কিন্তু বেশ জানে, বাবা তাকে টাকা দেবেন না। ওরা সবাই তার শত্রু হয়ে উঠেছে। কি ভাবছে উদয়।

বাড়ির ভেতরেই ফিরে এল নিজের ঘরে উদয়নারায়ণ। হতাশ হয়েছে সে।

সুমিতা ওকে ফিরে আসতে দেখে খুশি হয়।

—বসো। উদয় বসল চুপ করে। সুমিতা এগিয়ে আসে।

উদয় ওর দিকে চেয়ে থাকে। সুমিতা ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে,—কি ভাবছো?

—কিছু টাকার বড় দরকার। আছে তোমার কাছে?

সুমিতা স্বামীর দিকে চাইল। ওর কাছে সংসারের কিছু টাকা থাকে।

উদয় কোনদিন কিছু চায়নি তার কাছে।

আজ চাইছে। সুমিতার মনে তাই আশা জাগে। বলে ওঠে সুমিতা

—বেশি তো নেই, শ' তিনেক আছে।

উদয়ের প্রয়োজনের তুলনায় ওই টাকা অনেক কম।

তবু সুমিতা সেইটুকু দিয়ে তাকে খুশি করতে চায়। উদয় ওটুকু নিলে সুমিতা বোধহয় ধন্য হবে।

—ওতে হবে না তোমার?

সুমিতার কথাগুলো সে বোধহয় শুনতে পায়নি।

একটু হতাশ হয় উদয়। তবু ওটারও তার দরকার। তাই বলে,

—তিনশো টাকা! তাই দাও।

সুমিতা খুশিমনে টাকাটা বের করে দেয় উদয়কে। উদয় তাই নিয়ে বের হয়ে যাবার যোগাড় করে। তার এখনও অনেক কাজ বাকি।

—কোথায় যাচ্ছ?

টাকার সন্ধানেই বের হচ্ছিল উদয়। পিছু ডাকতেই কেমন বিরক্ত হয়ে ওঠে সে। তিনশো টাকা দিয়ে যেন মাথা কিনেছে সুমিতা।

মনে মনে হাসি আসে উদয়ের। গরীবের ঘরের মেয়ে, তিনশো টাকা একত্রে কখনও দেখেনি ওরা।

জবাব দেব উদয়,—একটু কাজে যাচ্ছি।

বের হয়ে গেল সে। সুমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আজ দুপুরেও মানদা গেছল বিষ্টু সরকারের কাছে. অন্য দিন দেখে দুপুরে কাছারি নিঝুম। বসে গল্প-গাছা করে মানদা।

ওই লোকটাকে তবু কেমন ভাল লাগে। পান-তামাক খাওয়ায়। আজও গিয়েছিল, কিন্তু গিয়ে দেখে বিষ্টু সরকার কাজে ডুবে আছে খাতা পত্রের মধ্যে।

—কি গো সরকার মশাই! কাজ করছ যে?

বিষ্টু সরকার ফুঁসিয়ে ওঠে,

—কাজ করতে আমায় দেখিস না, নয় ? এবার আর উপায় নেই বুঝলি। এ সেই পিদিমের নিভবার আগের অবস্থা। দপ্ করে জ্বলে উঠে তারপরই সব ঠাণ্ডা। এও তেমনি। গেল বলে এইবার !

একটু অবাক হয় মানদা। এ-বাড়ির চারিদিকে কেমন কালো আঁধার ঘনিয়ে আসছে। তাদের সকলেরই ভাগ্য এখানের সঙ্গে জড়িত। তাই জিজ্ঞেস করে,—কেন গো ? ঠাণ্ডা হবার কি হল ?

বিষ্টু সরকার টাকে হাত বোলায়। ওর দিকে চেয়ে জবাব দেয়,

—হবে না ? সব যে চলে যাচ্ছে ! জমিদারী নিয়ে নিচ্ছে সরকার। তাই যেখানে যা ছিল খাসমহল, খাসদখল, নিজহাল, পতিত পড়া সব কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন। যা আসে। তারপর আবার কি ? ঢুঁ ঢুঁ ! অলক্লিয়ার।

—সত্যিই সব চলে যাচ্ছে ?

হাসে বিষ্টু সরকার, মলিন বিষণ্ণ হাসি। বলে ওঠে,

—সেই শেয়ালের গল্প জানিস মান্থ ? বাঁশগাছের ডগে একটা কাক বসে-ছিল। এক ব্যাটা শেয়াল তাই না দেখে বলে, ওই বাঁশগাছের আগল পর্যন্ত বান আসে, দেখব শালা কাক থাকে কোথায় ? ব্যাটা শেয়াল নিজে তখন কোথায় থাকবে, তা ভাবেনি। আমাদের হল তাই। কাক-শেয়াল সব একসা হয়ে যাবে এইবার। বুঝলি !

কথা বলে না মানদা। ওর হাসিটা কেমন বিশ্রী লাগে। বিষ্টু সরকার রেকড় টেনে নিয়ে বসেছে আবার কাজে।

কথাটা শুনে অবধি ভাবছে মানদা। সে-ও এই সব খবর শুনে ঘাবড়ে গেছে। তুপুরের হলুদ আলোটুকু গাছের ডগে ডগে ছুঁয়ে রয়েছে। বাগানে কোথায় তু-একটা পাখি ডাকছে।

শূন্য উদাস তুপুর। কাছারি ফাঁকা হয়ে গেছে। মানদা শুধায়,

—তালে কি হবে গো সরকার মশাই ?

ঝড়ের মুখে পড়া শাখাবাসী বনস্পতির জীবগুলোও ঘাবড়ে গেছে।

বিষ্টু বলে,—আবরা যে ভিখারী সেই ভিখারীই থাকবো। তাই কথাটা শোন মান্থ, কতো করে বলছি, রাজী হয়ে যা—ব্যস !

মানদা জানে ওর কথাটা, তাই ফোঁস করে ওঠে,—মরণ !

সুমিতার মন কেমন করে। উদয় এখনও ফেরেনি। এমনি শূন্য দুপুরে, উদাস দুপুরে মনে পড়ে মায়ের কথা; সেই ছায়াচ্ছন্ন পুরন্দরপুরের দিনগুলোকে আজও ভোলেনি সুমিতা। অভাব ছিল, কষ্ট ছিল। তবু সেখানে ছিল অখণ্ড শান্তির স্পর্শ। এমনি জ্বালা সহ্য করতে হয়নি তাকে।

দাদাকে অনেকদিন দেখেনি। আর সে আসবে না এ-বাড়িতে।

মা! একটি সবুজ স্মৃতির সুরভি মন থেকে যেন উদাস রোদের আভায় কোথায় মাঝে মাঝে মিলিয়ে যায়।

সুমিতার মন কেমন করে।

এ-বাড়িতে তার ভাল লাগে না। বেশ জেনেছে এখানে মায়া নেই। ভালোবাসা নেই। তবু আজ মনে হয় উদয়কে ঘিরে তাকে বাঁচতে হবে। এই তার ঘর। এইখানেই থাকতে হবে তাকে।

মানদাকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইল সুমিতা,—কি রে?

মানদার মনে সেই সর্বনাশা কথাগুলো ঘুরছে। বলে ওঠে সে,

—শুনেছ বৌদি, সরকার নাকি এই সব জমিদারী নিয়ে নেবে। জমি-জায়গা সব!

সুমিতা কথাটা ভেবেছে ইতিপূর্বেও। জীবনকে এরা জটিল, দুঃসহ করে তুলেছে। কাজ নেই, তিলে তিলে অ-কাজের মধ্যে এরা এদের চারিপাশকে বিষিয়ে তুলেছে। নিজেরাও জড়িয়েছে সেই জালে।

উদয়কে দেখে তাই মনে হয়—ও যদি দিনান্তে পরিশ্রম করে নিজের রুজি-রোজগার করত, তাহলে বোধহয় এত অমানুষ হত না, নির্মম হত না। এরাও এত কঠিন, হৃদয়হীন হতে পারত না।

বলে সুমিতা,—এ পাপ গেলে ভালোই হয় রে মানদা।

অবাক হয় মানদা—সেকি গো!

হাসে সুমিতা.—হ্যাঁ। এ পাপ যাওয়াই ভালো। এরা তবু মানুষ হবে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝবে। নিজেরাও মানুষের মত বাঁচতে পারবে।

মানদা ওর দিকে চেয়ে থাকে। এ-বাড়ির অন্তরে এমনি একটি মন রয়ে গেছে তা জানত না। ও এই সব কিছুকে, এই বড়বাড়ির অন্তরকে নিদারুণভাবে ঘৃণা করে। তাই এখানের জীবনে ও বেমানান; কিন্তু তবু ভাবনায় পড়ে সুমিতা। এইবার কঠিন জীবনের মুখোমুখি হতে হবে। উদয়কে নিয়েই ভয়। ও এসব এখনো বুঝতে চাইছে না। কোন আতঙ্ক তা

সাবধানতা প্রভৃতি ওর নেই। এখনও সেই গজদন্ত-মিনারে বসে আছে। একদিন কঠিন ধাক্কায় যখন তাসের প্রাসাদ চূর্ণ হয়ে যাবে, তখন কি করবে জানে না সে। আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে বোধহয়।

এই ভয় দেখেছে স্থমিতা বসন্তনারায়ণের মুখে-চোখে, কথায়। আজ সেই ভয়ে তিনি নির্মম হয়ে উঠেছেন।

এই বড়বাড়িকে ঘিরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামে কালোছায়ার মত। একটা নির্বাক নিস্তব্ধতা জেগে ওঠে। ওরা যেন মুখ বুজে প্রতীক্ষা করছে তেমনি একটি চরম ধ্বংসের। প্রচণ্ড আঘাতের। তারই ভয়ে ওরা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু একটি মানুষের এদিকে কোন খেয়ালই নেই। সে আপন মনেই আছে। এ-জগতের কথা তার মনেও ছায়াপাত করেনি।

স্থমিতা আশা করেছিল, আজ উদয় ঠিক সময়েই ফিরবে। সে বোধহয় জয় করেছে তাকে।

কিন্তু কোন বাঁধনই এরা মানে না। এরা দুর্বার।

সেই বের হয়ে গেছে আর ফেরেনি। উদয়ের ওই স্বভাব বদলাবার চেষ্টা করেছিল সে বৃথাই। ওদের ফেরানো যাবে না। ধ্বংসের দিকেই কি এগিয়ে যাবে উদয়! স্থমিতার জীবনও এমনি মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে স্থমিতা। এ ভাবনার শেষ নেই।

বসন্তনারায়ণও পায়ের শব্দ তুলে গেছেন বারান্দা দিয়ে। আজ তাঁর মুখে বেদনার ছায়া প্রকট হয়ে উঠেছে। ওই নিশ্চিত ধ্বংসকে দেখছেন তিনি।

মনোরমা দেখছেন দাদাকে। কেমন যেন কঠিন ব্যর্থতায় ভরে উঠেছে ওই মানুষটির সারা মন। বসন্তনারায়ণ একবার দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞেস করেন তিনি,—উদয় ফেরেনি এখনও?

স্থমিতা ঘরের ভেতর থেকে শুনতে পায় ওই কণ্ঠস্বর।

এ যেন নির্বাক চাবুকের মত এসে পড়েছে ওর মুখে সশব্দে। চমকে উঠল স্থমিতা। এই প্রশ্নটা যেন তাকেই করেছেন তিনি। উত্তর ও জানে না, তবু করেছেন এই প্রশ্ন।

পিসীমা জবাব দেন,—কই, দেখছি না তো?

একটা স্তব্ধতা জাগে রাতের অন্ধকারে। শোনা যায় বসন্তনারায়ণের কণ্ঠস্বর,

—তখনই ভুল করেছিলাম মনো। গরীবের মেয়ের কোনও মেরুদণ্ড থাকে না। সামান্য পেয়েই সে খুশিতে ভরে উঠেছে। কাঞ্চন ফেলে কাঁচ নিয়েই খুশি রইল। দোষটা একা তারই নয়। লক্ষ্মীর বদলে ঘরে আনলাম অলক্ষ্মীকে। সবই তাই যেতে বসেছে।

মনোরমার জবাব শোনা যায় না। বসন্তনারায়ণ পায়ের শব্দ তুলে চলে গেলেন নিজের ঘরে। সুমিতার কান্না আসে। এমনি অপমান তার কাছে অসহ্য।

নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে কোথায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে শেয়াল ডাকছে। সেই আর্ত চিৎকার ওঠে আকাশ-বাতাসে। সুমিতার সারা মনে একটা দুর্বার জ্বালা। ওরা ভেবেছে এই সম্পদের মোহেই সুমিতা এখানে এসেছে, তাই নিয়ে তৃপ্ত হতে চায়। ওরা যে এমনি হৃদয়হীন, তা ভাবেনি সুমিতা। বসন্তনারায়ণ তাই ভাবেন যে, সুমিতা এই পরম পাওয়ার স্বপ্নে সব ভুলেছে। একে ঘৃণা করে সে। এ পাওয়া তার কাছে মূল্যহীন। সুমিতার কাছে এই সম্পদের কোন দাম নেই।

নিস্তব্ধ বাড়িটার অন্তরে একটি তেজোদ্দীপ্ত মন নিষ্ফল অপমানে ফুঁসে উঠেছে।

উদয় ঢুকেছে ঘরে। আজও সেই মত্তপ অবস্থা তার।

ওর দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুমিতা। ভেবেছিল বদলাবে এইবার। কিন্তু তা হয়নি। তাকে ঠকিয়েছে উদয়ও।

বলে সুমিতা,—আজ আবার ওই সব গিলে এসেছ?

—বাঃ, বেশ তো বোল ফুটেছে দেখছি ময়নার!

—থামো! গর্জে ওঠে আজ বিক্ষুব্ধ সুমিতা। ওকে আজ ঘৃণা করে সে। সুমিতা বলে চলেছে,

লজ্জা করে না তোমার? শুনেছ, এদিকে জমিদারী চলে যেতে বসেছে; সব আয় বন্ধ হয়ে যাবে, তখন চলবে কিসে?

উদয় ওর মুখে এসব কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। ক্রমশঃ ধাতস্থ হয়ে ওঠে। জবাব দেয় জড়িত কণ্ঠে,

—ওসব কথা বাবাকে বল গে। তিনি তারিফ করবেন, বুঝলে? জমিদার গিন্নীর মত কথা বলছো যে!

সুমিতা বলে চলেছে,—এখনও সময় আছে। এসব ছেড়ে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো। দিন বদলাচ্ছে।

হাসে উদয়,—আরে বাবা, দিনরাত আমি নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছি। দেখছো না?

উদয় দাঁড়াবার চেষ্টা করে। টলছে সে। মত্তপকণ্ঠে তবু বলে,

—যতই খাই না কেন, একটুও পা টলবে না আমার। নট এ বিট।

সুমিতা কি ভাবছে। বলে,

—তুমি কি মানুষ নও? নিজের ভবিষ্যৎ, আমাদের কথা কোনদিনই ভাববে না?

চটে ওঠে উদয়। জবাব দেয় তীক্ষ্ণকণ্ঠে,

—ছিলে ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ে; যদি জমিদারী চলেই যায়, তোমার অবস্থা আর যাই-ই হোক না কেন, ওই আগেকার থেকে ভালোই থাকবে। তবে এত ভাবনা কেন? সর দিকি, আরামে শুতে দাও একটুকুন: ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোর না।

সুমিতা চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে বিবর্ণ মুখে। ওই বসন্তনারায়ণ, উদয় সবাই যেন দয়া করে এইখানে তাকে ঠাঁই দিয়ে তার জীবনের সব সাধ, স্বাধীনতা, শ্রীটুকুকে কিনে নিয়েছে নিঃশেষে।

ওদের বোঝানো বৃথা। ওরা মনুষ্যত্বটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

তিলে তিলে সব হারালে বোধহয় এতবড় সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে তাদের অজানতেই। নীরব রাগে অপমানে সুমিতার ফর্সা মুখখানা টকটকে হয়ে উঠেছে। ওরা কেবল ধনসম্পদের কথাই বলে। তারা গরীব। এটা যেন সুমিতারই অপরাধ। তাই তাদের দারিদ্র্য নিয়ে অনবরতই খোঁটা দেয়।

সুমিতা ওই মত্তপ লোকটার কথায় কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ করে,

—এ পাপ সম্পদ বিষয় আমাদের ছিল না, না থাকলেও আমরা এমনি অমানুষ নই।

উদয় গর্জে ওঠে,—সাট আপ! নইলে—

সুমিতাই বাকি কথাটা জোগায়—মারবে?

হঠাৎ সামনের দরজায় পিসীমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুমিতা থামল।

উদয় তখনও গর্জন করছে।

—বৌমা! ছিঃ ছিঃ! ওকে চুপ করে শুতে দাও বাছা।

পিসীমা ওকেই যেন কিছু বলবেন। কিন্তু মনোরমা কথা বাড়ালেন না। ওই কথাগুলো বলে চলে গেলেন।

সুমিতার দুচোখ বেয়ে জল নামে। উদয়ের অবশ্য এদিকে নজর নেই। সে তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। কার অন্তরে হু হু ঝড় ওঠে, বেদনার ঝড়, সে খবর রাখার সময় তার নেই। সুমিতার জীবনে তার সুখ-দুঃখ যেন একারই। কেউ তার খবর রাখে না। এ-বাড়ির মধ্যে ও স্বতন্ত্র একটি মানুষ।

উদয় তার সংবাদ রাখার প্রয়োজন বোধ করে না।

এমনি দিনে সুমিতা আবিষ্কার করে সে মা হতে চলেছে। চমকে ওঠে সে।

এ তার কাছে পরম সার্থকতার সংবাদ নয়, কি যেন বেদনারই আভাষময় এই সংবাদটা। তার নারীত্বের এই সার্থকতার সংবাদ কাকে জানাবে জানে না।

সুমিতা সেদিন খুশিতে উছলে ওঠে না।

চুপ করে কি ভাবছে। হয়তো এই সন্তানের আসাটাই এ-বাড়িতে তার স্থান দৃঢ়তর করে তুলবে।

মনে মনে সেই আশ্বাস আর শক্তির সন্ধান পায় সে। তার আগামী সন্তানের জন্যই সে সব কিছু সহ্য করে আবার নতুন করে বাঁচবে।

উদয়কেও এই সংবাদটা জানাবার সুযোগ পায়নি।

সেই রাত্রির পরই উদয় ক-দিন বাড়িতে আসেনি ; কি কাজে বাইরে ব্যস্ত রয়েছে। যদিও বা দু-একবার এসেছে একথা শোনার মত অবস্থা তার ছিল না তখন।

ঘৃণাভরে সুমিতাও তাকে এ-খবর জানাবার প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে। মনে মনে কঠিন হয়ে উঠেছে সুমিতা।

মনোরমাও এতদিন সুমিতার হয়েই কথা বলেছিলেন দাদার কাছে। কিন্তু সেই ভাবটাও ক্রমশঃ মুছে গেছে তাঁর মন থেকে। সেই রাত্রে সুমিতার ওই মেজাজ তাঁর ভাল লাগেনি। মনে হয় দাদার কথাই সত্যি। সুমিতাকে তাই একটু এড়িয়ে চলেন মনোরমা।

সুমিতাও সেটা বোঝে। তবু তার মা হবার সংবাদটা জানাতে চায় তাঁকেই। এ-বাড়ির ওই একটি মানুষ হয়তো খুশি হবেন এ সংবাদে।

পিসীমাকে দেখেছে, তিনি কেমন বদলে গেছেন। আজকাল তাঁর মুখের সেই হাসিটুকুও নেই, কথাবার্তায় একটা তিক্তটা ফুটে ওঠে।

সুমিতা আশা নিয়ে বলতে গেছে ; কিন্তু ঘরে পা দিতেই জিজ্ঞেস করেন পিসীমা,—উদয় এসেছে ?

চুপ করে থাকে সুমিতা।

এ ক-দিন উদয় দিন-রাতই প্রায় বাইরেই থাকে। বাড়ি ফেরেনি।

পিসীমা ওর দিকে চেয়ে একটু কঠিন কণ্ঠেই বলে ওঠেন,

—তোমারও দোষ আছে বৌমা। বাছা ঘরে এলে তুমিও বেশ কথা শোনাও।

সুমিতার ফর্সা মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে।

পিসীমা বেশ কঠিন কণ্ঠে বলে চলেছেন,

—ওকে শাসন করলেই হবে না বৌমা, ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসা, যত্ন ও পায়নি, তাই দিয়েই ওকে বাঁধতে হবে। পুরুষ-মানুষের এক-আধটু বদ-অভ্যাস থাকে, সেটাকে মেনে নিয়েই চলতে হবে বাছা। একেবারে মাথায় হাত দিলে শুনবে কেন? ও তো জমিদারের ছেলে। আর তুমি? সমান সমান হলে কথা ছিল। কিন্তু তবু কথা শোনাতে ছাড়ো না দেখি।

সুমিতা বিবর্ণ মুখে ফিরে এল ঘর থেকে। নীরব কান্নায় দুচোখ ভরে ওঠে। তাঁকে এই সংবাদটাও জানাতে পারেনি সুমিতা, বেদনায় মন ভরে উঠেছে।

জানলা দিয়ে দেখা যায় নিচে লোকজন এসেছে কাছারিবাড়িতে। শূন্য-

সুমিতা ওইদিকে চেয়ে থাকে। ওদের দিন ফুরিয়ে আসছে; জমিদারী—এই মিথ্যা দয়া শেষ হয়ে যাবে। তবু শেষ হোক! ওরা নেমে আসুক পথের ধুলোয়!

সব হারিয়ে যাক! তার সন্তানকে এই পাপ পরিবেশে যেন মানুষ না হতে হয়। ওরা এ-বাড়ির সম্পদের অভিশাপ চায় না।

লোকদের কলরব উঠছে।

এই জমিদারীর বিকৃত দেহটায় নাভিশ্বাস উঠেছে। পণ্যদ্রব্যের মত টুকরো টুকরো করে এর দেহাবশেষ কিনে নিয়ে চলেছে ওই জনতা।

এরপর এখানে পড়ে থাকবে শুধু জীর্ণ কঙ্কালটা। মৃতের স্তব্ধতা নামবে। সুমিতা সেই ভবিষ্যতের কথা আজ ভাবে। তার গর্ভে আসছে এ-বাড়ির বংশধর। সে এসে কি দেখবে এখানে? কাকে দেখবে?

দেখবে তার যথাসর্বস্ব গেছে, বাবা একটা মত্তপ অপদার্থ মানুষ।

আজ মনে হয় সবাই চারিদিক থেকে তাকেই দুষবে। এই বসন্তনারায়ণ, পিসীমা, মায় তার অনাগত সন্তান পর্যন্ত। তাকে কঠিন হতেই হবে।

—বৌদি!

মানদার ডাকে চমক ভাঙে সুমিতার। মানদা ওকে দেখছে। তার চোখে কেমন যেন এই পরিবর্তনটা ঠেকে।

—তোমার শরীর খারাপ নাকি? হ্যাগো?

চমকে ওঠে সুমিতা। পরক্ষণেই সামলে নেয়,—কই, না তো!

মানদা শুধায়,

—দাদাবাবু ফেরেননি কাল রাতে?

চুপ করে থাকে সুমিতা।

বলে চলেছে মানদা,—ওই বাগানবাড়িটাই সব খাবে। বাবু নাকি এক বাঈজীকে পুষে রেখেছে। সর্বনাশ হলেও থামবে না ওরা! সুমিতা কথাগুলো শুনছে।

এ-বাড়ির পেছনের বাগানের ওদিকে দীর্ঘ ছায়া ঘন বাগান। তারই মধ্যে কোন প্রমোদ-ভবনেই পড়ে থাকে উদয়। কে এক বাঈজীও রয়েছে। ওই নীরব দিগন্ত আজ সুমিতাকে যেন দমবন্ধ করে মারছে তিলে তিলে। এই জীবন সুমিতার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সে নিজেই আজ এর ব্যবস্থা করবে। শেষ চেষ্টা করে দেখবে কোনমতে উদয়কে ফেরানো যায় কিনা। আজ তার এতগড় আনন্দের দিনেও দুচোখ দিয়ে জল নামে। সরে গেল সুমিতা ঘরের দিকে।

স্তব্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মানদা ওর দিকে। সব হারাবার দুঃখে এ-বাড়ির বৌরাণী আজ চোখের জল ফেলে।

হীরা বাঈজী এখানে এর আগেও এসেছিল মুজরো করতে। তখন ও দেখেছে এদের অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য। শুধু টাকা নয়, প্যালা পড়ত গিনি, মোহর —ওই বাবুদের কাছ থেকে। কয়েক হাজার টাকা ও জিনিস ইনাম পেত সে।

আবার আসতে হয়েছে তাকে। উদয়নারায়ণ ছাড়েনি।

হীরা বাঈজী দেখেছে এবার এদের অবস্থা তেল-কমা প্রদীপের মতন হয়ে উঠেছে। ধিকিধিকি জ্বলছে, কখন নিভে যায় তার ঠিকানা নেই। হীরা বাঈজীও বুঝেছে উদয় যেন কেমন জড়িয়ে পড়েছে জালে!

কিন্তু হীরার এই বাঁধন ভালো লাগে না। সে আকাশের পাখি, খাঁচা

তার জন্য নয়। তারা পথের মানুষ, তাদের জন্য ঘরের নিশানা কোথাও নেই। তাই আবার পথেই ফিরে যেতে চায় সে। এখানে আটকে থাকলে তার সমূহ লোকসান।

তবু কোথায় একটা ভুল করেছে সে। একটা অদৃশ্য বাঁধনে সেও জড়িয়ে গেছে।

উদয়কে ও চলে যেতে বলে মাঝে মাঝে। কিন্তু উদয়ও যেতে পারেনি। সরে যেতে মনের গভীরে কোথায় দুঃখ বেজেছে হীরারও! নিজেই তাজ্জব হয়েছে বাঈজী তার এই দুর্বলতায়। তাই কঠিন হয়ে ওঠে সেও।

বাগানবাড়ির দোতলায় হীরা দাঁড়িয়ে আছে। নিজের মনে মনে সে তৈরি হয়েছে। জমিদারী যাবার মুখে যা পারে তারাও গুছিয়ে নিতে চায়।

এরপর এদেরও কিছু থাকবে না। উদয়নারায়ণ সবই হারাবে। হীরা তাই এখান থেকে চলে যাবার আগে আরও কিছু নিয়ে যেতে চায়। ভালবাসা! বাঈজীর ভালবাসা ওই দিনের আলোর মতই। দুঃখের অন্ধকারে তার অস্তিত্ব থাকে না।

সন্ধ্যা নামছে। পাখিগুলো কলরব করে বাসায় ফেরে।

পশ্চিম আকাশের লাল আলোটুকু মিলিয়ে গেছে। ফুটে উঠেছে দু-একটা তারার ইশারা। কি যেন বেদনাময় চাহনিতে ওরা চেয়ে আছে!

কাকে এখানে আসতে দেখে অবাক হয় হীরা। একটি বউ এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। পরনে দামী শাড়ি, গায়ে গহনা। চেহারায় অপূর্ব একটি লক্ষ্মীশ্রী। কোন ঘরের বউ যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে এমনি কোন বাগানবাড়িতে, এটা স্বপ্নেও ভাবেনি হীরা। অবাক হয়েছে সে।

পুরুষ মানুষগুলোকেই চেনে হীরা। ক্ষুধার্ত, বুভুক্ষু জানোয়ারগুলোকে। ঘরের শান্তিরূপা এই গৃহিণীদের সে চেনে না। আজ তাদের একজনকে দেখে অবাক হয় সে। ওর দিকে চাইল।

—বহিনজী!

হীরা এগিয়ে আসে। বলে ওঠে,—ফরমাইয়ে!

আজ নিজেই এসেছে সুমিতা বড়বাড়ি থেকে এই বাগানবাড়িতে নেমে। উদয়কে বলে দেখেছে, কোনও ফল হয়নি। তাই নিজে এসেছে সেই মোহিনী নারীর কাছে। নিজের জন্য নয়, আজ সে এসেছে নিজের স্বামীর কল্যাণের জন্য, যে আসছে, সেই অনাগত সন্তানের কল্যাণের জন্য। বলে সুমিতা,

—তুমি ওঁকে ফিরিয়ে দাও, আমার স্বামীকে। তোমাদের ছোটবাবুকে।

অবাক হয় হীরা,—বহুরাণীজী! আপনি খুদ্‌ এসেছেন এখানে? বহুত সেলাম!

সুমিতা চলে চলেছে,—আমার জন্য নয়। যে আসছে, তার ভবিষ্যতের জন্যই একথা আজ বলতে এসেছি বাঈ। এখানে আসতে হয়েছে তোমার কাছে।

বাঈজী ওর দিকে চেয়ে থাকে।

আজ সেও বুঝেছে একটা অন্যায় সে করে চলেছে; দেখেছে উদয় ক্রমশঃ অর্থহীন হয়ে আসছে। সব গেছে তার।

বাঈজীও টের পেয়েছে, তাদের দিনও এইবার বদলাচ্ছে। রাজা-জমিদারদের সঙ্গে সঙ্গে তারাও অবলুপ্ত হয়ে যাবে, যদি না সময় থাকতে অন্যপথ দেখে।

সেই চেষ্টাই করতে হবে এবার তাকে। তাছাড়া নারী হয়ে নারীর চরম দুঃখটাকে বোঝে সে।

বাঈজী বলে,

—তাই হবে বহুরাণীজী, আমি চলেই যাব। ভেবে দেখেছি এখানের জমানা ফুরিয়ে আসছে।

মাথা নাড়ে সুমিতা। বলে চলেছে,

—হ্যাঁ, ফুরিয়েই আসছে, এদের সব ফুরিয়ে যাবে বাঈ। অনেক পাপ তিল তিল করে জমেছে, সেই পাপের পুরী একদিন এমনি করেই তলিয়ে যাবে। সব শেষ হয়ে যাক—ওরা নতুন করে বাঁচুক।

বাঈজী ওর দিকে চেয়ে থাকে। বেশ বুঝেছে ওদের জীবনের মর্মজ্বালা। কথা বলে না সে। চুপ করে কি ভাবছে। সব পালা চোকাবার কথাই ভাবছে সে। সুমিতার হাত ধরে বাঈজী বলে,

—আমি যাব বহুরাণীজী। জরুর যাব। বাগানের নিচেকার মহলে উদয়ের দু-একজন মোসাহেব বন্ধু তখন নেশার আমেজে ডুবে আছে। খবরটা রটে যায়, হীরাবাঈ নাকি দুসরা কোন্ খানদানী চীজ আমদানী করেছে।

মোসাহেবদের মধ্যে পঞ্চা সর্বঘটের কাঁঠালি কলা। সে-ই সদর, যার কলকাতা থেকে বাঈজী আমদানী করে। ওসব মহলে তার বেশ গতায়াত আছে। নজরও তার বেশ তীক্ষ্ণ।

এইখানেই একটু ডেরা মত আছে ভিনগাঁয়ে, তাছাড়া এই তার পেশা এবং নেশা ওই পরের পয়সায় মদ খাওয়া। কলকাতা সহরের অনেক নরকের সংবাদও সে জানে। লোকটা মদ খেলেও মাতাল হয় না। শয়তানের মত তার দুচোখ জলে নারী দেখলেই। তাই সেই পাপের জগতে কীটের মত টিকে রয়েছে সে। সেও খবরটা শুনে নতুন মেয়ে দেখার লোভে উঠে পড়ে।

বাগানেই পড়ে থাকে, ফাই-ফরমাস খাটে বাঈজীর, উদয়েরও। আর এই নেশায় ভুলিয়ে কিছু রোজগার করে নেয়।

মনটা ওর কুটিল, চোখের দৃষ্টি সাপের চেয়ে ক্রুর। খবরটা সে-ই এসে রটিয়ে দেয় নিচেকার মহলে কয়েকজন রইস-মোসাহেবদের কাছে।

—খাসা চীজ এনেছে মাইরী হীরা।

—ঠিক বলছিস তো?

পঞ্চা জবাব দেয়,

—এ শম্মা মিছে কথা বলতে জানে না। সন্দেহ হয় স্বচক্ষে দেখুন কেমন চীজ! ওই তো নামছে সিঁড়ি দিয়ে কেমন ঘোমটা পরে হেলে দুলে!

নেমে আসছে সুমিতা। হাল্‌কা ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা, তবু তার অপূর্ব রূপ ফুটে উঠেছে।

পঞ্চা হাঁ করে দেখছে, উমেদারদের কে একজন এগিয়ে গিয়ে সাহসে ভর করে সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়েছে। হাঁ করে চেয়ে দেখছে সুমিতাকে। সুমিতা গায়ে চাদরটা জড়াবার চেষ্টা করে ঘোমটাটা টানে। শিউরে উঠেছে সে। বলে ওঠে নিচেকার সেই রসিক সজ্জন,

—চাঁদমুখ কি ঘোমটায় ঢাকা যায়? ওটা খোলাই থাক। পঞ্চজনে দেখে হিয়ার আগুন নিভোক মাইরী!

লোকটার দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

পঞ্চা দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ কি ভেবে সাঁৎ করে সরে গেল। ওকে সে চেনে, ওই বউটিকে। কিন্তু তাকে এখানে দেখবে কল্পনা করেনি সে। তাই সরে গেছে আড়ালে।

সুমিতা বলে,—পথ ছাড়ুন।

—ছাড়ছি বাবা, তার আগে একটু দেখে নিই ভালো করে।

লোকটাকে দেখে ভয় পেয়েছে সুমিতা। এ কোন্ নরকে এসে পৌঁছেছে সে!

বলে চলেছে লোকটা,

—উদয়বাবুর বরাত ভালো, চাঁদের কোলে সৌদামিনী। একে হীরাবাঈ তার ওপর এইসা খাসা—

সুমিতা বিবর্ণ মুখে সিঁড়িটা ধরে কাঁপছে। মনে হয় এখুনি পড়ে যাবে সে।

হীরা ওপর থেকে ব্যাপারটা দেখে তাড়াতাড়ি নেমে এসেছে। তার সারা মন জ্বলে উঠেছে। এগিয়ে এসে লোকটার গালে একটা চড় কষেছে সে।

—বেতমিজ কাঁহাকা! আদমী না জানোয়ার হায় তুম?

লোকটা হীরার ওই অতর্কিত চড় খেয়ে চমকে উঠেছে।

—যা বাবাঃ!

বলে ওঠে হীরা,

—মাফ কিজিয়ে বহুরাণীজী! হম্ আভি চলা যায়েগা। এখানে মানুষ যে এমনি অমানুষ হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারায়, তা জানা ছিল না। আজই চলে যাব আমি, এখুনিই।

সুমিতা ভীত কম্পিত দেহে বের হয়ে এল আঁধার-ঢাকা বাগানে।

পঞ্চা অবাক হয় কাণ্ডটা দেখে। এমনি একটা কাণ্ড ঘটবে তা ভাবেনি সে। তার সাজানো বাগান তছনছ হয়ে গেল। বেশ খানাপিনা, ফুর্তি-আমোদ হচ্ছিল, মাইফেল চলছিল, সব বরবাদ হয়ে গেল। দু-দশ টাকা আসছিল তাও চলে গেল।

—বাঈজী! পঞ্চা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে,—গিয়ে কি হবে?

হীরা গর্জন করে ওঠে,—তুম কুত্তা হ্যায়। চোপ্ রহো!

পঞ্চা হতাশ কণ্ঠে বলে,

—লে বাব্বাঃ, তা তুমি যখন বলছ বাঈ আমি কুত্তা—তাহলে কুত্তাই। তাই বলে রেগে মেগে চলে যাবে এখান থেকে এটা একটা কথা হল। তাছাড়া—

হীরা কি ভাবছে। পঞ্চা গলা নামিয়ে বলে,

—এইতো খিঁচে নেবার সময়। যা পারো টেনে নাও। দিনকতক পরে তো বিলকুল ফৌত হয়ে যাবে।

হীরা বলে,—তুমি যাও। যাও এখান থেকে পঞ্চাবাবু।

পঞ্চা তবু হাল ছাড়ে না,—বললাম ভালো কথা—

হীরা বাঈজী মাথা নাড়ে,—নেহি, হম্‌কো যানে হোগা। হম্ আজই যায়েগা। জবান দে দিয়া, বহিনকা ভি দিল হ্যায় বাবুজী!

পঞ্চা হতাশ কণ্ঠে বলে,

—কুঞ্জবন শূন্যি করে দিলে বাবা! যাও। সুখের কোকিল শীত তো সহ্য করতে পারবে না, তাই বসন্ত খোঁজ গে! আমরা দাঁড়কাক দিয়েই কুঞ্জ চালাব। বাগদীপাড়ার মতি-তোকি বেঁচে থাক বাবা।

হীরা গর্জে ওঠে,—ভাগো হিঁয়াসে। হারামজাদা কাঁহাকা!

হীরা চলেই যাচ্ছে আজ, এখানের সব শখ তার মিটেছে।

উদয় আসবার আগেই সে বের হয়ে পড়ে। কয়েক মাইল দূরে স্টেশন। আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই ফিরে যাবে কলকাতায়। এখানে আর কোন মোহ তার নেই।

রাত নেমেছে। বড়বাড়িটায় একটা সাড়া পড়ে গেছে। বসন্তনারায়ণ অভ্যাসমত ওপরে উঠে এসে খবর নেন মাঝে মাঝে।

দু-একদিন দেখেছেন সুস্মিতা ঘরে নেই। হয়তো অন্য কোথাও আছে, এই ভেবেই চলে গেছেন তিনি।

মন-মেজাজ বিশেষ ভাল নেই। এক এক করে খাসমহলপত্তনি খাস-জমি যা ছিল তাও ইজারা দিয়ে দিতে হয়েছে। জমিদারের বাৎসরিক আয় এতগুলো টাকা সব চলে যাবে।

একেবারে পথে দাঁড়াবেন তখন। মান-সম্মান, প্রতিপত্তি সব চলে যাবে ওই অর্থের সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর শুধু জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকা।

উদয়ও যদি মানুষ হত তাহলে এই সময় কোন ব্যবসায় নামতে পারত। তবু বেঁচে থাকার উপায় করতে পারত। কিন্তু লেখাপড়াও সে শিখল না। মানুষও হল না। একটা বেদনা তাই কাঁটার মত খচ খচ করে বেঁধে তাঁর মনে।

সতীশবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে এসব ভাবনার হাত থেকে অনেকটা রেহাই পেতেন তিনি। কারবারী লোক সতীশবাবু, জামাইকে ওটা শেখাতে পারত। তাছাড়া একমাত্র মেয়ে, সেদিক থেকেও কিছু আসত। এত অসহায় বোধ করতেন না।

বেশ বুঝেছেন জমিদারী চলে যাবার পর বাঁচার একমাত্র পথ ওই ব্যবসা মধ্যে নামা।

কিন্তু সেকথা উদয় বোঝেনি। সে নিজের পথেই চলেছে, এত খোঁজ খবর জেনেও।

বসন্তনারায়ণের সব রাগই পড়ে ওই মেয়েটির ওপর। আজও ওপরে উঠে খবর নেন।

—বৌমা কোথায়? তাকে একটু ডেকে দে।

আজ নিজেই ডেকে তাকে পরিষ্কার করে কথাগুলো শোনাবেন।

মানদা এদিক-ওদিক খুঁজছে, কিন্তু কোথাও তার দেখা নেই।

মনোরমাও এসে পড়েন। দাদাকে দেখে তিনিও দাঁড়ালেন।

—বৌমা কোথায়? বাড়িতে সেও কি থাকে না?

মনোরমাও জানেন না তার খবর। সারা বাড়িতে খোঁজ-খোঁজ র পড়ে যায়। মনোরমাও অবাক হয়েছেন।

—তাইতো, গেল কোথায়?

ঝি-চাকরেরা সকলেই বাড়ির এদিক-ওদিক খুঁজছে, তন্ন তন্ন করে খুঁজছে কোথাও সুমিতার দেখা মেলে না। সে যেন কর্পূরের মত উবে গেছে এখা থেকে। চুপ করে থাকে, ওরাও অবাক হয়েছে।

বসন্তনারায়ণ বলে ওঠেন,

—প্রায়ই দেখি না তাকে। ঘরের বৌ সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় যা তা তোমরা জানো না? উদয় কেন বাড়ি ছেড়েছে তা বুঝেছি এইবার।

চুপ করে থাকেন মনোরমা। তাঁর মনেও কি ভাবনা নামে।

বাগানে আবছা আলো পড়েছে গাছের মাথায়। আশপাশের গা তারই একটু আভাস। ওই বাগানের পথ দিয়ে আসছে সুমিতা। প বাঈজীর কাছে কথা পেয়েছে সে। সে জিতবেই।

রাত হয়ে গেছে।

সারা বাড়িটা কেমন স্তব্ধতায় ঢাকা। বাগানের আঁধার নামা পরিবে গা ছম ছম করে, বাতাসে ভাসে হাজারো জোনাকির ফুলকি।

গাছগুলো আঁধারে সীমা-প্রাচীরের মত উঠে গেছে। যেন আঁধা জমাট একটা স্তূপ। কোথায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে একটা শেয়াল ডেকে ওঠে।

মনে হয় কোন এক নিষ্ঠুর নির্জন রাজ্য।

স্বমিতার চারিদিকে অতল আঁধার। ওই আঁধারে জেগে আছে কোথাও হিংস্র কোন জানোয়ার। এখুনি শানিত নখ-দন্ত বিস্তার করে এসে পড়বে তার ওপর।

একটু আগেই দেখেছে ওই বাগানে ক-টা মানুষকে। সারা অন্তর কেঁপে ওঠে। তবু মনে হয় হাঁরা চলে যাবে, তার কথা রাখবে।

অন্ধকারে ভীত-ত্রস্ত একটি নারী এগিয়ে আসে বড়বাড়িটার দিকে। প্রায়ান্ধকার বাড়িটাকে ঘিরে কেমন যেন একটা রহস্য জেগে উঠেছে।

বাড়িতে এসে ঢুকল স্থমিতা। নিচের তলায় কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল স্থমিতা। হঠাৎ বারান্দায় ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল।

—শোন বউমা!

মনোরমাই ডাকছেন তাকে।

ওদিকে ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন বসন্তনারায়ণ। ওঁর মুখে পড়েছে আঁধার থেকে একফালি আলোর আভাষ। মুখে একটা নিবিড় কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। তিনিও এগিয়ে এলেন।

সারা জায়গায় একটা স্তব্ধতা ফুটে ওঠে, কি যেন ঝড়েরই পূর্বাভাষ জাগে। মনোরমা বলে ওঠেন,

—জবাব দাও বউমা, কোথায় গিয়েছিলে অন্ধকারে?

স্থমিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সারা বাড়িটার বুক থেকে সেই সুপ্ত কঠিন নির্মম আত্মা আজ জেগে উঠেছে।

সে সত্বা স্থমিতাকে বঞ্চনা করেছে নির্মমভাবে. আজ এ-বাড়ির সেই নির্মম সত্বাই কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে চলেছে তাকে, জবাব চাইছে। কেন সে এ-বাড়ির কঠিন আইন ভঙ্গ করেছে রাতের অন্ধকারে বাইরে গিয়ে।

স্থমিতা বলতে পারে না. কেন সে গিয়েছিল ওই বাগানবাড়িতে। সেখানে কারা থাকে, কি ধরণের জীব তারা—তাও দেখে এসেছে অনেক বেদনায় আর অপমানে। তবু সে তার কাজ উদ্ধার করে এসেছে অপমানিত হয়েও।

সেই অপমানের কাহিনী সে বলতে পারবে না। সেখানে ও গিয়েছিল আজ নিজের জন্ত নয়, গিয়েছিল বঞ্চিতা একটি নারী নিজের স্বামীকে ফিরে পেতে। তার সংসারের শান্তি ফিরিয়ে আনতে।

তার জন্ত নয়। যে আসছে, সেই সন্তানের কল্যাণ-কামনায় আজ সব অপমান সয়েছে স্থমিতা।

কিন্তু এখানে ফিরে এসে এমনি দারুণ একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে এ কল্পনাও করেনি সে। তাই শিউরে উঠেছে।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কঠিন সেই মানুষটি। বসন্তনারায়ণের মুখে অসহ্য ঘৃণা আর রাগের কাঠিন্য।

সুমিতা ওঁদের প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারে না। এ তার নিজের সমস্যা।

শাসনের স্বরে বলেন মনোরমা,

—প্রায়ই নাকি এমনি সময় কোথায় যাও তুমি! এ-বাড়ির সম্মান-ইজ্জৎ ধুলোয় মিশিয়ে দিতে এতটুকুও বাধলো না তোমার?

বসন্তনারায়ণ বলে ওঠেন,—দেখছি দোষ উদয়ের একার নেই, তোমার স্বভাবের পরিচয়ও সে পেয়েছে বোধহয়।

আর্তনাদ করে ওঠে সুমিতা,—না! না! বিশ্বাস করুন বাবা!

কঠিন কণ্ঠে বলেন বসন্তনারায়ণ,

—এ-বাড়ির অমঙ্গলের মূল কে, তা আমি জেনেছি। এ-বাড়িতে ঢোকা যত কঠিন, এ-বাড়ি থেকে বেরুনো তার চেয়েও শক্ত। কিন্তু একবার যে-বাড়ির বাইরে এমনি করে পা দেয়, তাকে আজীবন শাস্তি পেতে হবে কঠিন শাস্তি।

সুমিতা আর্তনাদ করে ওঠে, আজ সে শিউরে উঠেছে ওঁদের চরম নির্মমতায়।

সুমিতা আজ বলবে সব কথা। আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে সুমিতা,

—বিশ্বাস করুন আমাকে!

বসন্তনারায়ণ বলেন,

—থাক! নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে চাই না। যা দেখলা[illegible] তাই-ই যথেষ্ট; আজ নয়, ক-দিন থেকেই দেখছি। এর জবাব আমিই দেব।

বসন্তনারায়ণ কঠিন কণ্ঠে অভিযোগটা করেই চলে গেলেন। স্তব্ধ হ[illegible] দাঁড়িয়ে থাকে সুমিতা। কাঁপছে তার সারা দেহ। অজানা আতঙ্কে বি[illegible] হয়ে উঠেছে সে।

মনোরমা ওর দিকে চেয়ে রয়েছেন। মনে মনে শিউরে উঠেছে[illegible] মনোরমাও। এ-বাড়ির কঠিন নির্মম আত্মাকে চেনেন তিনি। এত[illegible] অপরাধের শাস্তি দেবার আগে অন্তত সেটা সত্যি কিনা জানা দরকার।

কিন্তু স্মিতা কিছু বলল না। বসন্তনারায়ণ চলে যেতেই অস্ফুট ভীত কণ্ঠে বলে ওঠেন মনোরমা,—বল মুখপুড়ি, সত্যি কথাটা বল, এসব মিথ্যে—মিথ্যে।

স্মিতা স্তব্ধ হয়ে পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ওঁরা যে এমনি কথা তার সম্বন্ধে উচ্চারণ করতে পারবেন এটা ভাবতেই পারেনি সে। অপমানে তার সব কথা স্তব্ধ হয়ে গেছে। কাঁদতেও ভুলে গেছে সে।

উদয়নারায়ণ এখানে-ওখানে ঘুরছে আজ টাকার সন্ধানে। হীরাকে কিছু টাকা দিতে হবে। কিন্তু সারাদিন ঘুরেও কিছু পায়নি।

গঞ্জের ধানকলের মালিকের কাছে গেছে, সেখানে অনেক বলে-কয়েও টাকা পায়নি। ওরা সবাই জেনে ফেলেছে ওদের অবস্থার কথা। এইবার লক্ষ্মির মত তারা উড়ে যাবে। না হলে ওদের টাকা এতদিন দিয়েছে চৈতমল। এবার হাত গুটিয়ে নিয়েছে কঠিনভাবে। তবু মুখের হাসি তার মোছেনি। এবার সে বলে,

—বাকি টাকা সুদসমেত দিয়ে দিন বাবু, আমার ব্যবসায় এখন ঘাটতি চলছে। বকেয়া টাকাটা দিন, তাছাড়া এখন জমি-জারাত নয়া বন্দোবস্ত করে টাকা তো আসছে বহুত।

উদয় বুঝতে পেরেছে, ওরা তাকে উল্টো চাপ দিচ্ছে। টাকা তো দেবেই না বরং চটাতেই চায় এইসব আজে-বাজে কথা বলে।

অন্য সময় হলে ওরাই সেলাম বাজাতো। বসিয়ে মালাই-চা খাইয়েছে, কত খোস-গল্প করেছে। আরও চড়াসুদে আরও বেশি টাকা গোছাবার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু আজ দিন বদলেছে। সেটা বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছে উদয়। মুখের ওপর যেন কঠিন একটা আঘাত খেয়েই ফিরেছে সে।

বাড়িতে যাবার ইচ্ছে নেই। বাগানবাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

টাকা যেভাবেই হোক যোগাড় করতে হবে তাকে। কাছারি থেকে আর এক পয়সাও পাবে না। কিন্তু অন্য কোথাও ধারও মিলবে না, এটাও বেশ বুঝেছে। উদয়ের সারা মনে একটা নীরব জ্বালা ফুটে ওঠে।

তাই এটাকে ভুলতে চায় সে কিছুক্ষণের জন্য। হীরাই তাকে এই বিস্মরণের নেশা এনে দিয়েছে সারা মনে। বাগানের দিকে চলেছে উদয়। হীরার দেওয়া পানীয়ের উষ্ণ স্পর্শে তার সারা মন সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। হীরা

তাকে কোন্ এক সব-ভোলানো মাধুর্য-লোকের সন্ধান দিয়েছে। উদয় সবকিছু তারই মাঝে ভুলে যায়।

বাগানে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল উদয়। ওপরের ঘরে আলো নেই, সব বাড়িটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। উদয় চিৎকার করে ওঠে,

—হীরা কোথায়?

পঞ্চা এগিয়ে আসে।

—উড়ে গেল উদয়বাবু! ফুঁৎ করে উড়ে গেল। হীরা চলে গেল। বললাম না, সুখের পায়রা! সুখ ফুরিয়েছে, পয়সায় টান ধরেছে—ওরাও এইবার টের পেয়ে ফুরুৎ-ধা হয়ে গেছে!

উদয় কঠিন হয়ে ওঠে। পঞ্চাও তাকে যেন পরোক্ষভাবে এই ধানকল-মালিক চৈতমলের তেঁতো কথাগুলো শোনাচ্ছে। ওরই খায় ওই পঞ্চা, আর তারই মুখের ওপর এইসব কথা বলে। এরাই বোধহয় হীরাকে ভাঙানি দিয়েছে। তাই চলে গেছে সে।

পঞ্চা আরও কি বলতে যাচ্ছিল।

উদয়ের এক লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ে সে—চোপ, কুত্তা কোথাকার।

চকিতের মধ্যে দুচোখ জ্বলে ওঠে পঞ্চার।

—লাথি মারলেন ছোটবাবু?

উদয় গর্জন করে ওঠে,—চোপরও কুত্তা কোথাকার! বেরিয়ে যা এখান থেকে। আমারই খেয়ে আমারই সর্বনাশ করা! চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব।

পঞ্চার এসব মার খাওয়া অভ্যাস আছে, কিন্তু আজ উদয়ের লাথিটাকে সে আর হজম করবে না। ও বুঝেছে উদয়ের দিন ফুরিয়ে আসছে।

পঞ্চার মনে হয় লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে ওই উদয়ের গলাটা টিপে ধরে শেষ করে দেবে। আঁধারে দুচোখ জ্বলছে পঞ্চার।

কিন্তু তা হয় না। চাকর-বাকররা এসে পড়েছে।

পঞ্চা ধীরে ধীরে উঠল। ঠোঁটটা কেটে গেছে সিঁড়ির কোণায় লেগে। থুথু ফেলে, সেই সঙ্গে উঠে আসে খানিকটা তাজা রক্ত। হাত দিয়ে ঠোঁটটা মুছতে থাকে সে। ওর জিবে যেন ওই নোনতা রক্তের জৈবিক স্বাদ একটা নিদারুণ হিংসার ছায়া আনে। রাগটা চাপবার চেষ্টা করে। বলে পঞ্চা, —বেশ, যাচ্ছি ছোটবাবু। তবে রাজত্বি ক-দিন থাকে তাই দেখব।

া সেই পঞ্চাই থাকবে ; কিন্তু ছোটবাবু বড়বাবু হলে কেমন লাগে, তাও া যাবে। আচ্ছা চলি।

উদয় গর্জন করছে চাকরগুলোকেই।

—হীরা চলে গেল, তোরা কিছু বলতে পারলি না? সবগুলোকেই ড়াব, সে যদি ফিরে না আসে।

নিজের ছোট এক-ঘোড়ার টমটম নিয়ে বের হয়ে পড়ল উদয়। হীরাকে জে বের করতেই হবে। এখনও ট্রেনের দেরি আছে।

আঁধারে সেদিকেই চলেছে সে জনহীন পথ ধরে। দূরে সিগ্‌ন্যালের ালোটা জ্বলছে নীল আভায়। জোরে চলেছে উদয়, চাবকাচ্ছে ঘোড়াটাকে। ন্তু সামান্য একটা ঘোড়া ট্রেনের গতিকে টপ্‌কে যেতে পারে না। উদয় বে ঘোড়াটারও দিন ফুরিয়েছে।

স্টেশনে ট্রেনখানা এল। দূর থেকে ওর আলোগুলো দেখা যায় দু-এক নিটের জন্য। আবার আঁধার দিগন্ত ঝাঁপিয়ে বাঁশির শব্দ তুলে ওই ালোকস্বপ্নগুলো আঁধার দিগন্তেই হারিয়ে গেল।

ওই ট্রেনেই চলে গেছে হীরাবাঈ। উদয় আজ তাকে ধরতে পারে না। ার সাধ্য তার নেই। ও হেরে গেছে। চারিদিকেই আজ সে হার মানছে। ানতে বাধ্য হচ্ছে।

মনে মনে অসহ্য রাগটা বেড়ে ওঠে। হু হু বাতাস কাঁপছে। অন্ধকার নমেছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উদয়। ওর চোখের সামনে দিয়ে এমনি করে ওই ীরা, সব আলো-আনন্দ নিঃশেষে হারিয়ে গেল।

বসন্তনারায়ণ রাগে-অপমানে মুখ কালো করে নিজের ঘরে চলে গেছেন।

এ-বাড়িতে একটা ঝড়ের আভাষ জেগেছে।

ভয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সুমিতা।

মনোরমা তবু কথাটা বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই সুমিতাকে জেরা রেন বার বার :

—কোথায় গিয়েছিলি বল সুমিতা। আমি জানি এসব মিথ্যে কথা। তাকে অবিশ্বাস কবিনি আমি। তাই বার বার জিজ্ঞেস করছি, জবাব দ।

সুমিতা জলভরা ডাগর দুটো চোখ তুলে ওঁর দিকে চাইল। ওর সারা মনে

কি বেদনার ছায়া। আজ সে বিশ্বাস করে পিসীমাকে। তাই কথাটা জান

বাগানবাড়িতে ওই বাঈজীর কাছে গেছলাম পিসীমা।

—সেকি! চমকে ওঠেন পিসীমা,—কি বলছিস সুমিতা?

—ঠিকই বলছি পিসীমা। এছাড়া আমার পথ ছিল না। নিজের স্বা য় কল্যাণের জন্য, যে আসছে, তার কল্যাণের জন্য এ মান-অপমানের কথা অ ভুলেছিলাম পিসীমা। আমাকে ভুলতেই হবে। আমি যে মা হতে চলেছি রি

পিসীমা ওর দিকে চেয়ে থাকেন।

তাঁর দুচোখে আনন্দের আভাষ। নিজেও এটা বুঝতে পারেননি খুশির আবেগে সুমিতাকে কাছে টেনে নেন।

—সত্যি রে? ধন্য সাহস তোর। তোর সাধনা সার্থক হবে মা। তু সুখী হবি।

মনোরমা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সারা মনে তাঁর আনন্দ। এ-বাড়ি প্রথম বংশধর আসছে। এতবড় খুশির খবরে তিনি আত্মহারা হয়েছেন।

—আজ উদয়ের মা থাকলে কতই না সুখী হতো।...

সুমিতা ওঁকে সব কথা বলে তবু অনেকখানি হাল্কা হতে পেরেছে আজ সব আঘাতের জন্য তৈরি হবার মত মনের জোর পায় সে।

রাত নেমেছে।

অন্ধকার জমেছে বাগানের গাছের মাথায়। জোনাকি জ্বলে। অন্ধকারে কে যেন মুঠো মুঠো তারাফুল ছিটিয়ে দিয়েছে আশমানে।

পিসীমা অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন ওর দিকে। বুকের কাছে টেনে নি বলে ওঠেন,—তোর চাওয়া একদিন পূর্ণ হবে সুমি। সব ফিরে পাবি তুই ও আপদও চলে যাবে বাগানবাড়ি থেকে। ঠাকুর মুখ তুলে চাইবেন সুমি।

সুমিতা তাঁকে প্রণাম করে। নিশীথ রাত্রের অতল অন্ধকারে এই বড়বাড়ির নিস্তব্ধতার মাঝে দুটি নারী আজ পরস্পর দুজনকে চিনেছে। পরম বেদনা আর আনন্দের মাঝে দুজনেই কি শান্তিময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

পিসীমা সুমিতার সাহসের তারিফ করেন। আপদ বিদেয় হোক, এ বাড়িতে শান্তি নামুক। স্তব্ধ বাড়িটায় রাতের অন্ধকারে প্রদীপের মত জেগে আছে আজ দুটি নারী।

বসন্তনারায়ণ আজ কাছারিঘরেই ফিরে গেছেন রাতের বেলায়। কতক-
■লা জরুরী কাজ বাকি আছে, কাজেও মন বসে না। খাসকামরায় টাঙানো
■য়কটা ছবির দিকে চেয়ে থাকেন। এই বংশের পূর্বপুরুষের ছবি সেগুলো।

বহু বিক্রম-নিষ্ঠুরতার নীরব ইতিহাস এ-বাড়ির অন্ধকার অনেক কোণ
■রিয়ে রেখেছে। এই বংশের কোন্ বৌকে এমনি এক অমার্জনীয় অপরাধের
■ তারা অন্ধকার ঘরে নিঃশেষে হত্যা করেছিল তিলে তিলে। দিনের
■লো থেকে নির্বাসিত সেই জীবন একদিন ফুরিয়ে গেছল।

কি ভাবছেন বসন্তনারায়ণ। শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। একটা নীরব
■ঠিন্য সারা মন ভরিয়ে তুলেছে: তাই ধমনীতে বয় চঞ্চল রক্তস্রোত।

দীর্ঘ কালো ছায়াটা এসে পড়ে দরজায় কোন মূর্তিমান অমঙ্গলের মত।
■ন্তনারায়ণ মুখ তুলে চাইলেন।

—কে?

দাঁড়িয়ে আছে উদয়নারায়ণ। টমটম থেকে নামতেই খবর পেয়েছে, তাই
■সেছে এইখানেই। হাতে সেই ঘোড়ার চাবুকটা। বসন্তনারায়ণ কি ভাবছেন।
■য়েকেই কাজে লাগাতে চান আজ।

—এস!

উদয় এগিয়ে আসে। ওর মনে ঝড় বইছে।

বসন্তনারায়ণ বলে ওঠেন,—এ-বাড়ির সম্মান রাখতে না পারলে তাকে
■স্তি পেতেই হবে, সে যেই-ই হোক। আশা করি তুমি বৌমাকে এই কথাটাই
■ণ করিয়ে দেবে। কোনো, রাতের অন্ধকারে এ-বাড়ির বৌ বাইরে গেলে
■কে শাস্তিই দেওয়া হয়।

উদয় বাবার দিকে চাইল। হীরা চলে গেছে: এ-বাড়িতে তার স্ত্রীর
■ক্ষেও ওই সব কথা শুনে তার নীল বক্ষে তুফান ওঠে।

—কোথায় গেছল সে?

জবাব দেন বসন্তনারায়ণ—কথাটা বৌমাকেই শুধিয়ো আর তার শাসনের
■বও তোমাকে দিলাম। না পারো আমাকেই নিতে হবে।

চমকে ওঠে উদয়নারায়ণ। তার স্ত্রী এতবড় অন্যায় কাজ করতে পারে
■া ভেবেই শিউরে ওঠে সে। হীরা চলে গেছে। বেশ বুঝেছে উদয়
■র-বাইরে আজ তাদের এমনি হীনভাবে অপমান করার চক্রান্ত চলেছে।

এখনও এত পঙ্গু হয়নি তারা।

বংশের সম্মানরক্ষার জন্য উপযুক্ত সন্তান আজ এই ঘোড়ার চাবুক হাতে ছুটে চলেছে ভিতর-মহলের দিকে।

সুমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এককোণে আলোটা জ্বলছে, তা আভা পড়েছে ওর মুখে।

সারা মনে একটা শান্ত তৃপ্তির আভাষ। আজ তবু এ-বাড়িতে এ মানুষকে চিনেছে, যিনি তাকে ভালবাসেন।

সুমিতার সব কথাই জেনেছেন পিসীমা। জেনেছেন, সুমিতা অন্য করতে পারে না। এ-বংশের যোগ্য বধূ সে, সারা মন দিয়েই সে কল্যাণ কাম করে। নতুন করে সংসার গড়ে তুলতে চায় প্রীতি আর প্রেমের সার্থক স্পর্শে

রাতের পাখিগুলো কলরব করে। মুঠো মুঠো তারাফুল ছিটনো আক কি আনন্দের হিল্লোলে ভরে উঠেছে।

তার মন পূর্ণ হবে, আবার উদয় ফিরে আসবে।

উদয়কে ঢুকতে দেখে চাইল তার দিকে সুমিতা। হাসি ফুটে সুমিতার মুখে, সলজ্জ মধুর হাসি।

আজ ওর জীবনের চরম সার্থকতার খবর শোনাবে স্বামীকে, দুজনে গ তুলবে একটি স্বপ্ননীড়।

যত বড় বিপদই আসুক না কেন, সব আঘাত সইবে তারা। সব দুঃখ-উত্তীর্ণ হয়ে দুজনের প্রেমে দুজন সার্থক হবে।

এগিয়ে আসে সুমিতা,—কখন এসেছো?

—দাঁড়াও!

উদয় কঠিন কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সুমিতা। উদয়ের হাতে সেই চাবুক। ব ওঠে উদয়,—কোথায় যাওয়া হয় রোজ সন্ধ্যেবেলায়? কোন নাগরের বুকে

সুমিতা ওর দিকে চাইল। সারা মুখে-চোখে বেদনার ছায়া। এত ধরে কি যেন বৃথাই সে স্বপ্ন দেখেছিল।

সুমিতা বেদনার্ত চোখ মেলে ওর দিকে চাইল। বলে ওঠে,—এসব বলছ? ছিঃ! এতটুকু বাধলো না তোমার?

—কি বলছি! খুব লজ্জা হচ্ছে, নয়? উদয় এগিয়ে আসে। গ করে ওঠে,—জানো, এ-বাড়ির অপমান করলে তার কি শাস্তি?

সুমিতা আজ চিনেছে ওদের স্বরূপ। নিষ্ঠুর অপদার্থ কতকগুলো লো শুনেছে হীরা চলে গেছে, তাই ক্ষেপে উঠেছে। শাসন করতে এসেছে তা

অন্যায়ের। এ-বাড়ির অপমান-মান সম্বন্ধে কথা বলে। এত দুঃখেও হাসি আসে সুমিতার।

আজ সব ভয় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। বলে ওঠে শ্লেষভরা কণ্ঠে সুমিতা,—এ-বাড়ির অপমান যদি কেউ করে থাকে, সে তুমি। মদ খেয়ে অমানুষ হলে এ-বাড়ির অপমান হয় না, সামান্য এক বাঈজীর পিছনে পড়ে থাকাটা এ-বাড়ির সম্মানের কথা, আর স্ত্রীকে যা-তা বলে অপমান করাটা এ-বাড়ির পৌরুষের পরিচয় ?

উদয় ওর তেজদৃপ্ত মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে। তার মনের মধ্যে কোন শুচিতা নেই। তাই জোরও নেই ওর কথার প্রতিবাদ করার, ওই যুক্তি খণ্ডন করার। তাই সুমিতার সুন্দর মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে প্রতিবাদের কাঠিন্য। ঘৃণার জ্বালা ওর সারা মনে। উদয় তবু ওকে থামাবার চেষ্টা করে। কঠিন কণ্ঠে ওকে ধমকায়,—সুমিতা !

গর্জন করে ওঠে উদয়। সুমিতার ওই কথাগুলো উদয়ের মুখে যেন চাবুকের এক-একটি আঘাতের মত কেটে বসেছে। ক্ষেপে উঠেছে সে। চাবুকটা তুলে এগিয়ে আসে সে।

সুমিতা আজ মুখর হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদ করে ওই সর্বংসহা নারী। —মারবে ? স্ত্রীর গায়ে হাত তোলাও এ-বাড়ির বীরত্ব ! দাঁড়িয়ে আছো কেন, সেটাই জাহির কর ! চাবকে আমাকে মেরে ফেলো—মুক্তি দাও।

পিসীমা কথাগুলো শুনেছেন বাইরে থেকে। এগিয়ে এসে ঘরে ঢুকে উদয়ের হাত থেকে উদ্যত চাবুকটা কেড়ে ফেলে দেন। আজ তিনিই যেন প্রতিবাদ করতে চান এদের এই অমানুষিকতার। —উদয় !

উদয় থামল। বলে চলেছেন পিসীমা তিক্তকণ্ঠে,—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তোরা মানুষ ! তোকে আমি মানুষ করেছিলাম ! তোদের মতিভ্রম ঘটেছে, নইলে ঘরের লক্ষ্মীকে এমনি করে অপমান করতিস না। চলে এসো বৌমা—চলে এসো এখান থেকে।

সুমিতা পিসীমার সঙ্গে বের হয়ে গেল। এখানে ওদের দাঁড়াতেও সম্মানে বাধে।

একাই গর্জন করছে উদয়—এ আমি সবই না। ককখনো সইব না।

বসন্তনারায়ণও পিছু পিছু উঠে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন শীঘ্রই যা হয় একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি।

মনোরমাকে হঠাৎ সুমিতার দিক নিতে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। এ-বাড়ির জীবনের প্রচণ্ড কদর্যতা আর নির্মমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে দুটি নারী। ওরা যেন একযোগে এদের অন্যায় শাসনকে উপেক্ষা করে।

বসন্তনারায়ণ কি ভাবছেন। ওঁর মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে একটা কাঠিন্যের ছায়া।

কিছুদিন থেকে সৌদামিনীর শরীর ভেঙে পড়েছে। প্রফুল্ল অনেক চেষ্টা করেও রোজগারের কোন সুরাহা করতে পারেনি। দীনু মুখুজ্যের গদিতে কাজ করত প্রফুল্ল, সেটুকুও গেছে। সংসারে নেমেছে অভাবের ছায়া।

সৌদামিনী বলে,

—লজ্জা করিস না প্রফুল্ল, হাজার হোক ভগ্নিপতি, তার বাবা তোর গুরুজন। তালুইমশায়কে গিয়ে বলগে না—সরকারী-টরকারী যা হয় একটা কাজ তবু তো মিলবে।

কথাটা প্রফুল্লও ভেবেছে, কিন্তু মন সায় দেয়নি। তাছাড়া শুনেছে সব কথাই। দীনু মুখুজ্যেই বাড়ি বয়ে এসে সুখবরটা শোনায় সেদিন। খুশি হয়েছে সে সেটা বোঝা যায়।

—জমিদারী তো গেল বৌঠান, কিন্তু তেজারতি-মহাজনী যায়নি। কন্দর্পের কাছেই শুনলাম বেয়াইয়ের দেনা নাকি বিশহাজার পেরিয়ে গেছে সুদে-মূলে। এইবার ও তো নালিশই করবে বলছিল।

প্রফুল্ল তবু কথা বলে না। কোনরকমে এটা-সেটা করে দিন চালায়। কিন্তু তাতেও কিছু হবার নয়। প্রফুল্ল মাকে আশ্বাস দেয়,—একটা চাকরি পাবই। ওই নিরু ওখানে খাতা লেখার জন্য বলছিল।

সৌদামিনী একটু চুপ করে থাকে। শুধোয়,—হ্যাঁরে, বিয়ের সময় উদয় কিছু বলেছিল, যে যাসনি তারপর থেকে?

—না, না। আমি গুরুজন, আমাকে কি বলবে?

সৌদামিনীর তবু কেমন ভাল লাগে না। তার শরীরও ভেঙে পড়েছে। মেয়েকে একবার দেখতেও সাধ হয়। চিঠিও দিয়েছিল উদয়কে। কিন্তু কোন উত্তর আসেনি। তারাও যেন তাকে ভুলে গেছে। সৌদামিনীর মনে হয় মেয়েকে তারা পরই করে দিয়েছে। বিয়েতে সুমিতা সুখী হয়েছে কিনা তাও

জানে না সে। প্রফুল্ল মায়ের মুখে দেখেছে কি চিন্তার ছায়া! তাই বলে,—রসগোল্লা খাইয়েছিল নিজে বসে থেকে সুমি। যত্নও করেছিল খুব তা।

চুপ করে থাকে সৌদামিনী। ওর কথাগুলো যেন সত্য বলে বোধ হয় না।

প্রফুল্ল বলে,—ওরা বড়লোক, আমরা গরীব লোক। ঘন ঘন গেলে ভাববে কিছু নিতে এসেছে। কি দরকার বাপু, তাই যাই না।

সৌদামিনীর অসুখ বেড়ে চলে। কব্‌রেজের জরি-বুটি ছাড়া পথ্য কই? ডাক্তার দেখাবার পয়সাও নেই। কোন ফলই হয় না। ধীরে ধীরে যেন জীবনদীপ নিভে আসছে তার। সৌদামিনী ব্যাকুল হয়ে ওঠে,—একবার সুমিকে দেখে যেতে পারব না বাবা? বড়লোকের ঘরে বিয়ে হল বলে কি সে-ও পর হয়ে গেছে। একবার গিয়েই দেখ না ওঁকে বলে, যদি একদিনের জন্যও আসতে দেন।

কাছারিতে ভিড় নেই। বসন্তনারায়ণ কথাটা ভাবছেন। তাঁর উঁচু মাথা মাটিতে নুইয়ে দিয়েছে ওই মেয়েটা। এই সব-হারানোর দিনে তিনি মান-সম্মানটুকুও হারাবেন এইবার।

আগেকার কাল হলে অতীতের সেই দ্বিচারিণী কুলবধূর মত তাকে এ-বাড়ির অতল অন্ধকারে জীবনের শেষদিন গুনতে হত। মুক্তির কোন পথই থাকত না। কিন্তু আজ দিন বদলেছে।

বসন্তনারায়ণ সে কঠিন পথ নিতে পারেননি, কিন্তু মনের উত্তাপ যায়নি। নীরব জ্বালায় জ্বলছে সারা মন। কি করা যায় তাই ভাবছেন।

উদয়ও একটু অতর্কিত আঘাতে চমকে উঠেছে। হীরা বাঈজী চলে গেছে। তার অবস্থা যে আজ কতখানি হীন হয়ে উঠেছে, সেটাও বুঝেছে উদয়।

নইলে হীরাকে যেদিন পয়সা দিতে পেরেছিল, সে যাবার কথা ভাবেনি। পয়সা ফুরিয়ে গেছে, তারাও চলে গেছে। ধানকলমালিক চৈতমল আভাষে-ইঙ্গিতে আগামী দুঃখ-দারিদ্র্যের কথাই জানিয়েছে। উদয় এতদিন সে-কথাটা ভাবেনি। আজ ভেবে শিউরে উঠেছে সে।

কাল রাত্রে দেখেছে নিজের স্ত্রীর কঠিন মূর্তি। এতদিন প্রতিবাদ করেনি এত কিছু সব মুখ বুজে সহ্য করেছিল সুমিতা। কাল রাত্রে সে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সুমিতা প্রতিবাদ করেছে কঠিন ভাষায়। সে-ও জেনে ফেলেছে এ-বাড়ির সেই পৌরুষ আর প্রতিষ্ঠার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই মানুষগুলোর সেই প্রতিষ্ঠার প্রাসাদ ভেঙে চুর হয়ে গেছে।

উদয় তাই এবার কাজে মন দেবার চেষ্টা করে।

কাছারিতে এসেছে। খাজাঞ্চিখানায় বসে কাগজ-পত্র দেখবার চেষ্টা করছে। মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আজ জমার ঘরে তেমন কিছুই নেই—সবই শূন্য। দেনাই বেশি। বলে ওঠে উদয়,—এসব তেরিজ ঠিক আছে সরকারমশায়? আর রোকড়গুলো কিসের?

বিষ্টু সরকার আড়ালে বলে,—এতদিন দেখলে না বাবা, যখন ছিল সব-কিছু! এবার যাবার বেলা শূন্যি-জমা দেখে কি হবে আর। সুমতি হল ছোট-বাবুর, কিন্তু অনেক দেরিতে।

ওর কথায় হাসে নায়েবমশাই।

তবু উদয় কাছারিতে এটা-সেটা কাজ দেখার দেখার চেষ্টা করে। এমনি সময় প্রফুল্লকে আসতে দেখে ওর দিকে মুখ তুলে চাইলেন বসন্তনারায়ণ।

প্রফুল্ল ওঁকে প্রণাম করে বলে ওঠে,—মায়ের অসুখ, তাই এলাম।

চারিদিক দেখছে প্রফুল্ল। আগে যখন এসেছিল তখন এমনি হতশ্রী অবস্থা ছিল না। জমজমাট ছিল কাছারি। আজ লোকের ভিড় নেই। বড়বাড়িটা আর প্রাসাদের অবস্থাও আজ জরাজীর্ণ। ভেঙে পড়েছে এদিক-ওদিক।

একনজরেই বুঝতে পারে প্রফুল্ল কোথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত এসে বেজেছে এ-বাড়ির বুকে। মানুষগুলোও বদলে গেছে। শ্রীহীন হয়ে গেছে চারিদিক।

বসন্তনারায়ণ এতক্ষণ কার সঙ্গে হেসে কথা বলছিলেন, প্রফুল্লকে আসতে দেখে মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। ওর কথার জবাব দিলেন না। প্রফুল্ল বলে চলেছে, —যদি দয়া করে একবার সুমিতাকে ওখানে পাঠান কয়েক দিনের জন্য, বড় ভালো হয়। মায়ের অসুখ।

বসন্তনারায়ণ কি ভাবছেন। এই যেন একটা সুযোগ পাওয়া যায়, একটা সমস্যা সমাধানের পথও দেখতে পান তিনি। বলেন,—নিয়েই যাও।

এককথায় যে তালুইমশায় রাজী হবেন, তা ভাবেনি প্রফুল্ল। তবু খুশি

হয় মনে মনে। সামনে উদয়কে দেখে কুশল প্রশ্ন করে সে,—ভালো আছ তো?

উদয় ওর দিকে চাইল। প্রফুল্ল ভেবেছিল উদয় তাকে প্রণামই করবে। তাই আগে থেকেই হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে বলে ওঠে,—থাক, থাক!

উদয় সেদিকে গেল না। হাত থেকে রোকড়টা পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে নিয়েই বের হয়ে গেল। প্রফুল্ল তবু খুশি হয়েছে। সুমিতাকে নিয়ে যেতে পারবে ক-দিনের জন্য। ওদের অপমান-অবজ্ঞা তাই গায়ে মাখে না।

সুমিতাও এ-বাড়ি থেকে ক-দিন ছুটির খবর শুনে খুশি হয়েছে। এখানে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কেমন যেন মুক্তির আশ্বাসে সে খুশি হয়েছে। গোছগাছ করছে সুমিতা।

ব্যাপারটা ভাল লাগে না মনোরমার। ক-দিন ধরেই দেখছেন বাড়িতে একটা ঝড়ো মেঘ যেন জমে উঠেছে। বসন্তনারায়ণ এত সহজে ওকে যাবার কথা বলতে একটু অবাক হয়েছেন পিসীমা।

নিজেই জিজ্ঞেস করেছেন মনোরমা বসন্তনারায়ণকে, —বৌমা কি বাপের-বাড়ি যাবে? তুমিই যেতে বলেছ দাদা?

বসন্তনারায়ণ আজ বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। নিজের ঘরে মামলার কয়েকটা শমন দেখছিলেন। কন্দর্পই শমনজারি করিয়েছে। ওদিকে দুটো বাকি-বকেয়া করের নালিশ দায়ের করা ছিল। তাও প্রজার তরফেই কিস্তিবন্দী ডিগ্রী হয়ে গেছে। কন্দর্পও শত্রু হয়ে উঠেছে কেন তা জানেন বসন্তনারায়ণ।

জমিদারদের বিষদাঁত ভাঙবার জন্য যেন চারিদিকে একটা গূঢ় চক্রান্ত চলেছে। মনটা রাগে ফুলে ওঠে। মনোরমাকে এ-সময় ঢুকতে দেখে চটে ওঠেন বসন্তনারায়ণ। বোনের কথায় জানান,—বৌমা বরং যাক এখান থেকে।

ওকে বৌমা বলতেও ঘৃণা বোধ করেন আজ তিনি। তবু বলেন,

—হ্যাঁ নিতে এসেছে। ও যাক। যাওয়াই ভালো ওর এখান থেকে। —কিন্তু—

মনোবমা আজ কথাটা জানাতে চান। এ-বংশের সন্তান আসছে ওর গর্ভে। কিন্তু তা হয় না। ওর কথা শেষ করতেও দেন না বসন্তনারায়ণ। তিনি কোন কথা শুনতে চান না। বলে ওঠেন,—এখন কাজে ব্যস্ত, মনোরমা। ওসব কথা থাক। যা বলেছি তাই হবে। ও যাচ্ছে যাক।

মনোরমা ক্ষুণ্ণ মনে বের হয়ে আসেন।

এ-বাড়ির কেউ জানতে চায় না সুমিতার মনের কথা। যে আসছে তাকেও যেন ওরা অমঙ্গলের দূত বলেই মনে করবে। তাই ও প্রসঙ্গ তোলে না। সে সম্বন্ধে নীরবই থাকতে চায় তারা।

এ-বাড়ির অনেকেই নাকি মনে মনে জেনেছে যত সব অমঙ্গল-সর্বনাশের মূল ওই অপয়া বৌ। তাই তার যাবার কথায় ওরা যেন মনে মনে খুশি হয়েছে।

উদয়ও বাধা দেয় না। সুমিতার আপনজন যেন এ-বাড়িতে কেউই নেই। তবু সুমিতা কিছুদিনের জন্যও যেতে চায় এখান থেকে।

মনোরমার মন কেমন করে ওকে এই সময় চলে যেতে দিতে।

—সত্যিই যাবি তুই ?

—মায়ের অসুখ। সুমিতার মায়ের জন্য মন কাঁদে।

পিসীমা ওর দিকে চেয়ে চুপ করলেন। জানেন মেয়ের মন। তাই বলে ওঠেন,—দু-একদিনের মধ্যেই মাকে ভালো দেখে ফিরে আসিস বাছা। বেশি-দিন থাকিস না কিন্তু।

হাসে সুমিতা।—না পিসীমা, এখানে সব পড়ে রইল। বাবার অযত্ন হবে, তোমারও শরীর ভালো নেই। আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।

পিসীমা ওকে কাছে টেনে নেন।

নির্মম নিরাসক্ত বাড়িটার অন্তরে দুটি প্রাণী কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকে শান্তির আশা নিয়ে।

ভোরবেলাতেই বের হয়ে এসেছে সুমিতা বাড়ি থেকে। তখনও পুবদিক ফরসা হয়নি। বিশাল বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকে সুমিতা।

দোতলার জানালায় পিসীমা দাঁড়িয়ে আছেন। সুমিতা ভেবেছিল উদয় একবার দেখা করবে অন্তত তার সঙ্গে যাবার আগে। কিন্তু ওর ঘুমই ভাঙে না।

বসন্তনারায়ণও দেখা করেননি।

প্রাণহীন ওই বন্দীপুরী থেকে বের হয়ে এসেছে সুমিতা।

জামাই বলেন,—দেরি করিস না বাছা।

[illegible]ের জগতে তখন সকালের প্রথম আলো কি স্বপ্ন এনেছে। পাখিগুলো কলরব করছে। গাছ-গাছালির মাথায় সেই মিষ্টি রোদের আভা। প্রফুল্ল সুমিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে,—কি রে, কথা কইছিস না কেন ?

সুমিতার মনে অনেক ভাবনা। ওদের দুজনের জগৎ আলাদা। তাই সুমিতা প্রফুল্লর কথায় যেন হাসে মাত্র। মলিন বিষণ্ণ সেই হাসি।

বাইরে এই অবাধ মুক্তির মধ্যে এসে সুমিতা আবার যেন নিজেকে ফিরে পায়। গরুর গাড়িটা চলেছে ধুলো-ভরা মেঠো-পথ দিয়ে। এদিক-ওদিকে দেখা যায় সবুজ গ্রাম-সীমা। মাঠে গরুগুলো চরছে। নদীর বালির বুকে এক চিলতে জলধারা তির তির করে বয়ে চলে.

সুমিতা বলে,—আগেকার দিনগুলো ভালো ছিল না রে দাদা ?

সেই সময়ের তুলনা নেই। আজকে টাকা-বাড়ি-গহনা সবকিছু বিলিয়ে দিয়েও সেই হারানো শান্তির স্পর্শ আর পাওয়া যাবে না।

সৌদামিনীর শরীর ভেঙে পড়েছে দীর্ঘদিনের রোগ-ভোগে। তিলে-তিলে ক্ষয়ে আসছে তার জীবনীশক্তি।

প্রফুল্ল গেছে সুমিতাকে আনতে। তারা এখনও ফেরেনি। একাই রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে সৌদামিনী ভাবছে নানা কথা। কোথাও এতটুকু আলো নেই, তার চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে জমাট অন্ধকার।

প্রফুল্লও অসুস্থ মাকে ছেড়ে বাইরে কোথাও কাজ-কর্মের জন্য যেতে পারেনি। এখানে আটকে পড়ে আছে। দিন চলছে কোনরকমে।

ওষুধপথ্যেরও যোগাড় নেই। ননী ডাক্তার দাম পায়নি। তাই ওষুধ দেওয়াও বন্ধ করেছে। প্রফুল্ল অনেক বলে-কয়ে শশী কব্‌রেজকে রাজী করিয়েছে। ওই নামেমাত্র চিকিৎসা চলছে। ওতে মন মানে মাত্র, রোগ মানে না। তাই বেড়েই চলছে সেই ব্যাধি। সৌদামিনীর দিন ফুরিয়ে আসছে তিলে-তিলে।

সুমিতা আর প্রফুল্ল এসেছে। খুশিতে সৌদামিনীর শীর্ণ মুখ ভরে ওঠে :

—এলি মা ?

সুমিতা ঘরে ঢুকে চমকে ওঠে। একনজরে বুঝেছে যে, এ-বাড়ির অবস্থা তার যাবার পর আরও হীন হয়ে গেছে। ঘরের চালে খড় নেই। ছাউনি অভাবে বাখারি বের হয়ে পড়েছে। ধ্বসে পড়েছে চারিদিকের পাঁচিল। ঘরের ভিতরও তেমনি শ্রীহীনতা প্রকট হয়ে রয়েছে।

—মা !

মাকে দেখে চমকে ওঠে সুমিতা। ক-বছরেই মা একেবারে যেন ফুরিয়ে গেছে। মায়ের কোটরগত দুচোখ থেকে জল নামে।

অসুস্থ মানুষটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আজ এত দুঃখের মাঝেও এইটুকু তার সুখের সঞ্চয়।

—হ্যাঁরে, উদয় এলো না?

সুমিতা আসল কথাটা জানাতে পারে না। তাই বলে,—কাজে ব্যস্ত রয়েছে মা, তার আসার সময় কই?

মা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে।

—ভালো আছিস তো মা?

সুমিতার সারা মনে ওই বিরাট বাড়িটার সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক আর ঘৃণা রয়েছে। ওই মানুষগুলোকে সে সহ্য করতে পারেনি। তার ভাল থাকার কথাটা মাকে জানাতে চায় না। তাই মায়ের কথার জবাব দেয়,—হ্যাঁ মা!

সৌদামিনী মেয়েকে সুখী হতে দেখেছে, এইটুকুই তার সান্ত্বনা। বলে,—তোরা সুখী হ' মা। তাতেই আমি খুশি। সব গেছে আমার তবু তোকে দেখে বুক জুড়োয় বাছা।

সুমিতা মায়ের জীর্ণ বুকে মুখ রেখে চোখের জল চাপবার চেষ্টা করে।

সৌদামিনীর দিন ফুরিয়ে আসছে। কব্‌রেজমশাইও প্রায় জবাবই দিয়ে গেছেন। জীবনের দায় থেকে মুক্ত হতে চলেছে সৌদামিনী। তবু দীনু মুখুজ্যে তাকে শোনাতে ছাড়ে না কথাগুলো। তার দেনা তখনও মেটাতে পারেনি। ইদানীং দীনু মুখুজ্যে আরও শাঁসে-জলে ফুলে উঠেছে। তেমনি কঠিন স্বরেই সৌদামিনীকে শোনায়,—ঋণ-মুক্ত হয়ে যাও বড়বৌ। বাড়ি-জমি যা বন্ধক আছে সুদে-মূলে তা দামকেও ছাড়িয়ে গেছে। বুড়ো বামুনের টাকা মেরে স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবে না তুমি।

সুমিতা ও-পাশের রান্নাঘর থেকে কথাটা শুনছে। এ-বাড়ির দারিদ্র্যটা তার কাছে ফুটে উঠেছে। মা বলে চলেছে,

—প্রফুল্লর রোজগার নেই ঠাকুরপো। একটা কাজ-কর্ম পেলে তোমার টাকা দিয়ে দেবে।

—আর দেবে? কেন, রাজা জামাইকে বলো না?

নিজেই বলে আবার দীনু বেশ শুনিয়ে শুনিয়ে,—বুঝলে, রাজাও ফোত। ওসব নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। শুনলাম দেনার দায়ে তো ঝুরঝুরে

য়ে গেছে, তারপর জমিদারীও চলে গেল। তাই বলছিলাম—ওসব বাড়ি, মি-ঘর কিনেই নিই। কব্‌লাপত্র করে দাও।

সৌদামিনী চমকে ওঠে।

—প্রফুল্লকে পথে বের করে দোব ঠাকুরপো?

দীনু মুখুজ্যে কঠিন স্বরে জবাব দেয়,

—তার আমি কি জানি? মরতে চলেছ তাই শেষ কথাটা শুনিয়ে লাম তোমাকে।

সুমিতা ওই কঠিন লোকটির দিকে চেয়ে আছে।

ওকে দেখে দীনু মুখুজ্যে হাসছে। দাঁত বের করে একটা জানোয়ার যেন করছে সুমিতাকে।

—এই যে সুমি! ভালো আছো তো? এ্যাঁ! বাবুরা ভালো আছেন? জার হোক জমিদার বংশ—রাজা বলে কথা! নাই বা থাকলো তালুক-ক। মরা হাতিই লাখ টাকা। সেই ঘরের বৌ তুমি!

সুমিতা ওর দিকে চেয়ে থাকে। দেখছে লোকটাকে।

দীনু মুখুজ্যে বুঝেছে কথা বললেই এবার জবাব দেবে ওই তেজী মেয়েটা। জবাবটা যে মিষ্টি হবে না তাও জানে। সেই সব ভেবেই চুপ করে ল সে।

বলে,—তাহলে চলি বৌঠান। কথাটা বলে গেলাম, ভেবে দেখো।

দীনু মুখুজ্যে বের হয়ে গেল।

সৌদামিনীর ওসব কথা ভাববার বা শোনবার সামর্থ্যও নেই। তার সব আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। স্তব্ধ হয়ে আসছে সব ভাবনা—জীবনের কলরব। চোখের সামনে নামে জমাট তমসার গাঢ়তা।

—মা! সুমিতা আর্তনাদ করে ওঠে।

কোন সাড়া নেই। প্রফুল্লও কব্‌রেজমশাইকে নিয়ে ঢুকেছিল। সে-ও ড়ে আসে; ডাকছে মাকে।

সৌদামিনীর সামনে তখন কি এক নীলাভ আলোর আশ্বাস। তার মুক্ত আত্মা তখন দূর পথের যাত্রী।

সেখানে কোন বেদনা নেই, কোন কোলাহল নেই।

সুমিতা কেঁদে ওঠে। প্রফুল্ল স্তব্ধ হয়ে চেয়ে দেখছে। মৃত্যুর হিমশীতল তা নামে জীর্ণ ঘরখানায়।

সারা জীবন দুঃখ-বেদনা সয়ে সয়ে আজ সৌদামিনী শান্তির স্পর্শ পেয়ে
তাই সে শান্ত—স্তব্ধ।

ঘরখানায় কান্নার শব্দ ওঠে। প্রফুল্ল বেশ বুঝেছে তার আজ সব হারি
গেল। এত বড় পৃথিবীতে সে আজ একা। কোন সঞ্চয় নেই—পাশে কে
নেই।

রাতের আকাশে তারাগুলো উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলছে। বেণুবনে হাহাকা
তোলে রাতের দিকহারা বাতাস। কে যেন আকাশ-বনানীতে ওই কান্না
শব্দ তুলেছে। তাতে মিশেছে সুমিতার আর্তকণ্ঠের কান্নার শব্দ।
জীবনের একটি নিভৃত স্বপ্ন আজ নিঃশেষে হারিয়ে গেল।

স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রফুল্ল। চোখের সামনে জীবনের কঠিন চরম সত্য নি
পরিণতিটুকুকে আজ প্রথম সে প্রত্যক্ষ করেছে। বোনকে সান্ত্বনা দেব
চেষ্টা করে প্রফুল্ল।

—কাঁদিস না সুমি। জীবনে এ কান্নার শেষ নেই। তাই বলে শুধু
কাঁদবি? অনেক দুঃখ পেয়ে গেছে সে, আজ সে শান্তি পাক!

রাত্রির শেষ মুহূর্তে চারিদিকে সেই প্রশান্তির সুর ওঠে।

সুমিতারও সব হারিয়ে গেল। জীবনে এই একমাত্র ঠাঁই, যেখানে
পেয়েছিল স্নেহ-মায়া-মমতা—সেই ঠাঁইটুকুও হারিয়ে গেল।

মা নেই। বাড়িটা আজ শূন্য—স্তব্ধ।

সেদিন একাই বসে আছে সুমিতা। প্রফুল্ল এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে
তবু যেভাবে হোক মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে হবে। ভাইবোনের কথার মা
দীনু মুখুজ্যে এসে চেপে বসেছে দাওয়ায়। সুমিতা চুপচাপ থাকে।

সে-ই পরামর্শ দেয়,—বসন্তবাবুর ওখানে খবর দিয়েছ?

—হ্যাঁ। জবাব দেয় প্রফুল্ল।

দীনু মুখুজ্যে হাসে।

—ব্যস্। তবে আর কি! এখুনি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দানবীর লো
তিনি। তোমার ভাবনা কি?

প্রফুল্লই বাধা দেয়।

—তা কেন নেব আমরা? গরীব লোক, যেভাবে জোটে সেইভাবে
মায়ের কাজ হবে আমাদের।

কিন্তু সুমিতা অবাক হয়। তার এত বড় বিপদে কোন খবরই নিল

উদয়—ও-বাড়ির কেউ। সুমিতা ভেবেছিল অন্তত উদয় নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু সে-ও আসেনি, কোন খবরই নিল না তারা। ওদের এই হৃদয়হীনতায় সুমিতা বেদনা পেয়েছে। মনে মনেই দুঃখ চেপে থাকে সুমিতা।

পাড়ার দু-একজন জিজ্ঞেস করে,—কই রে সুমি, জামাই এল না ?

—সুমিতা মলিন হাসি হেসে জবাব দেয়,—কাজে ব্যস্ত রয়েছেন ! তাছাড়া গরীবের ঘরে তাঁরা আসবেন কেন বলো ?

অনেকেই হাসে অর্থপূর্ণ হাসি। তারাও অবাক হয়েছে জামাইকে না আসতে দেখে। দীনু মুখুজ্যে ফোড়ন দেয়,—তা যা বলেছ ! তবে কি জানো, পরামর্শটা সদুঠাকরুণ তখন শোনেনি। যাক্ গে সব কথা। যার যা বরাত তাই হবে তো !

সুমিতাই আড়ালে প্রফুল্লকে বলে,—যা হয় টাকাকড়ি দিচ্ছি, না হয় গয়নাটা বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা আনো। কাজকম্মো করতে হবে তো ?

বাধা দেয় প্রফুল্ল,—না। শেষকালে তারা বলবে তোর গয়না বেচে মায়ের শেষ কাজ করেছি। ওসবে আমি নেই।

প্রফুল্ল কোনমতে কাজটুকু শেষ করে। নিজের ভবিষ্যৎ কি জানে না। একটা পেট যা হোক কোনমতে চলে যাবে। নিজের জন্য সে ভাবে না।

তবু সুমিতা বলে,—তোমার জন্য ভাবনা হয় দাদা।

—ভাবনা আমার জন্যে ? তোকে তোর ঘরে পৌছে দিয়ে আসি, তারপর যা হয় দেখা যাবে। বুঝলি, দুঃখকষ্ট এসব গায়ে মাখি না। সহ্য হয়ে গেছে ওসব। ভালোই হয়েছে। মাও নেই, এইবার তোকে ওখানে দিয়ে জয় দুগ্গা বলে বের হয়ে পড়বো।

দীনু মুখুজ্যে এতদিন এই সুযোগই খুঁজছিল। সে-ও এসে জুটেছে। সে দাবী জানায়,—তাহলে টাকা যখন মিটোতেই পারলে না বাপু, বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করে দাও। যা হয় কিছু টাকা দাম ধরে নাও। সুদে-আসলে দাঁড়িয়েছে ধর পাঁচশো সতেরো টাকা তিন আনা, এই যে—

হিসেবের ফর্দ সে সঙ্গে করেই এনেছে একেবারে সুদ কষে।

প্রফুল্ল চমকে ওঠে। এতদিন যে বাড়িতে বাস করেছে সেই বাড়িও চলে যাবে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে, তা জানত না। প্রফুল্ল চুপ করে কি ভাবছে।

দীনু মুখুজ্যে বলে ওঠে,—তোমাকে ঠকাবো না প্রফুল্ল, সাতশো টাকা মূল্য

ধরেছি। বকেয়া টাকা নিয়ে তুমি বাড়ি ছেড়ে দাও। আর ভুগতে রাজী নই বাপু। অনেক গেছে, এইবার ক্ষেমা দাও।

বাকি টাকাগুলো ওর মুখের ওপর বাড়িয়ে দেয় দীনু,—ধর। আর কিছু করো না। কালই রেজেস্ট্রি-পত্র হয়ে যাক।

প্রফুল্লর আজ সব বাঁধন যেন খুলে গেছে। মা চলে গেল, সেই সঙ্গে সে-ও এ-মাটি থেকে উৎখাত হয়ে গেল। গ্রামের বাড়ি-ঘরও সব পরের অধীনে গেল।

গরুর গাড়িটা চলেছে গ্রাম থেকে। সুমিতাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে প্রফুল্ল ওর বাড়িতে। তারপর কোথায় সে যাবে জানে না। সুমিতা চুপ করে এই সব ব্যাপারই দেখছে। করতে কিছু পারেনি। তার সামান্য টাকা দিয়েও সাহায্য করতে পারেনি সে।

—দাদা!

সুমিতার ডাকে প্রফুল্ল ওর দিকে চাইল।

সুমিতাও ওই নীরব আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করে,—কোথাও যাবে এরপর? সব তো গেল। বাড়ি-ঘর-জমি—

প্রফুল্ল কি ভাবছিল। বোনের দিকে চেয়ে বলে ওঠে,—আরে, এতবড় পৃথিবীতে আবার যাবার জায়গার অভাব? এই তো মদনের দাদা, ও তো ডাকছে। সদরে নাকি ওদের মস্ত কারবার। বলছিল বিশ্বাসী লোক চাই। ঝুলোঝুলি। ভাবছি ওদের ওখানেই যাব। কাজকর্ম করব। মাইনে-থাকা-খাওয়া। ব্যস্। ওসব তুই ভাবিসনি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রফুল্ল খুশি হবার চেষ্টা করে।

এমনিতেই ওসব দুঃখ গায়ে মাখে না সে।

রাস্তা খারাপ। শীতের শেষ, বসন্ত এসেছে বনে বনে। প্রফুল্ল বাইরের এই উদার দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে। পাখি-ডাকা দিগন্ত।

প্রফুল্ল বলে ওঠে,—কই হে গাড়োয়ান, তোমার গরুজোড়াটা চলেছে কই? ছাড় দিকি একটু। এদিকে বেলা যে দু-পহর হতে চলল।

নিজেই গাড়োয়ানের হাত থেকে পাঁচনবাড়িটা নিয়ে মনের আনন্দে গরুর লেজটা মলে দিয়ে কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করে অচল গাড়ির চাকা দুটো সচল করবার চেষ্টা করে। কিন্তু এও যেন তার ভাগ্যের মত। সচল হতে চায় না, পদে পদে এর বাধা।

গরুদুটো প্রাণপণ টানছে, তবু চলতে পারে না তারা। ধুলো উড়ছে আর বাতাসে জেগে ওঠে উত্তাপ।

কাছারিবাড়িতে যখন পৌঁছল তারা, তখন প্রফুল্লর ন্যাড়ামাথায় লেগেছে ধুলো। জামাটার হাতা গোটানো। সুমিতার ট্রাঙ্কটা দেউড়ির বাইরে নামিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে গাড়োয়ান। প্রফুল্লর হাতে একটা পুঁটলি।

অতি সাধারণ হৃতদরিদ্রের মত ওরা ওই বিরাট বাড়িটার সামনে এসে হাজির হয়েছে। প্রফুল্ল এইবার সুমিতাকে পৌঁছে দিয়ে অজানাপথে বের হবে।

মন কেমন করে তার।

ওরা দেউড়ি পার হয়ে চলেছে বাড়িটার দিকে ওই ধূলি-মলিন অবস্থায়।

ক-দিনেই সুমিতার চেহারাও অনেক শুকিয়ে গেছে। এ ক-দিন নানা চিন্তায় ব্যস্ত ছিল সুমিতা। তার দেহে যে আর-একজনের অস্তিত্ব মিশিয়ে আছে তা টের পায় এইবার। মনে ফিরে আসে সেই বিচিত্র অনুভূতিটুকু।

আবার নিজের ঘরে ফিরেছে সে। মাথায় ঘোমটাটা দেওয়া অবস্থায় গাড়ি থেকে নেমে দেউড়ির ফটক পার হয়ে কাছারির কাছে এসে অন্দর-মহলের রাস্তাটায় পা দেয়।

বড়বাড়ির ছাদ থেকে দেখেছেন পিসীমা ওকে গাড়ি থেকে নামতে। ওরা গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছে। পিসীমা অন্দরে নেমে এলেন ওপর থেকে।

বসন্তনারায়ণও খবর পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর করার কিছু ইচ্ছেই ছিল না।

উদয়ও সুমিতার মা মারা যাবার খবর শুনে যায়নি। যাওয়ার দরকারও বোধ করেনি।

ওদের মনটা তেমনি বিষিয়েই আছে সুমিতার ওপর।

এই ক-দিন উদয় কাছারিতে বসেছে। ক্রমশঃ টের পাচ্ছে কি চরম সর্বনাশ হতে চলেছে। সব জমি-জারাত চলে গেছে। হারিয়ে যাচ্ছে সব পত্তনি, মহাল সব কিছু। খাসমহালে মাত্র পঞ্চাশ বিঘে জমি থাকবে। এতবড় বাড়ি মেরামত করবার সাধ্যও হবে না। ভবিষ্যতের সেই নগ্ন অভাবের ছবিটা তার সামনে ফুটে ওঠে।

মন-মেজাজ ভাল নেই। মাঝে মাঝে সুমিতার কথা মনে পড়ে। সে-ও

এই নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের কথাগুলো বেশ আনন্দের সঙ্গে অভিশাপের উচ্চারণ করেছিল। উদয়ের রাগ হয় তার ওপরও।

সে চেয়েছিল এ-বাড়ির ধ্বংস। তাই বর্ণে বর্ণে ফলেছে।

আজ বসন্তনারায়ণ কথাটা ভাবেন আর ফুলে ওঠেন অসহায় রাগে। এ-বাড়ির ধারাকে নিষ্ঠুরভাবে অপমান করে সুমিতা এখান থেকে অক্ষত চলে যাবে, একথা ভাবতেই পারেন না। সকলেরই পুঞ্জীভূত রাগ ওই মেয়েটির ওপরই।

এমনি সময় ওদের শোভাযাত্রা করে এ-বাড়ি ঢুকতে দেখে এগিয়ে আসেন বসন্তনারায়ণ। কঠিন হয়ে ওঠে তাঁর মুখ-চোখ। আজ সবকিছুর শাস্তি দেবেন তিনি।

—দাঁড়াও!

ওঁর কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়াল সুমিতা। মানুষটার দিকে চাইল।

তিক্তকণ্ঠে বলে ওঠেন বসন্তনারায়ণ,—আবার এ-বাড়িতে ফিরেছ কেন?

চমকে ওঠে সুমিতা। এ-বাড়ি থেকে চলে যাবার কোন কথাই তো হয়নি! আর যাবেই বা কেন? কি তার অপরাধ? এখানেও তার দাবি আছে।

তার সারা দেহ ঝিম ঝিম করে কি আতঙ্কে।

বসন্তনারায়ণ কঠিন স্বরে বলে চলেছেন,—সেদিনই বলেছিলাম, এ-বাড়িতে ঢোকা সত্যিই কঠিন, ঢুকলে বেরনো যায় না। কিন্তু একবার যে এ-বাড়ি থেকে বের হয়, এখানে আর তার ঠাঁই হয় না। কথাটা সেদিনই তোমার বোঝা উচিত ছিল। ঢোকার অধিকার তুমি হারিয়েছ। যাও এখান থেকে।

সুমিতার পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। আর্তনাদ করে ওঠে সে,—কোথায় যাব? কেন?

বসন্তনারায়ণ গর্জে ওঠেন, রাতের অন্ধকারে সেদিন যে জাহান্নামে গিয়েছিলে, সেখানে। এ-বাড়িতে আর তোমার ঠাঁই নেই।

সুমিতার দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। সারা দেহ তার কাঁপছে।

উদয়ও এসে পড়েছে। ঘৃণাভরা চোখে উদয় চেয়ে থাকে ওর দিকে।

সুমিতা দেখছে উদয়কে। এই তার স্বামী। তার জীবনের সবকিছু গড়ে উঠেছে ওকে ঘিরেই। সুমিতা ব্যাকুলকণ্ঠে আজ উদয়কে প্রশ্ন করে,—তুমি কিছু বলবে না?

—না। উদয় কঠিনকণ্ঠে জানায়।

-বাড়ি থেকে কোথায় যাবো আমি ?

উদয় গর্জে ওঠে,—এখানে থাকার কোনও প্রয়োজন, অধিকার কিছুই ■মার নেই। কোথায় যাবে তাও জানি না।

সুমিতা উদয়ের পায়ের কাছে বসে পড়ে কাতরকণ্ঠে বলে,—এ-সব কি বলছ ■মরা ? কি দোষ করেছি বলো ?

বসন্তনারায়ণ ছেলেকে ধমকে ওঠেন,—উদয়, ওদের যেতে বলে দাও এখান ■কে। ও যেন মনে রাখে, এ-বাড়ির ও কেউ নয়।

সুমিতার সারা মনে নিজের জন্য নয়, আর-একজনের জন্য ভাবনা জাগে। ■ংশের সেই আগামী সন্তান। তার জন্যই সে সেই রাত্রে গিয়েছিল একটি ■জীর কাছে প্রার্থনা জানাতে। সে-ও শুনেছিল তার কান্না ; তাকে সাহায্য ■রে গেছে।

কিন্তু এরা ? কঠিন পাথরের মানুষ। তবু সুমিতা সেই পাথরেই মাথা ■াড়ে, তুমিও কি চলে যেতে বলছো ?

উদয় জবাব দেয়,—হ্যাঁ, তাই।

আর্তনাদ করে ওঠে সুমিতা,—কিন্তু আমি যে মা হতে চলেছি। আমার ■ালে আসছে এ-বংশের বংশধর। তারও কি এ-বাড়িতে ঠাঁই হবে না ?

উদয় চমকে ওঠে। জবাব দেয় রহস্যভরা কণ্ঠে,—বাঃ, সব কলঙ্কের বোঝা ■ামার ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে চাও, বলিহারী ! এতদিনে বুঝেছি তুমি ■ ?

সুমিতা বলে চলেছে কান্নাভরা স্বরে,—বিশ্বাস কর, তুমি আমার স্বামী, ■চেয়ে বড় দেবতা। তোমার পা ছুঁয়ে, আমার শাঁখা-সিঁদুরের দিব্যি ■রে বলছি—তুমি বিশ্বাস কর, আমি নিষ্পাপ। আমাকে যে শাস্তি দিতে ও দাও, কিন্তু তোমার সন্তানকে আমার মিথ্যা অপরাধের শাস্তি দিও না।

উদয় ওর হাত থেকে নিজের পা দুটোকে লাথি মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে ■ড়িয়ে বলে ওঠে,—দারোয়ান !

সুমিতা কাঁদছে। ওদের চোখের সামনেই বড় লোহার ফটকটা বন্ধ হয়ে ■ল। মাটিতে বসে পড়ে সুমিতা, কাঁদছে সে। অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ভেতর থেকে ছুটে আসছিলেন পিসীমা। তিনিও শুনেছেন এদের ■াগুলো। চমকে উঠেছেন এদের স্বরূপ দেখে। উদয় বৌমাকে বের করে ■য়েছে দেখে। বলে ওঠেন পিসীমা,—এ তুই কি করছিস উদয় ?

উদয় জবাব দেয়,—ঠিকই করেছি। চলে যাক ও, এখানে ওর ঠাঁই হবে না।

পিসীমা কান্নাভেজা স্বরে বলেন,—ওদের ফেরা উদয়। ঘরের লক্ষ্মীকে তুই বিদায় করে দিলি? ওরে অনেক ভুল করেছিস, এটা আর করিস না।

বসন্তনারায়ণ বলেন,—এ-বাড়ির লক্ষ্মী ও নয় মনো, ও অলক্ষ্মী। তাই অলক্ষ্মীকে আজ বিদায় করলাম। তুমি কোনও কথা বলো না।

উদয় বলে চলেছে,—পাপকে প্রশ্রয় দিতে বলো না পিসীমা! ওকে দূরই করে দিলাম। এ-বাড়ির কলঙ্ককে সরিয়ে দিয়েছি।

পিসীমার দুচোখ জলে ওঠে। এ-বাড়ির অনেক কাণ্ড তিনি দেখেছেন। পাপ যে এদের কতখানি, তাও জেনেছেন তিনি। তাই আজ কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন পিসীমা,—পাপ! তোদের পাপ যে ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে! বেঁচেছিলি অ্যাদ্দিন ওই সতীলক্ষ্মীর পুণ্যেই। এবার তোদের সব যাবে। আজ মাকে আমার তাড়ালি উদয় মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে! তোরা মানুষ? ছিঃ ছিঃ! পশুরও অধম তুই উদয়।

সুমিতা কাঁদছে। এ-বাড়ির পাষাণ প্রাচীরে ওই কান্না গুমরে ওঠে। ব্যর্থ সেই কান্না।

একজন এ-সব দেখছিল। সে প্রফুল্ল। গরীব—লেখাপড়াও জানে না সে। বড়বাড়ির মানুষদের এই অপরিসীম নিষ্ঠুরতায় সে চমকে উঠেছে। বোনকে অসহায়ের মত কাঁদতে দেখে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে। তার সুপ্ত পৌরুষ জেগে ওঠে। এত বড় অন্যায় সে সইবে না। যেভাবেই হোক এর প্রতিবাদ করবে সে।

প্রফুল্ল দেখেছে এদের সব কাণ্ড। ঘৃণায় মন বিষিয়ে ওঠে তার। প্রথম দিন থেকেই এ-বাড়ির সেই ব্যবহারগুলো তার মনে আছে। মানুষকে এরা মানুষ বলে ভাবে না।

কেবল নিজেদের স্বার্থ আর দম্ভটুকুই এদের সর্বস্ব। এদের কাছে আশ্রয় চাওয়া বৃথা। বিচার এরা ভুলে গেছে, ন্যায়-অন্যায়বোধও এদের নেই।

কঠিনকণ্ঠে বলে প্রফুল্ল,—ওঠ সুমি। এখানে কেঁদে কোন ফল হবে না।

সুমিতা দাদার দিকে কান্নাভেজা চোখে চাইল। ওর নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও নেই।

প্রফুল্ল ওকে হাত ধরে তুলল,—চল সুমি। বলছিলাম না, এতবড়

পৃথিবীতে ঠাঁই আমাদের নিশ্চয়ই কোথাও হবে। সেই ঠাঁই-ই খুঁজে নেবো তুই ভাইবোনে। কাঁদিস না! কেন কাঁদবি?

সুমিতার চোখের জলও যেন ফুরিয়ে এসেছে। বেশ বুঝেছে সে কান্নার কোন দাম নেই এদের কাছে। এই পাষাণপুরীর পাথরে কেঁদে মাথা খুঁড়ে ফেললেও এরা ফিরেও চাইবে না।

ধীরে ধীরে তার মনের অতলে কঠিন একটি মন জেগে ওঠে সব বেদনা আর অপমানের অন্তঃস্থল থেকে। অতবড় অপমান সয়েও সে আর ওই নির্মম মানুষদের কাছে কোন দয়ার প্রত্যাশা করবে না।

প্রফুল্লর কথায় ওর দিকে চাইল সুমিতা।

কান্নাভেজা সুন্দর মুখখানায় কাঠিন্য ফুটে ওঠে। বলে সে,—ঠিকই বলেছিস তুই। নাঃ—আমি আর কাঁদবো না। কক্‌খনো কাঁদবো না। চল, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো। এদের সীমানা থেকে অনেক দূরে।

প্রফুল্লর মনে কঠিন একটি প্রতিবাদের দৃঢ়তা জাগে।

—তাই চল।

বড়বাড়িটার ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা তাকে আজ পথের ওপরই ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। উদয়—বসন্তনারায়ণ কেউ তার দিকে ফিরেও চাইল না।

যে গাড়িটায় তারা এসেছিল গাড়োয়ান তখনও দাঁড়িয়েছিল। সে-ও অবাক হয়ে গেছে এই নিদারুণ কাণ্ড দেখে। মেয়েটির দুঃখে তার মনও ভরে ওঠে কি বেদনায়। সেই-ই ওদের ফিরে আসতে দেখে বলে,—এই গাড়িতেই ওঠো মা।

ইতস্ততঃ করে প্রফুল্ল। লোকটাই বলে,—ভাড়া আর নেবো না মা। ভাড়া লাগবে না। ওঠো।

একটি নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষও জমিদারবাড়ির এই নিষ্ঠুরতায় শিউরে উঠেছে।

আবার অনিশ্চিতের পথে হারিয়ে গেল তারা।

সব ব্যাপারটা দেখছিল একটি মানুষ, সে ওই পঞ্চানন। উদয়ের ভূতপূর্ব পার্শ্বচর।

উদয়ের সেদিনকার লাথি-চড় সে ভোলেনি। বাগানবাড়িতে সেদিনের সেই অপমান হজম করেই সে বের হয়ে এসেছিল। পথ খুঁজছিল। এইবার

যেন সেই অপমানের শোধ নেবার পথ পেয়েছে। চেয়ে থাকে সে ওই মেয়েটির দিকে।

একদিন ওকেই বধূবেশে বাগানবাড়িতে দেখেছিল পঞ্চানন। আজ বেশ বুঝেছে। ওর কোন আশ্রয় নেই। ভাইয়ের অবস্থাও যে কাহিল তাও বুঝেছে। কি ভেবে নেয় পঞ্চানন! তার শয়তানি মতলবটা মাথায় খেলে যায়।

বহুকাল ধরে এই পথে সে বহু নারী আমদানি-রপ্তানীর কাজ-কারবার করেছে। তাই আশা নিয়েই এগিয়ে আসে সে শিকার ধরার মতলবে।

গরুর গাড়িটা চলেছে আবার মাইল তিনেক দূরের স্টেশনের দিকে। ওইখানেই ওদের ছেড়ে দিয়ে সেই পুরন্দরপুরে তাদের গ্রামে ফিরে যাবে গাড়োয়ান। গ্রামের সবাইও জানবে সুমিতার এই চরম অপমানের কথা। খুশি হবে দীনু মুখুজ্যে। তাই নিয়ে অনেক রসালাপই হবে হয়তো।

তবে প্রফুল্ল এসব কথা আর ভাবে না। সে আজ ওই গ্রাম সীমার বাঁধন কাটিয়েছে। বলে চলেছে সুমিতাকে,—বুঝলি, মদন আমার অনেক দিনের বন্ধু। শহরে মস্ত কারবার খুলেছে। বাড়িও আছে দু-এক- খানা।

সুমিতা চুপ করে চেয়ে থাকে ওই স্টেশনের ছোট ঘরখানার দিকে। মাঠের মধ্যে ওই লাইনটা কোন্ অজানা দেশে হারিয়ে গেছে। ওরা স্টেশনে এসে নামল।

ট্রেন আসতে দেরি আছে তখনও। দু-চার জন যাত্রী এদিক-ওদিক ঘুরছে।

ওইখানেই দেখা হয় প্রফুল্লর পঞ্চাননের সঙ্গে। প্রফুল্লর ওকে ভালই লাগে। বেশ প্রাণখোলা মানুষটি। একটুক্ষণের মধ্যেই পঞ্চাননের সঙ্গে প্রফুল্লর ভাব জমে যায়।

পঞ্চানন বিড়ি টানতে টানতে বলে চলেছে,—শহরেই যাবো।

প্রফুল্ল যাচ্ছে শহরে। দু-একবার গেছে মাত্র সেখানে। পথ-ঘাট তেমন চেনে না। সঙ্গী পেয়ে খুশীই হয়। পঞ্চাননও এমনি একটা সুযোগ খুঁজছিল। প্রফুল্লও বলে,—আমরাও শহরে যাচ্ছি।

—তাই নাকি! পঞ্চানন একটু নিরাসক্তভাবেই বলে কথাটা।

প্রফুল্ল বলে ওঠে,—ভালোই হল, তবু একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। এতখানি পথ মুখ বুজে যেতেও ভালো লাগে না।

পঞ্চানন ক্রমশঃ ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রফুল্ল এমনিতে সাদাসিধে,

■াই নানা কথা বলে চলে। শহরে যে বিশেষ যাতায়াত করেনি সেটাও ■ানায়। সেখানে গিয়ে একটু মুস্কিলেই পড়তে হবে।

পঞ্চাননও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এই সুযোগে। সে-ই বলে,—চলো ■া। যাহোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ট্রেনে চলেছে তারা।

প্রফুল্ল এতক্ষণ সুমিতাকে মিথ্যাই আশা দিয়েছিল। মদনের কারবারের ■া বলেছিল। মদন অবশ্য শহরে থাকে। শুনেছে মাত্র প্রফুল্ল। তার ঠিকানা ■ানে না।

কোন দোকানে কাজ করে তাও জানে না। তাকে খুঁজে বের করতে ■রলে একটা আস্তানা জুটবে। কিন্তু তার আগে থাকবে কোথায় তাই ■বছে। সুমিতাকে সব কথা বলা যায় না। ঘাবড়ে যাবে সে।

পঞ্চানন ওর দিকে চেয়ে থাকে। কি ভাবছে। পঞ্চানন যুৎ করে একটা ■ড়ি বের করে একবার সুমিতার দিকে তাকায়। মনে মনে হাসছে সে। ■য়বাবুর অপমানের চরম প্রতিশোধ সে এইবার নেবে।

পঞ্চানন গলার চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে বিড়িটা ধরিয়ে বলে,—বাসা ■বিশ্যি আমার সন্ধানে আছে। ভাড়াও তেমন বেশি নয়। তবে কি ■নেন, অসুবিধা হবে হয়ত। এহ জল-টল—খুব বেশি নাও মিলতে পারে।

প্রফুল্ল যেন হাতে চাঁদ পায়।

—আরে, সেসব ভাবনা নেই। ওসব ঠিক ব্যবস্থা করে নেবো। এখন ■থা গোঁজার ব্যবস্থা হলেই যথেষ্ট। পরে একটা কাজকম্মো পেলে সব ঠিক ■য় যাবে।

পঞ্চানন নিমরাজী হয়,—চলুন, যখন যাবেনই বলছেন—নেমে স্টেশনে ■টু চা-টা খাবেন তার মধ্যে আমি বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলে সব ■স্থা করে এসে নিয়ে যাবো। অবশ্য কাজটাও পরে হয়ে যেতে পারে।

প্রফুল্ল মাথা নাড়ে,—বেশ।

পঞ্চানন এত সহজে যে কাজ হাসিল করতে পারবে ভাবেনি। তাই খুশিই ■ছে সে।

সুমিতা চুপ করে বসে আছে। ট্রেনটা ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলেছে গ্রাম—■াঘন বাগান—শস্যরিক্ত মাঠ পার হয়ে। বিরাট এই পৃথিবীর অগাধ ■র মাঝে সে যেন তার নিজের কথাগুলোও ভুলে গেছে। সারা মনের

অনুভূতিগুলো কেমন যেন আচ্ছন্নের মত একটা অসাড় বেদনাহীন অনুভূতিতে মনকে স্তব্ধ করে রেখেছে।

প্রফুল্ল ওপাশে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলে চলেছে। সুমিতার মনে হয় ও যেন কোন দূরে হারিয়ে গেছে। তার স্বামী—সেই বিরাট বাড়িটার কথা মনে পড়ে।

হঠাৎ কাদের হাসির শব্দে ফিরে চাইল। কামরার ওদিকে একটি ছেলেকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী উঠেছে। ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি হাসছে। স্ত্রীর দুচোখে কি তৃপ্তির আভা। স্বামী আদর করছে ছেলেটিকে।

চমকে ওঠে সুমিতা। তার জীবনে এ-ছবি কোনদিনই সত্যি হবে না। সব স্বপ্ন দিনের আলোর রূঢ় বাস্তবে হারিয়ে গেছে নিঃশেষে। দুচোখ বেয়ে জল নামে। বাইরের দিকে চেয়ে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে সুমিতা।

পঞ্চানন হাসছে। প্রফুল্লকে সে আশ্বাস দেয়,

—শহর বড় তাজ্জব জায়গা ভায়া। সেখানে আবার চাকরির অভাব? মুরুব্বীর জোর থাকলে সবই হয়। আমিই বলে দেবো দু-একজনকে। কাজ হবে না?

প্রফুল্ল আশা ভরে চেয়ে থাকে ওর দিকে। পথের মাঝেই ওকে পেয়েছে। মনে হয় ওকে পেয়ে তার ভালই হয়েছে। শহরের দিকে এগিয়ে চলেছে ট্রেনখানা।

বিচিত্র এই পরিবেশ। শহরের সুন্দর ভদ্রপাড়াগুলো থেকে এই এলাকা বেশ কিছুটা দূরে। এ যেন ভিন্ন এক জগৎ।

এখানের বাসিন্দারাও বিচিত্র ধরনের জীব। ভাঙা বাড়িগুলো এখানে পাশাপাশি গা লাগিয়ে রয়েছে। সরু পথের ধারে খোলা কলের জল পড়ছে—ওপাশে জমেছে আবর্জনা—নোংরার স্তূপ। ওরই একপাশে পানের দোকানে কাঁচের আলমারিতে সাজানো রয়েছে লেমনেড—সোডার বোতল। মঘাই পানও মিলবে। দিনের বেলায় এ-পাড়ার অবস্থা অতি শোচনীয়। রাতের অন্ধকারে এখানে আলো জ্বলে ওঠে, পানের দোকানে রেডিও বাজে।

পথে-ঘাটে দেখা যায় গিলে-করা ঘুন্টিদার আদ্দির পাঞ্জাবী-পরা লোকগুলোকে। ওদের গায়ে ওঠে গোলাবী আতরের খোসবু। গানের সুর ওঠে ওই ভাঙাবাড়িগুলোর মধ্য থেকে। দিনে-রাতে এর রূপ বদলায়।

পঞ্চানন শহরের এই রাজ্যের পথটা ভাল করেই চেনে। এখানে তাকে

কাজে-অকাজে প্রায়ই আসতে হয়। আজ সে বেশ খুশি মনেই স্টেশন থেকে নেমে এই পাড়ার মধ্যে এসে ঢুকল। রাম অবতার পানওয়ালা ওকে দেখে হাসে,—রাম রাম পঞ্চাবাবু! ভালো তো?

একটু হেসে এগিয়ে চলে গেল পঞ্চানন সামনের বাড়িটার দিকে।

বিন্দী বাড়িউলি শহরের খানদানী লোক। ছোট-বড় অনেক বাড়ি আছে তার। কয়েকটা বাড়িতে রীতিমত দেহ-পসারীর ব্যবসাই চালাচ্ছে। পঞ্চাননের সঙ্গে তার খাতিরও আছে। বিন্দী ওর সাকরেদ গুপী লোহারকে কোন্ ভাড়াটেকে তুলতে হবে তারই নির্দেশ দিচ্ছে।

—বড় দেমাক মেয়েটার। যদি মানে মানে না যায়, ওর বাপটাকেই ঘা কতক বসিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দিবি, বুঝলি?

গুপী লোহারের একটা চোখ ছোটমত ট্যারা, কপালের কাছ থেকে একটা গভীর ক্ষতের দাগ মুখখানাকে বীভৎস করে তুলেছে। বোতলের বাকি পানীয়টুকু সাফ করে বলে ওঠে গুপী,—ওসব আর ভাবতে হবে না। যদি বেশি গড়বড় করে, বুড়োকে—হাতটা ইশারা করে দেখায়। যেন একটা মুলোকেই পট করে ভেঙে দিচ্ছে আর কি!

বলে বিন্দী,—না না। ওসব করিস না বাপু। এমনিতেই কাজ সারবি। আরে পঞ্চাননবাবু যে! অনেকদিন যে দেখা নেই? কি খবর?

পঞ্চানন যুৎ করে বসে বলে ওঠে,—খবর আছে মাসি। তবে একেবারে ফাসকেলাস। রাজার রাণী, বুঝলে? একটু সময় নেবে সমঝাতে। হ্যাঁ, আপাততঃ একটা বাড়ি ভাড়া দাও দিকি ছোটমত! ওইখানেই তুলে দিই, ভাড়াও দেবে। তারপর তোমার বরাত আর আমার হাতযশ। তবে একেবারে ফাঁকি দিও না মাসি! বুঝছ তো যা বাজার পড়েছে।

বিন্দী হাসে। বলে,—হ্যাঁরে, ভাড়া দেবে তো? না ঘর ভাড়া নিয়ে একদিন ভাড়া মেরে উড়ে যাবে?

পঞ্চানন দেখছে বিন্দী রাজি হয়েছে। তার লোভেরও শেষ নেই।

পঞ্চানন জানে এই করেই সে বিন্দীর মত মানুষের কাছ থেকে কিছু আদায় করে থাকে। পঞ্চানন বিন্দীকে শোনায়,—তা দেবে। আগামই নিও এক মাসের। সব এনে দিচ্ছি বাড়িতে। আমার গাড়িভাড়াটা, খাইখরচা—এটা মিটোও আগে!

—দোব বাছা। পাই-পয়সাও মারব না কারও।

বিন্দী বাড়িউলি বেশ সজোরে ঘোষণা করে তার এই সুনামের কথা। অবশ্য পঞ্চাও এটা জানে।

প্রফুল্ল আর সুমিতা নতুন বাড়িতে এসে উঠেছে। কিছুদিন এখানে থেকে প্রফুল্ল মদনের খোঁজ করে একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেবে। ততদিন কোনরকমে চালাতেই হবে তাদের কষ্টে-সৃষ্টে।

সুমিতা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। জীর্ণ ঘর, কল থেকে ঝর ঝর শব্দে জল পড়ছে। নতুন শহর। স্টেশন থেকে রিক্সায় করে আসবার সময় কিছু কিছু দেখেছে। গঙ্গার ধারে বেশ খানিকটা ফাঁকা। চরে বাবুলগাছের ঘন ছায়া নামে, গঙ্গার ওদিকে ঘন আমবন।

ছোটবাড়ির মধ্যে যেন বন্দী হয়ে পড়েছে সুমিতা। এ-বাড়িটা শহরের ঘিঞ্জির মধ্যে। চারিদিকে এর বিচিত্র বসতির ভিড়।

প্রফুল্ল শহরের এখানে-ওখানে খোঁজ করছে তার সেই পরিচিত মদন-মোহনের। বাজারে এ-দোকানে সে-দোকানে সে খুঁজছে।—মদনমোহন আছে এখানে? নানানজনকে প্রশ্ন করে সে।

স্টেশনারী দোকানের ভদ্রলোক মাথা নাড়ে,—না, এখানে তেমন কেউ নেই।

আবার পথে নামল প্রফুল্ল। দুপুরের রোদে সে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেছে। অচেনা শহর, এত লোকের ভিড়ে মদন কোথায় হারিয়ে গেছে। কি ভেবে সামনের কাপড়ের দোকানেই ঢুকল প্রফুল্ল। মদনের খোঁজ তার নিতেই হবে।

বৃদ্ধ মত এক ভদ্রলোক চোখে নিকেলের চশমাটা বাঁধতে বাঁধতে জিজ্ঞেস করে,—কি প্রয়োজন?

প্রফুল্ল বলে,—আজ্ঞে, এখানে মদনমোহন আছে?

—মদনমোহন? ভদ্রলোক কি ভাবছেন।

প্রফুল্ল আশান্বিত হয়। হয়তো ও চেনে মদনকে। বলে ওঠে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব দরকার।

ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে দেখায়,—ওইখানে, ওই যে আর্সি-কাঁচ দেখছেন, ওইখানে খোঁজ করুন, পেতে পারেন।

প্রফুল্ল উৎফুল্ল হয়ে নেমে ওই দোকানের দিকে দৌড়ল। সেখানেও গিয়ে খোঁজ করে,—মদনমোহন আছে?

ভদ্রলোক উঠে দোকানের ভেতর চলে গেল। প্রফুল্ল আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক খুঁজে মদনের সাক্ষাৎ পেয়েছে এইবার। তার চেনা দোকানে হয়তো সে প্রফুল্লর চাকরি করে দিতে পারবে। প্রফুল্লর একটা চাকরির দরকার। ভদ্রলোক ভেতর থেকে কাঁচ-বাঁধানো রাধাকৃষ্ণেব ছবি এনে বলে,—এই নিন মশায়, মদনমোহন আর রাধাকেষ্ট সবই এক।

প্রফুল্ল অবাক হয়,—এ তো ছবি!

ভদ্রলোক চমকে ওঠে,—তবে কি জ্যান্ত খুঁজছেন মশাই? জ্যান্ত মদন-মোহন? এ্যাঁ! দোকানদার ওর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কে জানে পাগল, না মাথাখারাপ!

বলে ওঠে প্রফুল্ল,—আমাদের গাঁয়ের মদনকে খুঁজছি মশাই।

ভদ্রলোক ছবিটা গুটিয়ে তুলে রাখল। প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করে,—মদনকে—

বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে ওঠে দোকানদার,—বললাম তো জানি না। এমন কত মদন শহরে ঘুর-ঘুর করছে মশায়। আপনিই তো দেখছি একটি মদ্না। ধ্যাত্তোর!

প্রফুল্ল ভদ্রলোকের দাবড়ানিতে থেমে গেল। বেশ বুঝেছে মদনকে খুঁজে সে কোনদিনই পাবে না। তার সামনে হতাশার জমাট অন্ধকার নামে। সামনে বাঁচার কোন পথই নেই। ওদিকে পয়সা-কড়িও ফুরিয়ে আসছে।

প্রফুল্ল ক্ষুণ্ণমনে পথে নামল। রাত্রি হয়ে আসছে। মদনের কোন সন্ধান সে পায়নি। ভাবনায় পড়েছে সে।

সুস্মিতা চুপ করে বসে আছে।

প্রফুল্ল এখনও ফেরেনি। সন্ধ্যার পরই এখানের আকাশে-বাতাসে গানের সুর ওঠে। মেয়েদের হাসির শব্দ শোনা যায়। সুস্মিতা জানলা থেকে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে অবাক হয়। এখানকার অনেক মেয়েই সেজে-গুজে লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। দু-একজন লোক ওদের সাথে হাসি-তামাসা করছে। পথ দিয়ে হেঁকে যায় গোড়ের মালাওয়ালা। পানের দোকানে ভিড় জমে।

স্থমিতা ঘরে কাকে ঢুকতে দেখে ফিরে চাইল।

একটি বয়স্কা মহিলা বেশ ভারি দেহ নিয়ে ঢুকল। চোখ দুটোয় ওর কেমন সন্ধানী দৃষ্টি। সে দেখছে স্থমিতাকে। স্থমিতার কেমন যেন ভয় হয়। গায়ে কাপড় চাপা দিয়ে সরে দাঁড়াল স্থমিতা।

বিন্দী বাড়িউলি নিজেই সরেজমিনে মেয়েটিকে দেখতে এসেছে। তার এলাকায় এমনি করেই অনেক মেয়ে আসে। কেউ নরম, কেউ শক্ত। ওদের বিষদাঁত ভেঙে এই রাজ্যের বাসিন্দা করে নেয় বিন্দী। এই তার জীবিকা।

স্থমিতাকে দেখে একটু অবাক হয়েছে সে। রূপবতীই সে। বাজারে এর অনেক দাম। বেশ খুশিই হয়েছে বিন্দী। বলে সে,—আমাকে আবার লজ্জা কেন বাছা! মাসি বলেই ডেকো। আমারই বাড়ি, শুনলাম তোমরা এয়েছ ভাবলাম খোঁজটা নিয়েই যাই।

চেপে বসল বিন্দী। খোঁজ নেয়,—শুনলাম দাদাও এয়েছে। তা, সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে তোমার দেখছি!

চুপ করে থাকে স্থমিতা। তার চরম অপমানের কথা ওকে বলতে পারে না।

বিন্দী দাঁত-পড়া মাড়ি বের করে হাসে। এমন অনেক বিচিত্র ঘটনা দেখেছে সে। এসব তার কাছে নতুন কিছু নয়। ওসব প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য মাথা নাড়ে।

—থাক, থাক বাছা। ওসব কথা থাক। পেছনের সব ধুলোময়লা ঝেড়ে-ঝুড়ে আবার নতুন করে ঘর পাতো। তবে বাছা বললাম—আজকাল ছেলেদিকে বিশ্বাস করো না, অনেক কথা বলবে। কিন্তু তোমার বাবা ও এক কথা—ফেল কড়ি।

স্থমিতা ওর কথাগুলো কেমন বুঝতে পারে না, ভয় হয় মনে। এ সে কোথায় এসে পড়েছে। এই জগতের সঙ্গে সে পরিচিত নয়।

বিন্দী বলে,—চলি বাছা। আবার আসব। আহা, কচি বয়স তোমার, ও ভাবনা করো না বাছা। শুনলাম কেউ কোথাও নেই। যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। ওসব ঠিক হয়ে যাবে বাছা। এসে যখন পড়েছ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিন্দী বের হয়ে আসে।

বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল সেই জানোয়ারের মত লোকটা। সে ও

লাহার। বিন্দীর কাছে সে এগিয়ে আসে। বিন্দী গলা নামিয়ে বলে ওঠে,—একটু নজর রাখবি, বুঝলি! কোথাও উড়ে যেন না যায়। আর ছোঁড়াটাকে চোখে-চোখে রাখিস। ওই মেয়েটার দাদা না কে হয় বললে, সেইটার ওপর।

গুপী মাথা নাড়ে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরছে প্রফুল্ল। তার কাছে কোথাও এতটুকু সান্ত্বনা নেই। ক-দিন পরেই যা সামান্য টাকা-পয়সা আছে ফুরিয়ে যাবে। সেদিন ভাইবোনে দাঁড়াবে কোথায় জানে না। পঞ্চাননেরও খোঁজ করেছিল, কিন্তু তারও দেখা নেই। সবাই এতবড় পৃথিবীতে তাকে একা ফেলে সরে গেছে। তবু থামবে না প্রফুল্ল। বাঁচতে তাদের হবেই। এক-এক সময় মনে হয় যাত্রার দলেই চাকরি নেবে। গান গাইতে পারে—পার্ট করতে পারে সে।

বাসার দিকে আসছে। রাতের বেলায় এখানের রূপ আলাদা। ওকে চকচকিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে দেখে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল।

—এই যে, নাগর যে!

প্রফুল্লর হাতখানা ধরে ফেলে সে। প্রফুল্ল আঁতকে ওঠে।

আমি নাগর-টাগর নই, আমার নাম প্রফুল্ল।

মেয়েটি ওর মুখের সামনে সিগারেটের একটা দীর্ঘটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে,—এখন আর চিনতেই পারছ না যে!

ওর কাঁধেই মাথা দিতে যায়। প্রফুল্ল ধমকে ওঠে,

—এ্যাই! একটি কিলে নাক ভেঙে দোব। আচ্ছা মেয়ে তো! ছেনালির জায়গা পাওনি?

হো-হো করে হাসতে থাকে মেয়েরা।

কোন একটা মেয়ে বলে,—নাগর কি বলে রে? এ যে রসিক নাগর!

প্রফুল্ল চটে উঠেছে। সারাদিন ঘুরেছে বিভিন্ন জায়গায়। যে আশা নিয়ে জোর নিয়ে সে এখানে এসেছিল সেই জোর কোনদিকে মিলিয়ে গেছে।

সুমিতার কথা মনে পড়ে।

বেশ বুঝেছে এ-জায়গাটা ভাল নয়। সেই পঞ্চানন তাদের ভুলিয়ে এমনি একটা পাড়ায় এনে হাজির করেছে। প্রফুল্লর মনে হয় আবছা অন্ধকারে

মানুষের নয় যেন হিংস্র বন্যজন্তুদের একটা আস্তানায় তারা এসে উপস্থিত
হয়েছে।

যেভাবে হোক একটা পথ তাকে বের করতেই হবে।

পেছনে সেই মেয়েদের হাসির তীক্ষ্ণ শব্দটা কানে আসে। ভয়ে ঘাব—
গিয়ে প্রফুল্ল সরে যাচ্ছে, পালাচ্ছে এখান থেকে।

নিজের বাসার সেই খুপরি ঘরখানার দিকে এগিয়ে চলে।

সুমিতার মন কি অজানা ভয়ে শিউরে উঠেছে। এ-পাড়ার রূপ বদ—
গেছে। গানের টুকরো শব্দ ভেসে আসে। মত্তপকণ্ঠের চিৎকার শোনা যা—
একটু আগেই সেই কালো মোটামত মেয়েটিকে আসতে দেখে বেশ ভ—
পেয়েছে সে। ও হাবভাবে-ইঙ্গিতে কি-সব বলতে চেয়েছিল। ওর তী—
চাহনিটাও ভোলেনি সুমিতা।

ও চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে একটা মোমবাতি জেলে বসে আ—
জীর্ণ দরজাটা বোধহয় কাদের ধাক্কায় ভেঙে পড়বে। ভীত-ত্রস্ত একটি মে—
দুচোখে নেমেছে কি বেদনার অশ্রু।

আজ তার হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

সেই বড়বাড়ির প্রাচুর্য—তার স্বামীর কথা মনে হয়। সেই বির—
প্রাসাদের এক কোণে একটু আশ্রয় চেয়েছিল। স্ত্রীর দাবি নিয়ে সে থাক—
না পেলেও ক্ষতি ছিল না। তবু সেখানে এই বিশ্রী আতঙ্কের হাত থেকে —
নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচতো।

অভাবটাকে সে দেখেছে নগ্নরূপে। তার কাছে আজ বাঁচার প্র—
সবচেয়ে বড়। তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আর একটি মূল্যবান প্রাণ।
হতে চলেছে সে।

কিন্তু কোন্ জগতের মাঝে আসবে তার সন্তান? কি আশ্বাস দি—
পারবে সে?

তবু সুমিতার মনে হয় এখান থেকে সরে যাবে, যেখানে হোক অন্যত্র গি—
তারা বাঁচার চেষ্টা করবে। তার মনে কি যেন কঠিন একটি প্রতিজ্ঞার ম—
এই কথাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে।

দরজা নড়ছে। চমকে ওঠে সুমিতা। চেনা কণ্ঠস্বর শুনে দর—
খুলে দিল।

আশ্বস্ত হয়। প্রফুল্ল ফিরেছে। হাঁপাচ্ছে প্রফুল্ল। তার চোখের সাম—

এ-পাড়ার সেই কদর্য জীবনের ছবিটা ফুটে ওঠে। বাঁচার আশ্বাস এখানে নেই। কোথাও নেই।

সুমিতা ওর দিকে চেয়ে থাকে। ও জানে প্রফুল্ল কিসের আশায় সারাদিন ঘুরেছে এখানকার পথে পথে। একটা কাজ-কম্মো পেলে চলে যাবে এখান থেকে তারা। সুমিতার কাছে আজ সেটার প্রয়োজন অনেক।

তাই ব্যাকুল আশাভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সে,—মদনের কোন খোঁজ পেলে দাদা?

প্রফুল্ল বোনের দিকে চাইল। চোখে-মুখে ওর হতাশার কালো ছায়া নেমেছে। মাথা নাড়ে প্রফুল্ল।

—না। এত বড় শহরে কার খোঁজ কে রাখে বল! মদনকে কে-ই বা চিনবে?

সুমিতা চুপ করে। তবু মরিয়া হয়ে শুধায়,—কোন কাজ-কম্মের সন্ধান পেলে?

সে-কথারও কোন আশাপ্রদ জবাব দিতে পারে না প্রফুল্ল। সবকিছুই তার অনিশ্চিতের অন্ধকারে ঢাকা। বলে সে, দেখি! এখান থেকে চলে যাবো সুমি।

সুমিতাই যেন এই কথাটা বলতে চেয়েছিল। সে রীতিমত ভয় পেয়েছে এখানে এসে। তাই প্রফুল্লর কথায় সে-ও জানায়,—তাই চলো দাদা, এ বিশ্রী জায়গা থেকে যেখানে হোক অন্য কোথাও চলো।

দুই ভাই-বোনের মুখে সেই ভাবনার ছায়া নামে। সুমিতা ও-বেলায় সামান্য কয়েকখানা রুটি আর একটু ঘ্যাঁট মত করে রেখেছিল। এছাড়া আর কিছুই জুটছে না তাদের।

সুমিতার চোখের সামনে অতীতের ছবিটা ফুটে ওঠে। সেদিন তার অনেক কিছুই ছিল। খাবার ভাবনাও ভাবতে হয়নি।

প্রফুল্ল বলে,—সব রুটিই যে আমাকে দিচ্ছিস? তোর কই?

সুমিতার খাবার স্পৃহাও যেন নেই। তাই এড়িয়ে যায়।

—খেয়েছি আমি।

তবু প্রফুল্লর মন মানে না। ও জানে তাদের অবস্থা। তাই বলে,—দুখানা রাখ। এতেই হবে আমার।

সুমিতার কাছে এই নরক থেকে মুক্তির প্রশ্নটাই বড়। তাই বলে,—যত শীঘ্রি পারো এখান থেকে চলো দাদা, এখানে থাকা যায় না।

প্রফুল্লও সায় দেয়,—যাবো, তাই যাবো।

অন্ধকারে জানলার বাইরে দুটো চোখ জ্বলছে। বিন্দী বাড়িউলি জানতো ওরা পালাতেই চাইবে এখান থেকে। ওরা কোনমতেই থাকতে চাইবে না এখানে।

তাই অন্ধকারে গুপী লোহারকে এইখানে নজর রাখতে বলে গেছে, যাতে ওরা পালাতে না পারে।

বুলডগের মত হিংস্র সেই জানোয়ারটা চেয়ে আছে ওদের দিকে। কান পেতে শুনছে কথাগুলো। কঠিন হয়ে ওঠে ওর শক্ত চোয়ালটা। দুটো চোখ অন্ধকারে জ্বলছে।

গুপী লোহার ওদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। কান খাড়া করে শুনছে ওদের কথাগুলো। তাদের জগৎ থেকে কারোও মুক্তি নেই; একথাটা ওই বেকুব লোকটা আর ওই মেয়েটা জানে না।

অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গুপী লোহার জাগ্রত প্রহরীর মত।

এতদিনের চেষ্টায় গড়ে-ওঠা সেই সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। দীর্ঘ দুশো বছর ধরে চলে আসা জমিদারী-প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেল এক কলমের খোঁচায়।

ধ্বসে পড়লো কত বিরাট প্রাসাদের স্তূপ। শূন্য হয়ে গেল কত বিরাট বাড়িগুলো। প্রচণ্ড ঝড়ে উপড়ে-পড়া বনস্পতির সব সবুজ ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তার উত্তাপে শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। এতকাল ধরে ওই মহীরুহের শাখায় বাসা বেঁধে ছিল কত পাখপাখালির দল নিশ্চিন্ত মনে; তারাও উড়ে গেছে কলরব করে।

আজ বসন্তনারায়ণের প্রাসাদের অবস্থাও তেমনি।

অন্দরে-বাইরে সেই অসীম নিঃস্বতা আর শূন্যতা জাগে। সুমিতা, এ-বাড়ির বৌকে তারা পথে বের করে দিয়েছে। আর তার কোন খবরই জানে না তারা। নেবার প্রয়োজনও বোধ করেনি।

বাইরের মহলেও লোকজন কমে এসেছে। এতকাল ধরে আমলা—মুহুরী—তহশীলদার—দারোয়ান অনেকেই ছিল। আজ তাদের কোন প্রয়োজন

নেই এখানে। মাইনে দেবার সামর্থ্যও নেই বসন্তনারায়ণের। তাই তাদের জবাব দেওয়া হল।

ওরা প্রণাম করছে বসন্তনারায়ণকে। আর ওরা কোনদিনই আসবে না।

দেউড়িতেও কেউ রইল না। আলোও জলবে না আর ফটকে। সেই ঘরগুলো ফাঁকা হয়ে গেল। মেরামত অভাবে এইবার সেগুলো ধ্বসে পড়বে।

উদয় ওই শূন্য দেউড়ি, জনশূন্য ওই কাছারিবাড়ির দিকে চেয়ে থাকে। ওখানে আজ আঁধার নেমেছে।

দু-একজন যারা টিকে আছে তারাও এই বিরাট শূন্যতার মাঝে হারিয়ে গেছে।

উদয়ের সামনে তার অতীত-জীবনের ভুলগুলো আজ প্রকট হয়ে ওঠে। বহু টাকা-পয়সা সে উড়িয়েছে। নিজের সর্বনাশ করেছে তিলে তিলে। স্মিতার কথাটাও সে ভুলতে চায়।

কিন্তু তার সামনে এ-বাড়ির অপরিসীম দৈন্য আর অভাবের ছবিটা প্রকট হয়ে ওঠে। এখানে আর কিছুই নেই।

উদয় সেই সর্বনাশকেই দেখেছে বার বার। তাই আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে সে।

অন্ধকার নেমেছে। ছায়ামূর্তির মত বাড়িগুলো থমথমে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বসন্তনারায়ণও আজ এই স্তব্ধতার রাজ্যে একা নেমে এসেছেন।

তাঁরই চোখের সামনে এ-বাড়ির সব গৌরব—বৈভব কোন শূন্যতায় মিলিয়ে গেল।

—কে! বসন্তনারায়ণ ওই অন্ধকারে উদয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হন।

দেউড়ির দারোয়ান, চাকর-বাকরদের জবাব দিয়ে দিয়েছেন। সরকার-মশাইও চলে যাচ্ছে।

বলে ওঠে উদয়,—দেউড়িতে বাতিও জলবে না?

হাসেন বসন্তনারায়ণ,—এ-বাড়িতে আর বাতি জলবে না উদয়। অন্য পথ দেখবার চেষ্টা করো। সদরে বাড়িটা কেনা হয়ে গেছে তোমার নামেই। কিছু কাজ-কারবারের চেষ্টা দেখগে সেখানে গিয়ে।

—আপনি?

বসন্তনারায়ণ কি ভাবছেন। বলে ওঠেন,—শূন্য বাড়িতে একা অতীত গৌরবের পাহারাদারি করব। এছাড়া আর পথ কি!

এ-বাড়ির সব গৌরব—আনন্দের দিন ফুরিয়ে আসছে। কাছারিবাড়ির বড় বড় দরজাগুলো বন্ধ করে তালা দিয়ে গেছে চাকররা। এ-বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

বিষ্টু সরকারও যাবার আগে প্রণাম করতে এসেছে। ওকে দেখে অবাক হন বসন্তনারায়ণ,—সরকার, তোমাকে তো শহরে থাকতে হবে। ওখানে একটা কারবার করছে উদয়বাবু।

সরকার জোড়হাত করে বলে,—বয়স হয়েছে, এতদিন সেবা করলাম, এইবার ছুটি দেন হুজুর। আমি আর কাজ করব না।

বুড়ো বিষ্টু সরকারের গলার স্বর আজ অন্যরকম। একটু তেজদৃপ্ত কাঠিন্য ফুটে ওঠে তাতে। বসন্তনারায়ণ অবাক হন।

ওই লোকটিকে উদয় সহ্য করতে পারে না। তবু বাবার কথায় চুপ করে ছিল। ও রাজী না হতে উদয় মনে মনে খুশিই হয়েছে। সেই খুশির আভাষ তার কথার সুরে ফুটে ওঠে।

উদয় বলে,—উনি না থাকলেও চলে যাবে বাবা। গিরিধারীকে বলেছি; ও সব বোঝে। চালিয়ে নিতে পারবে।

বসন্তনারায়ণ ওর দিকে চাইলেন। কি ভেবে সরকারমশাইয়ের হাতে তুলে দিতে যান কিছু টাকা।

বিষ্টু সরকার টাকাটা দেখে অবাক হয়ে শুধোয়,—এটা?

হাসেন বসন্তবাবু,—বাড়তি কিছু দিলাম হে।

মাথা নাড়ে সরকার। বলে ওঠে,—মাপ করবেন হুজুর। যেদিন দেখলাম এ-বাড়ির লক্ষ্মীকে সবচেয়ে বড় কলঙ্ক দিয়ে দূর করে দিলেন, সেইদিন থেকেই মনে মনে দিব্যি করেছিলাম এখানে আর নয়। এখানকার অন্ন গ্রহণ করব না। আজ তাই চলে যাচ্ছি খুশিমনেই। এটাও নোব না তাই।

—সরকার! গর্জে ওঠেন বসন্তবাবু,—দারোয়ান! শ্যামা সিং!

হাসে সরকার,—ওরা আগেই চলে গেছে হুজুর। প্রণাম হই!

বুড়ো সরকার ওঁর মুখে যেন চড় কষে বের হয়ে গেল। কথা বলেন না বসন্তনারায়ণ। টাকাগুলো পড়ে রইল। উদয়ই পকেটে পুরে নিল টাকা ক'টা। বসন্তনারায়ণ ওদিকে নজর দেন না আজ।

বসন্তনারায়ণ ছেলেকে হুকুম করে যান,—নায়েবমশাইকে একবার বাড়ির মধ্যে আমার কাছে যেতে বলো উদয়। তুমিও শহরে যাবার আয়োজন করো।

বসন্তনারায়ণ অনেক চেষ্টা করে শহরের এই বাড়িটা কিনেছিল জমিদারী চলে যাবার মুখে। বার বার এই সময় মনে হয়েছিল কারবারী বন্ধু সতীশবাবুর কথা। তার মেয়ের সঙ্গে উদয়ের বিয়ে দিলে আজ শহরেই তার কারবার গড়ে উঠত।

কিন্তু সে-সব আশা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তবু হাল ছাড়েননি তিনি। তাই শহরে এই বাড়িটা আর লাগোয়া কিছু ফাঁকা জমিও কিনেছেন।

উদয়কে তিনিই রাজী করিয়ে পাঠিয়েছেন এখানে থেকে কোন ছোট-খাটো কারবার চালাতে। ব্যবসা ছাড়া আর তাঁদের টিকে থাকার কোন পথ নেই।

কথাটা উদয়ও ভেবে দেখেছে। তাকে জীবনে এইবার প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অনেক ভুল করেছে। আর নয়।

গিরিধারীও এসেছে ওর সঙ্গে গ্রাম থেকে। এতকাল গিরিধারীই ছিল উদয়ের পার্শ্বচর, তার বাজনার একমাত্র সমঝদার। শয়তান প্রকৃতির লোকটা শহরে এসে দুদিনেই এখানকার সেই অন্ধকার জগতের পথ খুঁজে বের করে।

উদয়ের হাতে তখন বেশ কিছু টাকা-পয়সা রয়েছে। মনের অতলে সেই নেশার ব্যাকুলতা। জীবনের একটা নিদারুণ ব্যর্থতা তাকে ধীরে ধীরে উন্মাদ করে তুলেছে। রক্তের সেই মাতনটাকে ভুলতে পারে না সে। প্রাণপণে চেষ্টা করেছে নিজেকে সামলাবার। গিরিধারীই বলে,—শহরে এসেছেন, এখানের জগৎটাকে চিনে নিন। তারপর কাজ-কারবার পুরোদমে সুরু করা যাবে। কি বলেন?

উদয় ওর সব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। কিন্তু সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা উদয়ের সারা মনকে কি ব্যাকুল জ্বালায় কুরে কুরে খাচ্ছে।

তাই একদিন সেই পথেই সে পা বাড়ায়। গিরিধারীই বলে,—এই তো বেঁচে থাকার লক্ষণ গুরু! নাহলে কি রকম যেন ভট্চাজ্ পণ্ডিত হয়ে যাচ্ছিলেন। কি লাভ তাতে?

উদয় ধীরে ধীরে তার হারানো সেই দিনগুলোকে যেন ফিরে পাচ্ছে। কি হবে মিথ্যা কারবার, ব্যবসা-পত্র করে খেটে খেটে?

তার চেয়ে দিনগুলোকে হাল্কা হাওয়ায় রঙীন ফানুসের মত উড়িয়ে দেবে। এই করেই সে খুশি হবে। এছাড়া তার আর করার কিছুই নেই।

শহরের নতুন রঙ-চঙের জীবন। উদয় অনেকদিন পর আবার আগেকার

সেই উদ্দাম জীবনটাকে খুঁজে পায়। পেয়ে যেন বেঁচেছে সে। মেতে উঠেছে আবার।

সন্ধ্যার পরই বের হয়েছে তারা দুজনে। গিরিধারীর-এসব পাড়া চেনা। ছোটবাবুকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে।

—কোথায় যাচ্ছি গিরি?

গিরিধারী হাসে,—শহরেই এবার থাকতে হবে আজ্ঞে! চিনুন, বুঝুন শহরটাকে!

উদয়ের দুচোখে গোলাপী নেশার আমেজ। আগেকার সেই বুভুক্ষু মনটা কেমন জেগে উঠেছে।

গিরিধারী তাকে ভাল জায়গাতেই এনেছে। বিন্দী বাড়িউলির ওখানে শহরের অনেক গণ্যমান্য লোকই আসে। গিরিধারী উদয়কেও এনেছে এখানে।

গিরিধারীই খবরটা দেয় বিন্দীকে আড়ালে,—বুঝলে মাসি, এ একজন রাজার ছেলে। হাতে কাঁচা পয়সা বেশ কিছু আছে। জমিদারী চলে গেছে। বেশ নগদ কিছু পেয়েছে, ব্যবসা করবে।

বিন্দী হাসে,—ব্যবসা করবে? কিসের ব্যবসা র‍্যা?

গিরিধারী বলে ওঠে,—হেসো না মাসি। বেশ ভালো পয়সা-কড়ি দেবে। বেচারার বৌ-টৌ নেই। মন খারাপ হয় মাঝে মাঝে, তাই নিয়ে এলাম। দেখে-শুনে একটা ব্যবস্থা কর দিকি যাতে বেচারার মনটা ঠাণ্ডা হয়!

বিন্দীর এমনি দালালও অনেক জুটে যায়। বিন্দী অবশ্য তাদের আপ্যায়ন করতে জানে। তাই বলে বিন্দী,—বেশ করেছিস বাবা!

হাসে বিন্দী। মনে মনে কি ভাবছে। সেই নতুন ভাড়াটে মেয়েটির কথা মনে পড়ে। ওকে এ-পথে নামাতেই হবে। নতুন বাবুর দিকে চেয়ে থাকে বিন্দী।

বলে ওঠে,—ব্যবস্থা হবে, তা বাছা, রাজার ছেলেকে কিছু খরচ করতে হবে। তবে হ্যাঁ—ঠকবেন না। কিন্তু!

উদয় ঝিম মেরে বসেছিল। বলে ওঠে,—খরচ! এমন কত খরচ হয়েছে বাগানবাড়িতে। ওকে বলে দে গিয়ে, উদয়নারায়ণকে যেন খরচের ভয় না দেখায়!

উদয় পকেট থেকে নেশার ঘোরে কতকগুলো দলামোচা পাকানো নোট বের করে দেয়। ছিটিয়ে পড়ে দু-একটা। সেদিকে নজর নেই ওর।

ওর কাণ্ড দেখে একটু অবাক হয় বিন্দী। শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। হাঁক পাড়ে,—ওরে ও গুপী, বাবাকে এক কোয়ার্টার ফাউল এনে দে। আর বিলিতি কিছু আছে তো আন।

গিরিধারী যুৎ করে বসল এবার। উদয়য়ের দুর্বলতম ঠাঁই-এ ঘা দিয়েছে বিন্দী।

বিন্দী বলে চলেছে,—হবে বাবা। মনের দুঃখ একদিন দূর হবে। আহাঃ!

উদয় কয়েকদিনেই বেশ এলেমদার হয়ে উঠেছে। ব্যবসার নামে গিরিধারীও দফায় দফায় টাকা নিচ্ছে। ওদিকে কলসির জল গড়িয়েই চলেছে উদয়। ক-মাসেই সে আবার আগেকার মতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই ওই বিন্দী বাড়িউলির খপ্পরেও পড়েছে। হাওয়ায় টাকা উড়ছে তার চারিপাশে।

বিন্দী আশা দিয়েছে,—টাকাও আর কিছু চাই বাছা। এমনিতে রাজী হচ্ছে না। এ-পথে নতুন কিনা!

উদয় জানিয়ে দেয়,—ঠিক হ্যায়। ওর জন্যে পরোয়া নেই।

জমানো টাকা প্রায় ফুরিয়ে আসছে। বুদ্ধিটা দেয় গিরিধারীই,—ব্যবসাতে নামলেই টাকা আসবে। ওর জন্য ভাবনা নেই উদয়বাবু!

—তা তো বুঝলাম, এখন কোথায় পাই টাকা?

গিরিধারী বলে ওঠে,—সে ব্যবস্থা করে এসেছি। বাড়িটাই বন্ধক দিয়ে দিন। মাস কয়েকের ব্যাপার, তারপর টাকা তো আসছেই ব্যবসা থেকে। তখন ছাড়িয়ে নেবেন। এখন বিন্দীর কাছে ইজ্জত রাখুন।

উদয় কথাটা ভাবছে। তার রক্তে মাতন এসেছে আবার। আগেকার সেই দিনগুলো তার মনে ঝড় তোলে। বাগানবাড়িতে গানের মাইফেল বসতো। মদ আর নারীর নেশা তার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে একটা কঠিন দুরারোগ্য রোগের মতই।

তাই একে এড়াতে পারে না সে। আজ সব যেতে বসেছে। তবু ওই নেশাটাকে ভুলতে পারেনি। যা টাকা-পয়সা এনেছিল ব্যবসা করবার জন্য তার প্রায় সবই চলে গেছে ইতিমধ্যে। এবার গিরিধারীই টাকার যোগাড় করেছে।

মাধোলাল সাহুকেই ধরেছে সে।

মাধোলালের কাঠের গোলার পাশেই ওদের জায়গাটা, ওই বাড়িখানা।

মাধোলালও মনে মনে উৎসুক হয়ে উঠেছে। অন্য কেউ কিনলে বড় রাস্তার উপর আবার কারবার ফেঁদে বসবে। সব দিক দিয়েই ক্ষতি হবে তার। তাই মাধোলালই বাড়িখানার জন্য দর দিয়েছে। অবশ্য এই বিকিকিনির ব্যাপারে গিরিধারীরও বেশ কিছু হাতে আসবে। তাই গিরিধারীই বলে উদয়কে,—কি হবে এসব বাড়ি-ফাড়ি দিয়ে? বন্ধক দিয়ে টাকাটা নিন, তারপর ওই টাকাই ব্যবসাতে খাটিয়ে আবার বাড়ি ছাড়িয়ে নিতে কতক্ষণ?

উদয় কথাটা মনে মনে ভাবছে।

মাধোলাল জানে সুঁচ হয়ে ঢুকে সে ফাল হয়ে বের হবে। তাই আপাতত বন্ধক নিতেই রাজী হয় সে।

উদয় টাকাগুলো হাতে পেয়ে জোর পায়। বাবাকে এসব খবর জানাতেও চায় না। টাকা দেখেই তার নীল রক্তে আবার মাতন জাগে।

বিন্দীও চিনেছে উদয়কে। ও যে পয়সাওয়ালা জমিদার-নন্দন সেটা শুনেছে। তাই শুষছে সে-ও। মান-খাতিরও করে সে গেলে।

উদয়ের হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে বিন্দী বলে,—বসো বাছা! তোমার কথাই ভাবছিলাম। ক-দিন দেখিনি!

গিরিধারী জবাব দেয়,—আর আসার মুখ তুমি রেখেছো মাসি? কেবল টাকাই নিচ্ছো এন্তার এটা-সেটা বলে।

বিন্দী ওদের সামনে গরম কাটলেট আর দু-বোতল মদ আনিয়ে দেয়। —খাও বাছা। হবে, তোমার কথা মনে আছে আমার।

উদয়ের পেটে দ্রব্য পড়েছে। সে জড়িত কণ্ঠে শোনায়,—ডানাকাটা পরী তোমার কদ্দিনে জোটে তাই দেখছি। ভয়ানক খেলাচ্ছো কিন্তু!

বিন্দীও কথাটা ভেবেছে। ও-বাড়ির সেই নতুন মেয়েটাকে কোনমতেই খাতে আনতে পারছে না। মেয়েটার মনে কোথায় একটা জোর আছে, তেজ আছে। বিন্দী ভেবেছিল দিনকতক পরই মেয়েটা বদলাবে। লোভও দেখিয়েছিল, পয়সার লোভ। কিন্তু তাকে পথে আনতে পারেনি।

অভাব-দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে। ওর সহোদর সেই ভাই না কে—তারও কোন কাজকম্মো হয়নি। বিন্দী অবশ্য মনে মনে খুশি হয়েছে। এমনি অভাব কষ্টের জ্বালায় তিলে তিলে সেই উত্তাপ গলবে।

সুমিতা দেখেছে চোখের সামনে অন্তহীন এই দুর্দশা বেড়েই চলেছে। একবেলা না খেয়েও দিন কাটে মাঝে মাঝে। দাদার যে কোন কাজকম্মোও হবার আশা নেই এটাও জেনেছে সে। এমনি করে ধুঁকে ধুঁকে ফুরিয়ে যাবে তারা।

সুমিতার সামনে কোন পথ আর নেই।

তবু ওই বিন্দী বাড়িউলিকে দেখেই জ্বলে ওঠে সে। বিন্দীও জানে ওদের অবস্থার কথা। ইতিমধ্যে ক-মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। দেবার সঙ্গতি নেই।

বিন্দী অবশ্য এ নিয়ে তাগাদা করেনি। আজও বলে,—একাই বসে আছো বাছা! তোমাকেও বলি—এই তো সাধ-আহ্লাদ করার বয়েস। টাকা-পয়সার মুখও দেখবে না—এমনি করে দাঁতে দাঁত চেপে উপোস দেবে সেটা কি ভালো?

সুমিতা জবাব দিল না।

মনে মনে সরে যাবার কথা ভাবছে সে। দাদার ওপরই রাগ হয়। যেভাবে হোক এখান থেকে চলে যাবে তারা।

বিন্দী নরম গলায় আবেগ মাখানো সুরে শুধোয়,—তোমার সেই দাদাটিকে দেখছি না?

—বাইরে গেছে।

—অ! তাই বলছিলাম বাছা, একালে কাউকে বিশ্বাস করো না। বিশেষ করে ছেলেদের। কতো আদর করবে, একথা-সেকথা বলবে। কিন্তু বাছা, দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁই। তারপর দুদিনেই রঙ মুছে গেলে ফেলে পালাবে। দাদাই বলো আর বন্ধুই বলো, স্বোয়ামীই বলো, সব মুখপোড়ারাই সমান।

সুমিতার সারা মনে দুর্বার অসহ্য একটা জ্বালা ফুটে ওঠে। তবু বাঁচতেই হবে তাকে এই নরক থেকে।

বিন্দী ভাবে তার কথাগুলো বোধহয় শুনছে মেয়েটা। কাজ হবে এইবার। তাই বিন্দী আর এক মাত্রা চড়িয়ে বলে,—ওই শাঁখা-সিন্দুরের কি দাম বাছা? এত কষ্ট করতে হবে না। রাজার হালে থাকবি।

সুমিতা গর্জে ওঠে,—থামবেন আপনি? রোজ রোজ এসে জ্বালাতন করেন কেন?

বিন্দীর মুখ-চোখ কঠিন হয়ে ওঠে। ও বুঝেছে তার আবেদন-নিবেদন সব মিথ্যে হয়ে গেছে। বিন্দী জেনেছে সোজাপথে কাজ উদ্ধার হবে না।

তাই এবার চাপই দেবে সে। জোর করেই তার কাজ উদ্ধার করতে হবে।

বিন্দী চড়া গলায় বলে,—তিন মাসের ভাড়াটা মিটিয়ে দাও বাছা, চলে যাই। খামোখাই আমিও কি আসতে চাই এখানে?

সুমিতার সেই সাধ্য নেই। তাই চুপ করেই থাকে।

বিন্দী একটু নরম গলায় শোনায়,—তাই বলছিলাম তোমার ভালোর জন্যই। ওসব দাদা-টাদা ছাড়ো। এক পয়সা রোজগারের যার মুরোদ নেই তার সঙ্গে সম্বন্ধ কি বাছা? তোমাকে তো বাঁচতে হবে! তাই কথাটা বলছিলাম—টাকাকড়ি, গয়না, ভালো বাড়ি—

সুমিতার অপমানে দুচোখে বেদনায় ছায়া জমে। তার কাছে ওই মেয়েটা আজ বাড়ি—গয়নার কথা বলছে। ও জানে না তার কি ছিল।

আজ তাই সে-সব কিছুর ওপর তার ঘৃণা এসেছে, নিদারুণ ঘৃণা! সুমিতার সব হারিয়ে গেল।

বিন্দী তখনও বলে চলেছে,—তাহলে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিই! রাজার ছেলে, রাজরাণী হয়ে থাকবি।

সুমিতার সারা জীবন ওই স্বপ্ন দেখে ব্যর্থ হয়েছে। আজ ও-কথা শুনে সে কঠিন স্বরে বলে,—আপনাকে যেতে বলেছি অনেক আগেই। যান আপনি। যান—

বিন্দী চমকে ওঠে ওর কঠিন কণ্ঠস্বরে। বের হয়ে এল সে নীরব রাগে ফুলতে ফুলতে। ওই মেয়েটার সাহস দেখে অবাক হয়েছে সে। বিন্দীকে সে ভয় করে না।

দাদার ওপর এখনও তার আশা-ভরসা আছে। সেইটাই এবার চুকিয়ে দেবে বিন্দী দরকার হলে।

অন্ধকারে গুপী লোহার বিন্দীকে ও-বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে দেখে দাঁড়ালো সামনে।

—হলো কিছু?

বিন্দীর কালো মুখখানা তামাটে হয়ে ওঠে। মাথা নাড়ে সে,—না! বড় তেজ ছুঁড়ির। দাদাটা যত নষ্টের গোড়া, বুঝলি?

গুপী এসব কিছু বেশ তাড়াতাড়িই বোঝে। তাই ঘাড় নাড়ে সে। বেশ সহজভাবেই বলে,—এ আর বেশি কথা কি? বলো তো দাদাটাকেই—

গুপী কম কথার মানুষ। অনেক সাংঘাতিক কাজের কথা সে ইশারাতেই জানায়। এক্ষেত্রেও দাদার সম্বন্ধে সেটা জানিয়ে দিল।

বিন্দী কি ভাবছে। অনেক দিন ঝুলে আছে, আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করা দরকার।

রাত হয়েছে। এ-পাড়ার গলির মধ্যে থমথমে আঁধার নেমেছে। প্রফুল্ল ফিরছে বাড়ির দিকে। কোথাও কোনরকম পথই সে পায়নি। ভাবছে গ্রামেই ফিরে যাবে তারা। তবু সেখানে গিয়ে কোনরকমে বাঁচার চেষ্টা করা যাবে। দীনু মুখুজ্যেকে ধরে বাড়িটা ফিরিয়ে নেবে।

তারা তবু মানুষ। এখানের এই ইঁঠ-কাঠের রাজ্যের মানুষগুলোর মত হৃদয়হীন নয়।

আকাশে মেঘ জমেছে। বর্ষাকাল।

গঙ্গার জলধারার বুকে এসেছে পূর্ণতার আবেগ। বড় রাস্তার ধার অবধি জল এসে গেছে। আবছা অন্ধকারে রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। ঝিম ঝিম বৃষ্টি নেমেছে।

লোকজন বিশেষ নেই। এই বৃষ্টির রাতে একাই ফিরছে প্রফুল্ল।

বড় রাস্তা ছেড়ে এদিকের প্রায়ান্ধকার গলিটার মধ্যে ঢুকল। এখানে জলো হাওয়ার ঝাপট কিছুটা কম। তবু ভিজে গেছে। ঠাণ্ডা লাগছে। শিরশিরে ঠাণ্ডা।

গুপী লোহার ওর পথ চেয়েই এই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। প্রফুল্লকে ফিরতে দেখে এগিয়ে যায়।

প্রফুল্লর হাতে একটা বাজারের থলিতে কিছু চাল, শাক-সব্জী। ক্লান্ত হয়ে ফিরছে সে। গুপী হঠাৎ ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসে,—দাদা যে!

প্রফুল্ল দাঁড়াল। গুপী বলে ওঠে,—ভালো চিজটাকে উড়িয়ে এনেছো মাইরী! মজা লুটেছো। আর কেন, বিদেয় হও দাদা ওকে ফেলে। সবাই এমন করে। বরং—

গুপী ট্যাঁক থেকে টাকা বের করে দিয়ে বলে,—নিয়ে-থুয়ে কেটে পড় দিকিন! টাকাটা ধরো।

প্রফুল্ল গর্জে ওঠে,—কি বলছ যা তা?

গুপী অবাক হয়,—যাঃ বাব্বাঃ! দর বাড়িয়ো না দাদা। বরং নাও,

পুরোপুরি নিয়ে যাও। একশো টাকাই দিলাম। মুখ বুজে সরে পড়ো দেখি।

চটে ওঠে প্রফুল্ল। রাগে ফেটে পড়ে সে।

প্রফুল্ল ওর গালে একটা চড় মারে। অতর্কিতে চড় খেয়ে গুপী একটু হকচকিয়ে যায়। নিমেষের মধ্যেই গুপী কি ভেবে থেমে গেল। রাগে ফুলছে সে।

প্রফুল্ল বলে,—মায়ের পেটের বোন। তার সম্বন্ধে এইসব কথা!

হাসে গুপী,—আরে বাবা, টাকার থেকে বড় কিছু নেই। রেখে দাও বোন-ফোন—

—খবরদার!

গুপী হঠাৎ প্রফুল্লকে তুলে ধরে ছুঁড়ে দিয়ে বলে,—বেশি বাড়াবাড়ি করো না।

গুপী লোহারের চোখ দুটো জ্বলছে।

প্রফুল্লর কপালটা কেটে গেছে। ছিটিয়ে পড়েছে তরকারীগুলো। গুপী গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রফুল্ল চলে গেল। গুপী তখন গজরাচ্ছে।—দোব একদিন শেষ করে। গুপীকে চেনো না!

প্রফুল্ল টের পেয়েছে ওদের মতলব। তাকে ওরা সহ্য করবে না। রাতের অন্ধকারে বৃষ্টি নেমেছে। হাওয়া হাঁকে শন্‌শন্‌ শব্দে। জনমানব নেই রাস্তায়।

সুমিতা দরজা খুলে প্রফুল্লকে ওই অবস্থায় দেখে চমকে ওঠে।

—কি হলো? রক্ত পড়ছে যে! একি চেহারা করে এসেছ?

প্রফুল্ল বলে,—এখান থেকে চলে যাবো সুমি। জায়গাটা ভালো নয়।

—তাই চলো দাদা। সুমিতা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে,—এখুনিই চলো। রাতের ট্রেনেই চলে যাবো আমরা।

প্রফুল্লও ভাবছে সেই কথা।

আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। বর্ষার ঘন কালো মেঘ। রাতের আঁধার ঘনতর হয়ে উঠেছে। বাতাসে জাগে ঝড়ো হাওয়ার সাড়া। মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে। এরই মাঝে দুটি অসহায় মানুষ মুক্তির পথ খোঁজে।

বলে প্রফুল্ল,—আজ রাতেই চলে যাবো।

—তারপর?

স্মিতার সারা দেহে আগামী মাতৃত্বের ছায়া নামছে। কতদিন স্বপ্ন দেখেছিল স্মিতা তার কোলে আসবে সন্তান। তাদের বড়-বাড়ির সেই ...তা নবজাতকের আনন্দ-কলরবে ভরে উঠবে।

কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল সেই দিনগুলো! কি ঘৃণ্য নরকের মাঝে এসে ...ড়েছে সে কল্পনাও করতে পারে না।

বাতাসে মত্তপ জড়িত কণ্ঠের সুর ওঠে। কে যেন গান গাইছে। কোন ...য়ের গানের সুর। ঘুঙুরের শব্দ কানে আসে।

স্মিতা আর্তকণ্ঠে বলে,—তাই চলো যেখানে হোক। এখানে থাকলে ...মি মরে যাবো।

প্রফুল্লও তাই ভাবছে। সামান্য জিনিসগুলো গুছিয়ে নিতে থাকে ওরা।

উদয় আর দেরি করতে রাজী নয়। বিন্দীর কাছে আজও এসেছে। ...ন্দীও ভেবেছে কথাটা।

আজ এমনি রাতে ভাইটাকে সরিয়ে আনতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হবে। ...ভাব আর দারিদ্র্যের চাপে মেয়েটা মাথা নিচু করবেই। সবাই করে। ...থম পা হড়কানোটাই কঠিন। একবার পা পিছলে এ-পথে এলে আর কারোও ...রার পথ থাকে না। ফেরে না কোনদিনই, সব পথ বন্ধ হয়ে যায় তাদের।

বিন্দী বলে উদয়কে,—হবে বাবা। আজই না হয় একবার দেখে-শুনে ...লাপ করে আসবে।

—ব্যস্! উদয় তোড়জোড় করে বোতল নিয়ে বসল।

বাইরে আবার বৃষ্টি নেমেছে। অন্ধকার রাত।

প্রফুল্ল বের হয়েছে পথে, জনহীন নির্জন পথ। আলোগুলো নিভে গেছে। ...কটা গাড়ি কোনরকমে পেলেই চলে যাবে তারা।

চলেছে সে আঁধারেই। এমনি সময় অতর্কিতে কে লাফ দিয়ে আঁধার ...ুঁড়ে এসে ওর কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে। গুপী গর্জায়,—শালার উড়ে যাবার ...তলব! গাড়ি ডাকতে যাওয়া হচ্ছে? ওড়াচ্ছি শালাকে। গুপীর হাত ...থকে আজ অবধি কেউ উড়তে পারেনি।

কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে ওরা। প্রফুল্ল প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। একবার আঁধার ফুঁড়ে চিৎকার করে ওঠে প্রফুল্ল। ওই ঝড়ের রাতে বৃষ্টির শব্দে ওর কাতর আর্তনাদ ধ্বনিত হয়।

—স্মিতা!...স্মিতা—পালা তুই। যেখানে পারিস্ পালিয়ে যা!

—চোপ বে! গুপীর কঠিন হাত দুটো ওর কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে। প্রফুল্ল নিজেকে প্রাণপণে মুক্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তার বন্ধ হয়ে আসছে।

সে বেশ বুঝেছে সুমিতার সর্বনাশ করার জন্য ওরা তাকে শেষ করে দে নিজের জন্য নয়, সুমিতার জন্য সে চিৎকার করে চলেছে।

প্রফুল্ল ব্যাকুল চিৎকারে সারা আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তোলে। কোন না দেখে গুপী কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে; হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় প্রফুল্লর প্রচে গুপীর হাতেই নেতিয়ে পড়েছে ওর প্রাণহীন দেহ। চোখ দুটো বের এসেছে।

—ওস্তাদ! ওর সাকরেদ বলে,—খতম করে দিলে ওস্তাদ?

গুপী চমকে ওঠে। ওর প্রাণহীন দেহটা অন্ধকারে ওই বৃষ্টির মধ্যে রইল। এরা চকিতের মধ্যে আঁধারে মিলিয়ে যায়।

চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে সুমিতা। আঁধারে শো ওদের পায়ের শব্দ। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে সুমিতা। বেশ বুঝেছে কি উদ্দে ওরা প্রফুল্লর কণ্ঠরোধ করেছে।

—দাদা!—হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে সুমিতা।

প্রফুল্লর প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে রাস্তায়। আমরণ সে বাঁচার করে গেছে, বাঁচাতে চেয়েছিল সুমিতাকে। তাই ওরা তাকে হত্যা করেছে

চমকে ওঠে সুমিতা! কোথায় যাবে জানে না। একমাত্র যে আ জন ছিল তাকেও ওরা শেষ করে দিয়েছে। এইবার তিলে তিলে শেষ ক ওকে। সে অপমৃত্যু কত বেদনার জানে সুমিতা।...এর চেয়ে নিজেকেই করা ভাল।

অন্ধকারে কাদের পায়ের শব্দ ওঠে। কোন নিষ্ঠুর দৈত্যের দল এগি আসছে তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিতে। ভয়ে-আতঙ্কে বিবর্ণ আশাহীন এ নারী আঁধারে দৌড়চ্ছে—পালাচ্ছে এখান থেকে।

আর কোথাও যাবার ঠাঁই তার নেই। ছায়ামূর্তিগুলো আঁধারে এগি আসে। পেছনে পেছনে কারা তাকে তাড়া করে আসছে।

সুমিতা দৌড়চ্ছে ভয়ে। এভাবে অপমৃত্যু ঘটার চেয়ে সে নিজেকেই করবে। তবু ওদের হাতে ধরা দেবে না।

উদয়কে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে বিন্দী। সব শূন্য। কেউ কোথাও নেই। বিন্দী
কে ওঠে। এতদিন ধরে মেয়েটাকে আটকে রেখেছিল—আজ সে নেই।

—গুপে, পালাল মেয়েটা ?

—মানে! গুপে অবাক হয়। ভেবেছিল পথের কাঁটা সাফ করে দিয়েছে,
বার কিসের ভয়! কিন্তু পাখিই উড়ে গেছে। গুপে তখুনিই ডালকুত্তার
, ছুটল তার সন্ধানে দল-বল নিয়ে। কে বাইরের লাশটাকে গায়েব করতে
.।

উদয় বলে ওঠে,—সব উড়ে গেল মাসি? শালার বরাতই এমনি! সবই
ং-ধাঃ হয়ে যাবে। দু-বোতল মাল আন দিকি, না, তাও উবে গেছে?

বিন্দী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাগে গজরাচ্ছে সে। এমনি একটা
কার হাতছাড়া হয়ে যাবে কল্পনাও করেনি সে।

গুপী আঁধারে দৌড়চ্ছে। চারিদিকে খুঁজছে সেই মেয়েটাকে।

প্রাণভয়ে পালাচ্ছে সুমিতা। গলি থেকে বের হয়ে বড়রাস্তায় পড়েছে;
ন্তু কোথায় কোনদিকে যাবে জানে না সে। দু-একটা আলো জ্বলছিল,
গুলোও বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গেছে।

বাতাসে ওঠে বর্ষার জলে-ভরা গঙ্গার ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনি। রাস্তার ওদিকেই
.ার জল উঠে এসেছে। অন্ধকারে চকচক করছে সেই জলের বিস্তার।
ছনে তার তাড়া করেছে ওই জানোয়ারের দল, ওদের হাতে রক্তের দাগ।
মিতাকে তারা ধরে নিয়ে যাবে ওই নরকে।

সামনে তার ওই মুক্তির আশ্বাস। গঙ্গার জলধারার সামনে এসে দাঁড়াল।
াদ জলধারা আবর্তের সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে। অন্ধকারে বিরাট নদীর
চকে বুক প্রশান্তিময় মহাশূন্যের মতই দেখায়। বাতাসে ওঠে নদীর ক্রুদ্ধ
নিধ্বনি।

সুমিতা এসে দাঁড়িয়েছে ওই নদীর ধারে। একদিকে তার পরিত্যক্ত
.কার নরক, ভীতিময় জীবন, অন্যদিকে ওই উদ্বেল গঙ্গার অতল গহনে
াান্ত মৃত্যুর হিম-শীতলতা। মনে হয় এ-ই তার কাছে বরণীয়।

নিজের কোন পথ আজ নেই, পথ নেই যে আসছে তাকে বাঁচাবার;
.বড় পৃথিবী শুধু নিষ্ঠুর কাঠিন্য আর শ্বাপদ-লালসায় ভরা। এখানে বাঁচার
ন আশ্বাস নেই। তার সন্তানকেও বাঁচাতে পারবে না। তাই সব শেষ
র দেবে সে।

ওই অতল জলরাশির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সুমিতা। জীবনের আর বিন্দুমাত্র মায়া তার নেই। এতক্ষণ মনকে বুঝিয়েছিল। দাদাও নেই তার সব গেছে। মরার পথটাই খোলা আছে মাত্র। এগিয়ে যায় ওই জলের দিকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে সুমিতা! একটা গাড়ির হেড-লাইট এসে পড়েছে ও মুখে। গাড়িটা পাশে এসে থেমে গেল সশব্দে।

সুমিতা ভাবছে। সময় নেই, এগিয়ে যায় গঙ্গার ওই জলরাশির দিকে

—দাঁড়াও!

হঠাৎ কার গম্ভীর গলার ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল সুমিতা। আব আলোয় দেখা যায় একটি বয়স্ক লোক, পরনে প্যান্ট-কোট। তাকে ডাকছে গাড়ি থেকে নেমে।

—দাঁড়াও মা!

ওর কণ্ঠস্বরে কি যেন জাদু আছে। সুমিতা থমকে দাঁড়াল। এগিয়ে এ ওকে দেখছেন তিনি মমতাভরা সন্ধানী চোখে। তিনি বুঝতে পেরেছে সুমিতার মনের ভাবটা।

তাই বলেন,—এমনি করে মরতে নেই মা। পৃথিবী থেকে সরে চ যাবে?

সুমিতার আর্ত কণ্ঠস্বর এতক্ষণে ফেটে পড়ে।

—এছাড়া আমার পথ নেই। আমার সব গেছে।

—যায়নি মা। এতবড় পৃথিবীতে কেউ পথ খুঁজে পায়, কেউ পথ হারি পথ খুঁজে ফেরে। তোমার ঠাঁই এখানে নিশ্চয়ই হবে মা। পথ তুমি পাবেই

সুমিতা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ভদ্রলোক ওকে দেখে বলে ওঠেন,—একা নও দেখছি। তবে? তোমা জন্য না হোক, যে আসছে তার জন্য তোমাকে বাঁচতে হবে মা। চলে গাড়িতে ওঠো। কোন ভয় নেই। এ বুড়োকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

সুমিতা ওর দিকে চেয়ে থাকে কান্নাভেজা চোখে। মনে হয় কোথায় একটু আশার সুর শুনছে সে। এতবড় পৃথিবী একেবারে হৃদয়হীন নয় চোখের জল তবু বাধা মানে না। কাঁদছে সে। এটা যেন বিশ্বাসই কর পারে না।

—চলো মা, বৃষ্টিতে ভিজো না।

স্থমিতা ওর পিছু পিছু এসে গাড়িতে উঠল

শূন্য দেউড়ি। সেখানে আজ প্রহরী নেই, ঘণ্টা বাজে না প্রহরে প্রহরে। বাগানটা শুকিয়ে গেছে। একটা গরু ঢুকে ঘাস খাচ্ছে, ফুলগাছ ভাঙছে, বাধা দেবারও কেউ নেই।

বড়বাড়িটার রঙও বিবর্ণ হয়ে গেছে। জানলা-দরজাগুলো সব বন্ধ। বসন্তনারায়ণ আর কাছারিতে বসেন না। নিজের কামরায় পায়চারি করছেন চিন্তিত মনে। মনোরমা ওঁর জন্য ওষুধ এনেছেন।

বসন্তনারায়ণের এখন করার কিছুই নেই। আজ তিনি যেন এ-জগত থেকে বাতিল হয়ে গেছেন।

কাছারির বাড়িগুলো ধ্বসে পড়ছে। মেরামত করার সাধ্য, প্রয়োজন কোনটাই নেই। উদয়ও নেই এখানে। শহরে ব্যবসাপত্র করতে গেছে। কিন্তু কি করবে সে তাও জানেন না তিনি। এ শুধু শ্মশানের ধারে বসে জীবনের শবকৃত্য দেখার মত নির্মম ঔদাসীন্য আর শূন্যতায় ভরা এ-জীবন। স্থমিতার কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। কোথায় রয়েছে সে তাও জানেন না।

বসন্তনারায়ণের চেহারায় বেশ ভাঙন ধরেছে। চুলগুলো সব পেকে গেছে। আগেকার সেই শক্ত কঠিন মানুষটি আজ কেমন নুইয়ে পড়েছেন।

বসন্তনারায়ণ বোনের কথায় জবাব দেন,—আর ওষুধ খেয়ে বেঁচে থাকার শখ আমার নেই মনো। সব গেল। জমিদারী, পত্তনি, বিষয়-আশয় সবকিছু। উদয়কে পাঠালাম শহরে ব্যবসা করতে, সব টাকাকড়ি গেছে। ছিল বাড়িটা, তাও বেহাত হয়ে গেল। তবু ভেবেছিলাম এখানে কোনমতে বাঁচতে পারবো মাথা গুঁজে, কিন্তু সাতপুরুষের এই ভিটেও নাকি চলে যাবে। এসব তখন বুঝিনি মনো; আজ হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। ঘরের লক্ষ্মীই আমার চলে গেছে। তাকে আমিই তাড়িয়েছিলাম।

মনোরমাও কথাটা ভাবেন মাঝে মাঝে। ক-বছর হয়ে গেছে স্থমিতার কোন খোঁজ-খবর আর পাননি তাঁরা। সব একে একে চলে যাচ্ছে এ-বাড়ির। ওসব ভেবে লাভ নেই। তাই মনোরমা বলেন,—ওষুধটা খাও। না হলে বুকের ব্যথা আবার বাড়বে।

—বাড়ুক, বাড়তে বাড়তে একদিন সব ব্যথাটা আমার নিঃশ্বাসটুকু করে দিক। আমি শান্তি পাই মনো। শেষকালে সাতপুরুষের এই হারিয়ে যাবে? বন্ধকের দায়ে এটুকুও চলে যাবে? সব তো গেছে!

মনোরমা বলেন,—আমি নায়েববাবুকে ডেকে পাঠিয়েছি। আসুন, কি বলে শোন। তারপর ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে।

ওষুধটা খান বসন্তনারায়ণ। বেদনাভরা কণ্ঠে বলেন,—সেদিন বুঝি মনো, মাকে আমার দরজা থেকে অপবাদ দিয়ে দূর করে দিলাম। সেই অভিশাপে আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। আমাকেও দূর হতে এ-বাড়ি থেকে। পূর্বপুরুষরা আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করেনি।

নায়েববাবুকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইলেন বসন্তনারায়ণ।

গোবিন্দনায়েব কিন্তু বদলায়নি। তার পরনে আগেকার মতই সেই কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবী। হাতে কতকগুলো কাগজপত্র নিয়েই এসেছে নায়েব।

নমস্কার করে বলে নায়েব,—শুনলাম ক-দিন আপনার শরীরটা ভালো নেই। হ্যাঁ, ওই দলিলের কথা বলেছিলেন, তা, কন্দর্পবাবু আসল তো দিলে না, নকল আনিয়েছি; সেবার লাটের কিস্তির টাকা ছিল না। পুণ্যির খরচ আনতে হয়েছিল। আপনিই তো দলিলে সই করে এই বন্ধকনামা করে দিয়েছেন। এ্যাদ্দিন উনিও কিছু বলেননি। এইবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন।

—মিথ্যা কথা। সবই আপনার কারসাজি। বসন্তনারায়ণ গর্জে ওঠেন।

আজ গোবিন্দনায়েব ভয় পায় না। স্থিরকণ্ঠে বলে—ওসব বলে তো লাভ নেই, আপনার সই আছে, কাগজও তাই বলে।

—জাল দলিল। বসন্তনারায়ণ অসহায়ের মত প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেন।

হাসে নায়েব,—এটা তো আপনার মুখের কথা। সে-ও দেখবেন না হয় তবে কন্দর্পবাবু বললেন, আপনি বেঁচে থাকতে থাকতে এসব দখল তিনি নিতে চান না। তবে ধরুন তামাদির মুখ একটা ডিগ্রী নিয়ে রাখবেন এই মাত্র।

বসন্তনারায়ণ তিক্তকণ্ঠে বলেন,—দয়া করছেন আমাকে?

নায়েব জানায়,—সে যাই বলুন আপনি। ডেকে পাঠিয়েছিলেন খবরটা দিয়ে গেলাম। নমস্কার।

নায়েব বের হয়ে গেল বেশ দাপটের সঙ্গেই।

বসন্তনারায়ণ গর্জাচ্ছেন,—নেমকহারাম, বেইমান, আজ আমারই খেয়ে আমাকেই অপমান করে যাবে ! এতবড় সাহস !

কিন্তু বেশ বুঝেছেন বসন্তনারায়ণ আজ তিনি বিষদাঁত ভাঙ্গা গোখরো। তার ছোবলে কোন বিষ নেই। গর্জনই সার। নায়েব আজ গুছিয়ে নিয়েছে। চাকাটা ঘুরেছে।

তিনি গেছেন অনেক নিচে—উপরে ঠেলে উঠেছে আজ নতুন সমাজ। সেই মানুষগুলো তাঁদের আজ কোন দয়া করবে না। সুযোগ পেলে সব ছিনিয়ে নেবে।

উদয়ও শহরে তার সবকিছু সঞ্চয় প্রায় শেষ করে এনেছে। মাধোলাল সাহু এবার বাড়ির দখল নিয়েছে। উদয় ভেবেছিল বাড়ি-জমি-জায়গা বন্ধক রেখে যা টাকা পাবে তার কিছুটা ফুর্তির পেছনে যাবে, বাকিটা কারবারে খাটিয়ে সব উশুল করে আনবে। কিন্তু টাকাগুলো সবই তার হাত থেকে কেমন কর্পূরের মত উবে যায়।

এতকাল গেছে, এবারও গেল।

ওদিকে বিন্দীর ওখানের খরচাও আছে। গিরিধারীও বেশ টানছে টাকা ..কারবার নামমাত্র হল। মাধোলালই টাকা কিছু দিয়ে বাড়ি-জমি-জায়গা বিক্রী-কবলা করিয়ে নিয়েছে।

উদয় দিনরাত কি যেন নেশার ঘোরেই রয়েছে। মাঝে মাঝে মনে পড়ে ক্ষীণ স্মৃতির মত সেই সুমিতার কথা। আজ সে পাশে থাকলে হয়তো এমনি করে তার সব হারাতো না।

কিন্তু সেই বেদনাদায়ক স্মৃতিটাকে সে ভুলতে চায়। ভোলার জন্যই আকণ্ঠ মদ গেলে। গিলে নেশায় বুঁদ হয়ে সব ভাবনার জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়।

তিলে তিলে নিজেকে কি এক চরম সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে উদয়।

টাকার দরকার। এদিক-ওদিকে বেশ ঋণ জমেছে। তাগাদাও সইতে হচ্ছে। গিরিধারীও আর আসে না। সে বোধহয় অন্যত্র কোন মক্কেল পাকড়েছে।

--- উদয় এইবার কঠিন সমস্তার মুখোমুখি হয়েছে। কিছু টাকার দরকার মাধোলাল বাড়ি থেকে বেরই করে দেবে। দু-একটি দোকানেও বাকি পড়েছে অনেক।

বিষ্টু সাহার মদের দোকানেও বাকি পড়েছে। তাই মরিয়া হয়ে টাকার জন্য উদয় বাড়ি এসেছে।

এখানের অবস্থাটা দেখে অবাক হয় সে। এতবড় বাড়িটা জনশূন্য। সব কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে। পিসীমার মুখেও সেই এক কথা। সুমিতার জন্য ওঁরা আজ সবাই ভাবছেন, এতদিন ভাবেননি।

উদয় চুপ করে থাকে। ও শুনেছে কথাটা। বাবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থামল উদয়। বাবা উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন গোবিন্দনায়েবের সঙ্গে।

খবরটা সে-ও শুনেছে। গোবিন্দনায়েবই নাকি বেনামী করে তাদের ধান-জমি, এই বাড়ি অবধি বন্ধক রেখেছে।

উদয়ের করার কিছুই নেই। তার সামনে নিজের সমস্যাই বড়। টাকা চাই তার। এতকাল ধরে যেটাকে উড়িয়ে এসেছে সে, সেটারই প্রয়োজন বোধ করে সব থেকে বেশি করে।

ক-বছরেই সে জমানো টাকা সব শেষ করেছে। উড়িয়েছে সবকিছুই। সারা শরীরে তার মালিন্যের ছোঁয়া! সেই চেহারাও নেই। বসন্তনারায়ণ ছেলেকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইলেন।

মনোরমা বললেন,—হ্যাঁরে, বৌমাদের কোন খোঁজ পেয়েছিস?

বলেন বসন্তনারায়ণ,—ও পাবে না মনো। এই সর্বনাশের জন্য ওই-ই দায়ী। সেই সঙ্গে আমিও। কে জানে কোথায় আছে মা আমার! ছেলে-পুলে হয়েছে কিনা কে জানে, হলে বেঁচে আছে কি নেই! বাকি কথাটা আজ উচ্চারণ করতে তার বাধে।

মনোরমা বলেন,—আহা, যেখানেই থাকুক বাছা, বেঁচে থাক! তুই খোঁজ করেছিস উদয়?

উদয় মাথা নাড়ে। ধীরে ধীরে তার মনে সেই কথাটাও উদয় হয়েছে এইবার।

বসন্তনারায়ণ বলেন,—তা, হঠাৎ কেন এসেছ? তোমাকে তো অনেক টাকাই দিয়েছিলাম, সে সবই নাকি গেছে? বাড়িটাও বেচেছ, সে টাকা কোথায়?

উদয় বলে,—ব্যবসায় টালমাটাল হয়ই! আর কিছু টাকা পেলে সামলে নিতে পারব।

—টাকা! বসন্তনারায়ণ বেদনাময় কণ্ঠে বলেন,—টাকা আর নেই উদয়। কলসীর জল সব ফুরিয়ে গেছে। টাকার অভাবে তোমার সাতপুরুষের এই ভিটেও একদিন চলে যাবে। টাকা আর আমার নেই। আজ আমি পথের ভিখারীরও অধম উদয়। শুধু তোমাকে ভরসা করেই আজ সবদিক দিয়ে নিদারুণভাবে ঠকেছি। টাকার জন্য তুমি আর এ-বাড়িতে এস না। ও কালোমুখ দেখিয়ো না। যাও। সবই গেছে তোমার জন্য, আজ তুমিও যাও।

উদয় দাঁড়িয়ে আছে।

মনোরমা দাদার উত্তেজিত কম্পমান দেহটাকে ধরে ফেলেন,—দাদা! তুমি অসুস্থ।

বসন্তনারায়ণ চুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়েন। চোখ বুজে যেন সেই নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন।

বলে ওঠেন বসন্তনারায়ণ,—তুমি নিজে তোমার পথ দেখ উদয়। টাকার অভাবে রাস্তায় পড়ে মরলেও আর দেখব না। জানব—জানব এ-বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আমার সব হারিয়ে গেছে। ঘরের লক্ষ্মী, অর্থ, সম্পদ, এমন কি, একমাত্র ছেলে—সে-ও। তুমি কুলাঙ্গার। এ-বংশের পাপ। প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেও করতে হবে।

উদয় মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল।

মনোরমা দাদাকে হাওয়া করতে থাকেন। বসন্তনারায়ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকেন বিছানায়। দুচোখ বুজে তিনি যেন আজ নিজের মৃত্যুকামনা করেন, কামনা করেন আজ সেই চরম সর্বনাশের। অনুশোচনায় জ্বলছে সারা মন। মৃত্যুই আজ তাঁর কাম্য।

উদয় আজ ভাবনায় পড়েছে। খেয়াল হয়, এইবার তার চারিদিকে কেমন একটা অন্তহীন শূন্যতা। কেউ নেই আজ তার চারিদিকে। সুমিতার কথা মনে পড়ে। কেমন আবছা সেই কান্নাভেজা মুখ আজ তার সারা মনে নীরব বেদনার সাড়া আনে। কোথায় তারা সব হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল পূর্ণতার দিন।

শহরেই ফিরে এসেছে উদয়। বাড়িতেও তার ঠাঁই নেই। আশ্রয় নেই।

কোথায় যাবে জানে না। উঠেছিল বিন্দীর ওখানেই। বিন্দী বাড়িউলি ওরে দেখে অবাক হয়।

গায়ে মদের গন্ধ, চোখদুটোর চারিপাশে গভীর কালো দাগ, পরনের কাপড় চোপড়ও ময়লা, ছিন্নপ্রায়। কোথাও কোন আশ্রয় তার নেই। করবারও কিছু নেই। বিন্দী তার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে। আজ সেই কুমার বাহাদুর আর নেই উদয়। পথের ভিখারীই বলা যায় তাকে।

উদয় এসেছে আজ বিন্দীর কাছে আশ্রয়ের আশায়। ওদের মনে দয়া-মায়াও নয়। উদয়ের কথা শুনে বিন্দী জবাব দিল না। বিন্দী বিরক্তই হয়, দেখেও দেখে না উদয়কে।

—একটু মদ দেবে? উদয় ভীতকণ্ঠে কথাটা বলে।

বিন্দী শোনায়,—পয়সা আছে? দোকানে গিয়ে খাওগে। এখানে কেন?

উদয় চুপ করে যায়। এসময় লোকজন আসে। বলে ওঠে বিন্দী,—গেলে? যেতে বলেছি তো!

উদয় জবাব দেয়,—যাবার জায়গা আর নেই। তোমার অনেক বাড়ি, তারই এককোণে একটু ঠাঁই দাও না হয়।

বিন্দী অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে,—জায়গা? এখানে?

—হ্যাঁ। উদয় আশাভরে ওর দিকে চাইল।

—এখানে কেউ কিছু পায় না ছোটবাবু, সবাই দিয়ে-থুয়েই পথের ফকির হয়। পথেই ফিরে যায়। তুমিও সেইখানে যাবে ছোটবাবু। ওঠ দিকিনি, ঝামেলা হঠাও!

উদয় ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে,—সত্যি বলছো তুমি?

বিন্দী গম্ভীর গলায় হাঁক পাড়ে,—গুপে কোথায় গেলি? এদিকে একবার আয় তো। রসিকনাগর যেতে চাইছে না, ওকে একটু আপ্যায়ন করতে হবে

উদয় ধীরে ধীরে উঠল। বেশ বুঝেছে এখানে তার ঠাঁই হবে না। রাস্তাতেই বের হয়ে আসে।

শূন্য মন, কোথাও আশ্রয় নেই। রাস্তা দিয়ে চলেছে উদয়। হঠাৎ কার কলকণ্ঠের চিৎকারে ফিরে চাইল। পথ দিয়ে চলেছে একটি দম্পতী। স্বামী-স্ত্রী আর তাদের একটি ছোট্ট ছেলে। ছেলেটির কণ্ঠস্বরেই থমকে দাঁড়াল উদয়।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তার মনটা ভারি হয়ে আসে। এমনিই হত

ার ছেলে হলে। কেমন সুখে-শান্তিতে আছে ওরা। ঘর বেঁধেছে স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-পুলে নিয়ে।

আর সে? তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত ফিরছে পথে পথে। একদিন নিজের হাতেই সে তার ঘর ভেঙেছে। দূর করে দিয়েছিল তার স্ত্রীকে। সন্তানের মুখও দেখেনি।

আজ? উদয়ের বুকে চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়। চেয়ে থাকে ওই ছেলেটির মুখের দিকে তৃষিত দু-চোখের চাহনি মেলে। এই অনুভূতি, ব্যাকুলতা তার কাছে সদ্যজাত। এই প্রাণের চাঞ্চল্য সে আগে টের পায়নি।

দিনগুলো হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া প্রজাপতির মত উড়ে চলেছে। কারো কাছে সেগুলো বয়ে আনে চরম পরাজয় আর বেদনার সংবাদ। সারা মন কি গ্লানিতে ভরে ওঠে।

উদয় ফিরেছে এখান থেকে ওখানে তাড়াখাওয়া আহত কোন জানোয়ারের মত। আশ্রয় নেই, নির্ভর নেই। কোন সঞ্চয় নেই তার কোথাও।

বানে-ভাসা খড়কুটোর মত ঘুরছে শূন্য মন নিয়ে। দুঃখের মাঝে, পরাজয়ের গ্লানির মধ্যেই সে নিজের হারানো সম্পদের কি দাম ছিল তাই বুঝতে পারে। সেদিন এসব বুঝতে চায়নি। হেলায় হারিয়েছে সবকিছু।

তাকে স্ত্রীরও কোন মর্যাদা সে দেয়নি। তাকে ঘর থেকে পথে বের করে দিয়েছিল চরম অপবাদ দিয়ে। আজ ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার মন। চারিদিকে দেখেছে কত সুখী পরিবারকে। আজ উদয় পথের মানুষ, তাই অন্তরে তার ঘরের চিরন্তন ব্যাকুল কামনা।

দিনগুলো কোন দিকে পার হয়ে গেছে তা জানে না সুমিতা। ক-টা বছর তার জীবনের ওপর দিয়ে যেন ঝড়ের মত বয়ে গেছে। তারপর এসেছে এই প্রশান্তি। সেই ঝড়ের রাতে সে পথ না পেয়ে মরতেই গিয়েছিল। কিন্তু মরা সম্ভব হয়নি।

তাই আবার নতুন করে বেঁধেছে এই জীবন। সার্থক এ জীবন।

ডাঃ বোস সেদিন তাকে মিথ্যা আশ্বাস দেননি। বলেছিলেন, এখনও বাঁচতে পারবে মা। জীবনকে সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ সুন্দর করে তোলে, কেউ খেয়ালবশে তাকে ব্যর্থ করে দেয়। তুমি সুন্দরতম করবে।

সেই কথাটা সত্য হয়ে উঠেছে সুমিতার জীবনে। ঘর, স্বামী সেই পরিচয় সব হারিয়ে নতুন করে ডাঃ বোসের আশ্রয়ে এসে বেঁচেছে সে। তাঁর মেয়ের মতই রয়েছে এখানে।

নিজের আকণ্ঠ সেবা দিয়ে সেই সদানন্দময় কর্মব্যস্ত বৃদ্ধকে মুগ্ধ করেছে। সুমিতার এখন সময় নেই।

তার জীবনে এসেছে আর একজন, তারই সন্তান। ফুলের মত সুন্দর এই শিশুটির দিকে চেয়ে থাকে সুমিতা। এই সুন্দর প্রাণীটিকেও সে হত্যা করতে চেয়েছিল মা হয়ে।

কি ব্যাকুল আবেগে খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরে সুমিতা।

তাকে বাঁচতেই হবে, নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সেই চেষ্টাই করবে সে। তার সামনে অনেক কাজ। জীবনের নতুন স্বপ্ন। সে তার বেদনাময় অতীতকে ভুলতে চেয়েছে।

কয়েকটা বছর সেই সাধনাতেই কেটে গেছে তার। সুমিতা আনন্দের সঙ্গে সেই কষ্টকে স্বীকার করেছে।

সবুজ গাছের বুকে প্রজাপতিগুলো হঠাৎ নাড়া পেয়ে উড়তে শুরু করে। বাগানের মধ্যে কলকণ্ঠের কলরব শোনা যায়। প্রজাপতির পেছনে ছুটছে ছোট্ট একটি শিশু। বাগানের গাছগুলোর আড়ালে তাকে দেখা যায় না।

নদীর ধারে সুন্দর একটি বাড়ি, চারিদিকে সাজানো বাগান, রকমারি ফুলের গাছ। মাঝখানে খানিকটা কাঁকর-ঢালা পথ।

শহরের মধ্যে এ-বাড়িখানা সকলেই চেনে। ডাঃ বোসের বাড়ি। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কর্মব্যস্ত মানুষ, প্রায়ই বেরুতে হয় তাঁকে।

সুমিতা আজ বদলে গেছে। ক-বছরেই সেই ভেঙে-পড়া মেয়েটি আজ অনেক সামলে নিয়েছে। পরনে সাধারণ শাড়ি, তবে বেশ ধোপদুরস্ত পোশাক। চেহারাতেও একটা লাবণ্য এসেছে। হাতে দুগাছি বালার সঙ্গে সরু সেই সোনায় মোড়া লোহাটাও রয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুরের আভাষ তার সদ্যস্নাত চেহারায় এনেছে একটা লাবণ্য।

ডাঃ বোস সকালের খাবার টেবিলে বসেছেন। সুমিতাকে দেখে বলে ওঠেন,—একি করেছ মা, সকালে এত সব খাবো কি করে?

সুমিতা ওঁর দিকে চেয়ে থাকে। নিজের বাবাকে মনে পড়ে না। তাঁকে বাবার মতই শ্রদ্ধা-সম্মান করে। তাঁর কাছে শুধু কৃতজ্ঞই।

জীবনে এই বৃদ্ধই তার কাছে দেবতুল্য একটি মানুষ। তাঁর দয়াতেই সুমিতা আজ বেঁচেছে, সার্থক হয়েছে নতুন রূপে।

হাসে সুমিতা,—এই তো খেয়ে বের হবেন, ফিরতে সেই বেলা দুটো-আড়াইটে!

—শান্তনু কোথায়? সে খাবে না?

ঝড়ের বেগে শান্তনু ঢোকে। একটা প্রজাপতিকে ধরে এনেছে সে। কলকণ্ঠে বলে,—দেখ মা-মণি, কি সুন্দর প্রজাপতি! দাদুর দাড়ি কোটটাই-এর রঙ সব মিলিয়ে আছে ওর ডানায়!

সুমিতা বলে,—ছিঃ, কি দুষ্টু তুমি, ছেড়ে দাও ওকে। কষ্ট হচ্ছে ওর।

প্রজাপতিটাকে ছেড়ে দিতেই উড়ে যায়। সেদিকে চেয়ে থাকে শান্তনু।

—খেতে বসো। ডাঃ বোস ওকে কাছে বসান আদর করে।

শান্তনু ডাঃ বোসের পাশেই বসে নানাকথা শুরু করে।

সুমিতা বলে চলে,—খুব দুষ্টু হয়েছ তুমি।

ডাঃ বোসের কোল ঘেঁষে বসে শান্তনু। ওঁর পাইপটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে আনমনে।

সুমিতা বলে চলেছে,—এইবার স্কুলে যেতে হবে।

—স্কুলে! শান্তনু ডাঃ বোসের কোলে গিয়ে ওঠে। যেন ভয়ের রাজ্য সেটা। সেই ভয়ের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র তিনিই।

হাসেন ডাঃ বোস,—তাই তো শান্তনু, বড্ড ভয়ের কথা! কি হবে তাহলে?

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ডাঃ বোস,—সর্বনাশ! ন'টা বেজে গেছে, হাসপাতালের দেরি হয়ে গেল। বুঝলে মা—ওরা বলে এখন নাকি দেরি হয় আমার।

সুমিতা ওঁকে গাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে আসে। শান্তনুও ছোট্ট দুটি হাত তুলে বিদায় জানায় ওঁকে। ওই দুটো ছোট্ট হাতের বাঁধন তাঁকে বেঁধেছে কি মায়ায়।

হাসপাতালের অফিসে ডাঃ প্রশান্ত মুখার্জী অপেক্ষা করছে ওর বস্ ডাঃ

বোসের জন্য। দেরি তাঁর হয় না। কিন্তু এখন মাঝে মাঝে দেরি হয় তাঁর বাড়ির ব্যাপারে।

গাড়িটা ঢুকছে ডাঃ বোসের। এগিয়ে আসে প্রশান্ত।

ডাঃ বোস গাড়ি থেকে নেমে বলেন,—আই অ্যাম লেট টু ডে প্রশান্ত সরি!

—না, না! প্রশান্ত আমতা আমতা করে।

ডাঃ বোস বলে ওঠেন,—না হে, আজকাল সুমির বাচ্চাটার জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন মায়া। সেই ভরতমুনির গল্প জানো তো? হরিণ-শিশুই বৃদ্ধ মুনির তপস্যায় বাধা হয়ে উঠল। বাই দি বাই, সুমিতাই বলছিল কথাটা—ও নার্সিং পড়বে। পড়তে নাকি শুরুও করেছে। তুমি যদি থিওরেটিক্যাল পেপারগুলো একটু দেখিয়ে দাও! মানে, মেয়েটি সত্যিই ভালো আর বেশ বুদ্ধিমতী। অবশ্য তোমার যদি সময় হয়! তাহলে ও ভালোভাবেই পাশ করবে।

প্রশান্ত বলে ওঠে,—না, না। যাবো সময় করে।

হাসপাতালে একটা সাড়া পড়ে যায়। চারিদিকে সন্ত্রস্ত ভাব।

ডাঃ বোসের আসার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের আবহাওয়াও বদলে যায়। আউটডোরেও সাজ-সাজ রব পড়ে। ওয়ার্ডবয় থেকে হাউস ফিজিসিয়ানরাও ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

ডাঃ বোসের খুব নাম-ডাক। বাড়িতেও আসে রুগী, অনেক রুগী।

সুমিতা দেখেছে সেখানের বিধি-ব্যবস্থা। গরীব লোকও আসে। সেখানে তাঁর টাকার চাহিদা তেমন নেই। কিন্তু দেবার যার সামর্থ্য আছে তার কাছে পুরো টাকাই নেন তিনি। কোন কসুর করেন না।

হাসপাতালে ডাঃ বোস সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

অনেকদিন আগে তাঁরই চেষ্টায় মফঃস্বল শহরে এই হাসপাতাল গড়ে ওঠে। সেদিন একটা হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য কম পরিশ্রম করতে হয়নি ডাঃ বোসকে।

অনেক ডাক্তারও অবাক হয়েছিল। নাম-করা ডাক্তার তিনি, চালু প্রাকটিস। মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন। হাসপাতাল হলে অনেক রোগীই বিনাপয়সায় সেখানে চিকিৎসার জন্য যাবে। তাতে তাদের পয়সাই কম আসবে। ডাঃ বোসকে সেই লোকসানও সইতে হবে।

তিনি বন্ধুদের কথায় হেসেছিলেন সেদিন। বলেছিলেন,—গরীবদের জন্য
ৃপাতাল হবে। পয়সা যাঁদের আছে তাঁরা তো দেবেনই।

সেইদিন তিনি নিজে সারা জেলার গ্রামে গ্রামে গিয়েছিলেন। সাধারণ
নুষ এগিয়ে এসেছিল, সাহায্য করেছিল এই মহানব্রতে। হাসপাতাল
তিষ্ঠা করেছিলেন তিনি।

সেই ছোট্ট হাসপাতাল আজ বিরাট একটি সেবা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত
য়েছে। ডাঃ বোস আরও অনেক ডাক্তারকে এনেছেন। প্রশান্ত মুখার্জী
দেরই অন্যতম।

তরুণ একটি ডাক্তার, কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছিল মেডিক্যাল কলেজ
কে। প্রশান্তই ডাঃ বোসের নাম শুনে এখানে আসে।

ডাঃ বোসের ভাল লাগে ছেলেটিকে। সুন্দর একটি যুবক। বুদ্ধিদৃপ্ত
হারা, নম্র ব্যবহার। একটা মধুর ব্যক্তিত্ব ওর চেহারায়—কথাবার্তায় ফুটে
ঠে। ডাঃ বোস মুগ্ধ হন ওর কথাবার্তায়। ডাক্তার হবার যোগ্যতা ওর
াছে।

তবু বলেন তিনি,—এখানে থাকতে পারবে তো? ডাক্তারি করি সত্যি,
টা অর্থের জন্য। সেবার কাজটা পরে। ভেবো না, তুমি ডাক্তার। সবদিক
কে সমাজের আদর্শ—একটি মানুষ তুমি। সেটা ভুললে চলবে না।

ডাঃ প্রশান্ত মুখার্জী ওঁর কথাটা মনে রেখেছে।

তাই রয়ে গেছে এখানে ক-বছর ধরেই। সুন্দর সবুজ এই ঠাঁইটাকে ভাল
াগে তার। ডাঃ বোসের মত নাম-করা একজন ডাক্তারের কাছে শিখেছেও
নেক কিছু।

হাসপাতালে রোগীদের ভিড়ে ডাঃ বোসের দম নেবার সময় নেই। এখন
ু কাজ আর কাজ।

আউটডোরে কয়েকটা জটিল কেস দেখে যাবেন অপারেশন থিয়েটারে।
শান্ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

সেখান থেকে বেরিয়ে সময় থাকলে অফিসেও আসেন। অন্য ওয়ার্ডেও
রে ঘুরে দেখেন সবকিছু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। গলতি বের হলে কাউকে ছেড়ে কথা
লেন না।

তাই সকলেই সমীহ করে তাঁকে। কাজ সেরে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে
ায়।

বিকেলে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চেম্বারে বসেন।

আগে থেকেই দূর-দূরান্তরের অনেক রোগী আসে। সব সেরে বিশ্রা নেন আটটার পর। ওইটুকুই তাঁর অবকাশ।

সুমিতা চায়ের টেবিল পাতে। আবছা স্নিগ্ধ আলোয় জায়গাটা মনোর হয়ে ওঠে।

ডাঃ বোসের কাছে এই সময়টুকুর একটা আকর্ষণ রয়ে গেছে। সারা দিন রোগী—হাসপাতাল সব সামলে বিকেলে আবার চেম্বারে বসতে হয়।

ডাঃ বোস চেম্বার শেষ করে সন্ধ্যাটুকু বাইরের জগত থেকে অন্য জগ এসে কাটান। তাঁর শূন্য জীবনের এইটুকুই আজ সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা হ উঠেছে।

শান্তনু বড় হচ্ছে। তাকে স্কুলে ভর্তি করার কথাই বলবেন ভাবছিলেন সুমিতা শান্তনুকে ছবির বই নিয়ে কি দেখাচ্ছে। হাসছে শান্তনু। মা-ছেলে এই সুন্দর জগতের ছবিটা ডাঃ বোসের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

দু-একটা তারা ফুটে ওঠে। নদীর ধারে বাবলা বনে সাইবাবলার ফু ফুটেছে। মিষ্টি হলুদ ফুলগুলোর উদাস সুরভি ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। গঙ্গা বালুচরে রাতজাগা একটা পাখি ডেকে চলেছে।

ডাঃ বোস পাইপ টানছেন। ধোঁয়াটা বের হচ্ছে। ওঁর সুন্দর মুখখানা কি চিন্তার রেখা। সুমিতার অতীত জীবন সম্বন্ধে এতদিন কোন কথাই তিনি জানতে চাননি।

শান্তনু বড় হয়ে উঠেছে। তাকে সমাজে মিশতে হবে। ওটার তা প্রয়োজন। সুমিতাকে দেখে যতদূর মনে হয়েছে, তাতে বুঝেছেন, কো অভিজাত ভদ্রঘরের বৌ। কিন্তু ওর চলে আসার কারণ নিয়ে কোন প্র কোন কৌতূহলই তাঁর ছিল না।

মানুষকে তার পরিচয় নিয়েই চিনতে চান তিনি। চিনেছেনও, ঠকেননি

সুমিতা ওঁর দিকে চাইল।

—কি এত ভাবছেন বাবা ?

ডাঃ বোস জবাব দিলেন না। হাসলেন মাত্র। মিষ্টি একটু হাসি।

শান্তনু এই অবসরে বাড়ির দিকে দৌড়েছে। বোধহয় বড় অ্যালসেসিয়ান কুকুরটাকে জ্বালাতন করছে। ওটা ওদের দুজনের একটা খেলা। কুকুরটা বিশাল মুখ বিস্তার করে চিৎকার করে, আর ওর পেছনে পেছনে ছোটে।

শান্তনু হাসছে। ওর মিষ্টি হাসির শব্দে নীরব বাড়িখানা ভরে ওঠে।
াই যেন এ-বাড়িতে প্রাণস্পন্দন এনেছে।

হারানো সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সুমিতার। কিন্তু সেখানে রয়ে
অভিমান। ওরা কেউ-ই তার কোন সংবাদও নেয়নি। শান্তনু তাদের
শর একামাত্র সন্তান, তাকেও দেখতে আসেনি ওরা একবার।

সুমিতাও তাদের কোন সাহায্য আর চায় না। নিজের পায়ে দাঁড়াবে
।

কথাটা তাই আগেও বলেছে ডাঃ বোসকে। আজও মনে করিয়ে দেয়।
আমার কথাটা মনে আছে বাবা?

ডাঃ বোস ওর দিকে চাইলেন। সুমিতা জানে নানা কাজে থাকেন ডাঃ
স। দিনরাত রোগীদের ভাবনা তাঁর মনে। তাই বোধহয় একথাটা ভুলেই
ছেন তিনি। সুমিতা মনে করিয়ে দেয়।—আমার নার্সিং পড়ার কথা।

হাসেন ডাঃ বোস। রাতের বাতাসে কি সাড়া জাগে।

সুমিতা আনমনে চেয়ে থাকে ওই দূরের তারার দিকে। মাঝে মাঝে
ন পড়ে অতীতের দিনগুলো। একটি শান্ত ঘরের কল্পনা, একটি নব-
তকের কলরবে সেই ঘর ভরে উঠবে। আজ সবই হয়েছে, কিন্তু হারিয়েছে
ঘরের ঠিকানা। কেমন সব অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে যেন।

ডাঃ বোস বলে চলেছেন,—তোমার পড়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছি মা।
ান্তকে বললাম, সেই-ই দু-দশ দিন তোমায় থিওরেটিক্যালগুলো দেখিয়ে-
য়ে দেবে। পাস করতে পারবে তবে একটা কথা মা—

সুমিতা মুখ তুলে চাইল।

ডাঃ বোস বলেন,—সংসারে আমার কেউ নেই। এতদিন কাজই করেছি,
চার আনন্দ কিছু বুঝিনি। যেদিন তোমাকে গঙ্গার ধার থেকে আনি, সেদিন
থাই ছিল, তোমার এবং তোমার সন্তানের সব দায়িত্বই আমি নেব। তাই
বো না যে সেই দায়িত্ব এড়াবার জন্যই তোমার পড়ার ব্যবস্থা করছি।

একথাটা জানে তাই হাসে সুমিতা,—না, না। এতবড় পৃথিবীতে যেদিন
ব হারিয়েছিলাম, সেদিন আপনিই আশ্বাস দিয়েছিলেন বাঁচার। আমারও
কউ নেই।

ডাঃ বোস চুপ করে থাকেন। অন্ধকারে পাইপটা জ্বলছে। বলে ওঠেন,—
ছি শান্তনুকে স্কুলে ভর্তি করে দিই—কিন্তু একটা কথা···ওর বাবার নাম?

চুপ করে থাকে সুমিতা। আজ সে চমকে উঠেছে। যাকে এতদি
ভোলবার চেষ্টা করেছে, সেই মানুষটি যে এমনি করে তার সন্তানের জীবনে
সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা ভাবেনি। সেই দিনগুলোকে আজ স্বপ্ন বলে মনে হয়
ডাঃ বোস ওর দিকে চেয়ে থাকেন। বলে চলেছেন তিনি,—কেন ঘর ছে
এসেছিলে তা জানতে চাইব না মা। কিন্তু নাম-পরিচয় এটা তো চাই!

সুমিতা সব সইতে পারে, কিন্তু ডাঃ বোসের মনে কোন বেদনা দিত
পারবে না সে। বলে,—বিশ্বাস করুন, আমার কোন দোষ ছিল না। যাকে
এড়াতে চেয়েছি বার বার, তবু তাকেই স্বীকৃতি দিতে হবে!

হাসেন ডাঃ বোস, মিষ্টি একটু হাসি। শোন,—কি জানো মা, একে
সহজে এড়ানো যায় না। তবু নিজের পায়ে দাঁড়াও। ছেলেকে মানুষ করো
একদিন সব ভুল তার ভাঙবে। আবার সব ফিরে পাবে। তার জন্য
সাধনার দরকার মা। সীতাকেও অগ্নিশুদ্ধা হতে হয়েছিল।

সুমিতা মন থেকে এটাকে মানতে রাজী নয়। অনেক বেদনা-অপমান
সয়েছে সে। বিনা দোষে তাকে বাড়ি থেকে চরম অপবাদ দিয়ে তারা বের
করে দিয়েছিল। কোন দাবীর কথাই শোনেনি তারা।

এগুলো সহ্য করতে পারেনি সে। এ যুগে সীতার কথা পুরোনো হয়ে
গেছে।

একে নারীর প্রতি অত্যাচারই বলা যায়। তবু ডাঃ বোসকে এই ধরনের
কথা বলতে দেখে অবাক হয়েছে সুমিতা। সে শুধোয়,—আপনি ডাক্তার,
বিজ্ঞানী! এই সবে বিশ্বাস করবেন? অতীতেই চলতো এসব।

ডাঃ বোস গম্ভীরভাবে জবাব দেন,—অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই মা।
যতই ইংরেজী-য়ানায় রপ্ত হই বাংলার এ-মাটিতে মায়ের সেই কল্পনা ভুলতে
পারি না। মাকে কেন্দ্র করেই আমাদের সীতা-সাবিত্রীর কাহিনী—একটি
পবিত্র সীমন্তিনী মূর্তি। তুমিও যে মা! ছেলের জন্য সব সইতে হবে তোমায়।

সন্ধ্যার বাতাসে একটি মিষ্টি সুর ভেসে ওঠে। বলেন ডাঃ বোস,—দিন-
বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখ-বিপদ, জীবনের জটিলতা বেড়েছে মা।
মানুষের মত এবং আদর্শও বদলাচ্ছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে। সনাতন বাঁধন
কেটে সে নতুন করে আজ বাঁচার পথ খোঁজে। বাঁচেও। তবুও বলবো,
যেখানে সেই পবিত্র বাঁধনটুকুর জন্য শ্রদ্ধা থাকে, সেখানে আজও কল্যাণশ্রী
অটুট। সব দুঃখ পার হয়ে একদিন আবার সে সুখী হয়।

সুমিতা. কথা বলে না।

পড়ার শব্দ কানে আসে। চিৎকার করে একটা কবিতা পড়ছে সে। সুমিতা কান্নাভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে,—ওর বাবার নাম উদয়নারায়ণ [রা]য়। এর বেশি আর কিছু বলতে পারবো না আমি, আমায় অনুরোধ [ক]রবেন না।

কান্নায় ভেঙে পড়ে সুমিতা। বাতাসে ওঠে একটা করুণ সুর। রাতের [আঁধা]রে গঙ্গার দিক থেকে একটা পাখির ডাক ভেসে আসে। আবার থেমে [আ]সে। চারিদিকে আঁধার নেমেছে।

আঁধার নেমেছে বড়বাড়িখানায়। থমথম করছে চারিদিক। কোথাও [আ]লোর নিশানা নেই। একটি ঘরে মাত্র একটা বাতি জ্বলছে। অতল [আঁ]ধারে ও যেন যে-কোন মুহূর্তে হারিয়ে যাবে।

বসন্তনারায়ণের মুমূর্ষু দেহটার পাশে আজও আছেন মাত্র ওই মনোরমা। [আ]র এসেছে সেই বিষ্টু সরকার। ডাক্তার একটা ইন্‌জেক্‌শন তৈরি করছেন। [জী]র্ণকণ্ঠে বলে চলেছেন বসন্তনারায়ণ,--উদয়ের কোন খবর পেলি না মনো? [আ]মার মায়ের? সবাই ওরা আমাকে ছেড়ে গেল, বুঝলি? মহা অপরাধ [ক]রেছি আমি জীবনে মাকে বিসর্জন দিয়ে। প্রায়শ্চিত্ত করে গেলাম মনো। [উ]দয়ের সব গেছে। এ-বাড়িও যাবে। মনো, শহরে তোর নামে ছোট [ব]াড়িখানায় ভাড়া-টাড়া দিয়ে কোনরকমে চালাবি। এছাড়া আর তোকেও [কি]ছু দিয়ে যেতে পারলাম না। ভিখারী হয়ে গেলাম —তোদেরও তাই করে [গে]লাম।

মনোরমা দাদার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। বলে ওঠেন কান্নাভেজা কণ্ঠে,— [এ]সব আর ভেবো না তুমি। ঠাকুর যা করবেন তাই হবে।

বসন্তনারায়ণ বেদনাভরা কণ্ঠে বলেন,—না, ভাবি না আর কিছুই মনো। [অ]নেক নিয়ে জন্মেছিলাম। এক জীবনেই সব হারিয়ে —ফুরিয়ে চলে গেলাম।

ডাক্তার ইনজেক্‌শন দিতে আসেন। বলেন বসন্তনারায়ণ,—এসব আর [কে]ন ডাক্তার? আমার তো সব ফুরিয়ে আসছে। মরে গেছি অনেকদিন [আ]গেই; আজ শুধু দেহটাই পড়ে আছে। সে-ও ছুটি চাইছে আজ।

ক্লান্তি আর শেষ অবসাদ ছেয়ে আসছে দুচোখে। বসন্তনারায়ণ দু
হাত তুলে কাকে যেন খুঁজছেন।

—উদয়! মনো, যদি কোনদিন দেখা হয়, বলিস—আমি তাকে ক
করে গেলাম। আর বৌমার যদি কোনদিন কোন খবর পাস, তোর কা
আসতে চায় আনবি মনো। মায়ের জীবন আমি ব্যর্থ করে দিয়েছি।
ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমার করার সুযোগ হল না। মাকে জানাবি, তার কা
ক্ষমা চাইবার মুখ আর নেই। মা আমার চোখের জল ফেলে গেছে এ-ব
থেকে।

বসন্তনারায়ণের জীবনীশক্তি এতদিন ধরে এত আঘাত, এত অসুস্থত
সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত পরাজিতপ্রায়। জীবন-যুদ্ধেও হার মেনেছেন তি
আগেই।

বড়বাড়িখানার এদিক-ওদিক মেরামত অভাবে ধ্বসে পড়েছে। উদয়ে
কোন খবর জানেন না তিনি। কয়েক বছর আগে সেই যে উদয় বাড়ি থে
বের হয়ে গেছে আর ফেরেনি। সুস্মিতারও কোন সন্ধান পাননি।

ধীরে ধীরে ফুরিয়ে এসেছে বসন্তনারায়ণের সব আশা। জীর্ণ শরীরটা
সেটা বুঝেছে। বুঝেছে তার কোন প্রয়োজন আর নেই। তাই বিদ্রো
ঘোষণা করেছে। পয়সাও নেই যে সদরে গিয়ে ভাল করে চিকিৎসা করাবেন
মনোরমা তবু বলেছিলেন,—আমার যাহোক কিছু আছে, তাই নিয়ে বড়
ডাক্তার দেখাও।

হেসেছিলেন বসন্তনারায়ণ,—বাঁচতেই যে চায় না মনো, তাকে ধরে রেখে
দুঃখ দিবি কেন? শান্তিতে যেতে দে।

রাত নেমেছে। স্তব্ধ বাড়িখানার জীর্ণ পাল্লাগুলো বাতাসে আছড়ে
পড়ছে। এ-বাড়িতে আর প্রাণের সাড়া নেই। আলো নেই। ক-টি
মানুষ ওই জমিদার বংশের শেষ প্রতিভূ বসন্তনারায়ণের অর্ধ-অচেতন কঙ্কাল-
সার দেহটার দিকে চেয়ে আছে।

বসন্তনারায়ণের চোখের সামনে অতীতের সেই গৌরবময় দিনগুলোর ছবি
ভেসে ওঠে। উঠছে সুর—আলো ঝলমল করে চারিদিকে।

সমারোহময় দুর্গাপূজোর সেই মুহূর্তগুলো। বালক বসন্তনারায়ণ সাচ্চা
জরির পোশাক পরে ঘুরছে প্রাসাদের কোণে কোণে।

হঠাৎ কাকে দেখে কেমন চমকে ওঠেন আজকের এই জীর্ণ মানুষটা। তাঁর

ঘর ভরে উঠেছে। স্ত্রী—উদয়ের মা এসেছে। সামনে দেখতে পান তাকে। দুচোখে ওর কি ব্যাকুলতা! ডাকছে তাঁকে বৌরাণী। মুখে মিষ্টি হাসির স্পর্শ। সারাদেহে ওর যৌবনের জোয়ার।

বসন্তনারায়ণ ভুলে গেছেন আজকের এই জরাজীর্ণ দেহটার কথা। তাঁর সব হারানোর কথা। আলো-ভরা জগতে তিনি চলেছেন কোন স্বচ্ছ হাওয়ায় ভর করে।

কে যেন ডাকছে তাঁকে বহু দূর হতে। মনোরমা কেঁদে ওঠেন। ডাক্তারও এগিয়ে এসে ওঁর নাড়িটা দেখতে থাকেন। কিন্তু প্রাণের কোন সাড়া নেই।

বসন্তনারায়ণের জীর্ণ দেহটা আজ পড়ে আছে। তাঁর মুক্ত আত্মা কোন্ দূর নীলাকাশের যাত্রী। এতদিনের পর আজ তাঁর ছুটি মিলেছে। চুকে গেছে সব যন্ত্রণা ভাবনা সমস্যার জ্বালা আর অনুশোচনা। রাতের অন্ধকারে মনোরমার কান্নার স্বর ওঠে। বিরাট ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদের কোণে কোণে বাতাস কাঁদে।

রাতের আঁধারে আলোগুলো জ্বলছে এখানে। আসরে বহু-লোকের সমাবেশ। বেহালার করুণ সুর রাতের আঁধার ভরে তোলে। যাত্রার আসরের মাঝে নিয়তির গানের করুণ সুর ওঠে,—আমি কখন ভাঙি, কখন গড়ি, নাইকো ঠিকানা।

বেহালা বাজাচ্ছে লোকটা। নিপুণ হাতে দীর্ঘতানে করুণ সুরে ছড় টেনে চলেছে। মুখে একমুখ দাড়ি, লম্বা চুলগুলো উস্কোখুস্কো। চোখ দুটো লালচে। ওই বেহালার করুণ সুরে ওর মনের নীরব বেদনা যেন ফুটে ওঠে।

উদয়নারায়ণ আজ জীবনের অনেক ঘাট পার হয়ে, নানা জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে, সব হারিয়ে এসে ঠেকেছে এই ভ্রাম্যমান যাত্রার দলে। বেহালা বাজাত আগে শখ করে, এখন এই তার জীবিকা। চোখদুটো কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। মদের মাত্রাও বেড়ে গেছে, বেড়েছে শরীরের ওপর অত্যাচারও।

জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা বদলে গেছে। আজ সব আশা হারিয়ে গেছে তার। তাই এমনি করে উদয় পথে পথেই ঘুরছে এই যাত্রার দলের বাজিয়ে হয়ে। বেহালার সেই সুন্দর হাতটা এখনও যায়নি।

আর সব হারিয়ে গেছে তার।

একদিন তার বাড়ি-ঘর-স্ত্রী ছিল, ছিল রাজার ঐশ্বর্য। সব কেমন ভোজ-বাজির মত কোন্‌দিকে মিলিয়ে গেল।

সবই এমনি অর্থহীন। সুস্মিতার কথা মনে পড়ে। পথে পথে খুঁজেছে

সে এতদিন ছুচোখ মেলে। আসরের হাজারো মুখের মাঝে সন্ধান করেছে একটি চেনা মুখের। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সে।

বাবাও মারা গেছেন। সে-খবর শুনেছিল উদয় শহরে। দেশের বাড়িতে গিয়ে দেখে, সব শেষ হয়ে গেছে। এখন সে-সব বাড়িঘরের অবস্থাও জানে না।

সব ভাবনা আর যন্ত্রণাকে এড়াবার জন্যই সে এমনি করে নিজেকে ভুলে থাকতে চায়। যাত্রার দলের নাম-পরিচয়হীন একটি বাজিয়ে সে।

এর বেশি আর কোন পরিচয়—অতীত তার নেই।

চুপ করে একপাশে বসে আছে উদয়। ওদিকে সখির দলের একজন নাচিয়েকে অধিকারীমশায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা আধুলি দিয়েছে জলপানি বাবদ। অমনি বাকি ছু-একটা ছোঁড়া ফোঁস্ করে ওঠে,—ওকে আট আনা, আমাদের চার আনা জলপানি!

এই নিয়েই গোলমাল বেধেছে।

উদয়ের এসব ভাল লাগে না। সামান্য একমুঠো বেশি ভাত, ছু-টুকরো আলুর জন্য এরা বাপ-মা তুলে খিস্তি করতে পারে। আজ উদয়নারায়ণ এমনি জীবদের দলে এসে মিশেছে!

আঁধার চালাটার একপাশে পড়ে থাকে! গলায় সেই মদটা ঢালছে।

পদ্মনাথ দলের তবলা বাজায়। উদয়ের বাজনার ভক্ত সে। ওকে ভালও বাসে—ওই খেয়ালী লোকটিকে। পদ্মনাথ ওর জন্য এনেছে মুড়ি আর ফুলুরি। পদ্মনাথ ওর হাতে একটা চিঠিও দেয়,—তোমার চিঠি ওস্তাদ!

উদয় হাসে,—চিঠির পাট তো চুকিয়ে দিয়েছি। আবার এসব কেন? পিসীমাই একা পড়ে আছেন বুঝলি পদ্ম, ওই একটাই গেরো। বাকি সব ফর্সা।

পদ্মনাথ বলে,—এতো মদ খাও কেন ওস্তাদ?

উদয় ওর দিকে চাইল। অন্ধকারে ওর ছুচোখ চকচক করে কি বেদনায়। জবাব দিল না উদয়। পদ্মনাথ বুঝবে না ওর অন্তরের পুঞ্জীভূত সেই বেদনার জ্বালা।

পদ্মনাথ ওর দিকে চেয়ে থাকে। বলে সে,—পিসী বার বার করে যেতে লিখেছে, তাই যাও না দিন-কতক! তবু জিরুতে পাবে সেখানে।

উদয় কি ভাবছে। বলে ওঠে,—ওসব ভাঙাহাটে আর যেতে মন চায় না রে পদ্ম। বাড়ি-ঘর বিষয়-আশয় সব গেল। পিসী এসে মাথা গুঁজেছে শহরের ওই ঘিঞ্জি-বাড়িতে। ওখানে যে থাকতে মন চায় না!

পদ্ম চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বলে ওঠে,—তবু একবার ও ওস্তাদ। এমনি করে ঘুরে বেড়ালে শরীর টেঁকে? তারপর যা অনিয়ম রো তুমি, এই সব ছাইপাশ গেলো!

উদয় ঝিম মেরে বসে কি ভাবছে। রাত নেমে আসে। দলের ছোঁড়াগুলো জা-উজীরের পোশাক ছেড়ে চ্যাটাই-এ শুয়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

মনোরমা দেশের সেই বাড়ি-ঘর-প্রাসাদ সব হারিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন হরের এই ছোটবাড়ির একতলাতে। কিছুটা ভাড়া দিয়ে দিন চালান। ঙ্গাস্নান করেন রোজ ভোরে। মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখেন সন্ধ্যায়। এছাড়া আর কাজ নেই।

সারা বাড়িতে একটা দারিদ্র্যের নিবিড় ছায়া নেমেছে। সেই প্রাচুর্য আর নই। মনোরমার একার দিন চলে কোনমতে। উদয়ের কথা মনে পড়ে। াজ সব হারিয়ে সে যাত্রার দলে বেহালা বাজিয়ে রুজি-রোজগার করছে।

আর রোজগার যে কি, তাও জানেন মনোরমা। নিজের এই দারিদ্র্যের মাঝেও তবু মনে হয় উদয়ের কথা। ওকে দেখতে ইচ্ছা করে খুব। মনোরমার াওয়ার একটা দড়ির আলনায় দু-একটা থান ঝুলছে। গায়ের চাদর। তাও ময়লা আর ছেঁড়া। দেখলেই বোঝা যায় কি দৈন্যদশায় পড়েছেন মনোরমা!

মনোরমা গ্রামের পাট চুকিয়ে শহরের এই বাড়িটায় এসে রয়েছেন। এইটুকুই তাঁর সম্বল। কায়ক্লেশে কোনমতে টিকে আছেন। সেই প্রাচুর্যের দিন আজ তাঁর কাছে স্বপ্নমাত্র।

সব ভুলে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করছেন মনোরমা। ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান করে এদিক-ওদিকের ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ে আসেন। তারপর নিজের জন্য সিদ্ধপক্ক চাপান।

তাঁর সামনে পৃথিবীর রূপও যেন বদলে গেছে। পথে-ঘাটে দেখেন কতো মা-ছেলেকে, কতো সুখী পরিবারকে। তারা কেমন ঘর-সংসার নিয়ে সুখে আছে।

নিজের সবকিছু কোন্‌দিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এই ক্ষোভটা মনোরমার মন থেকে মুছে যায়নি। ও যেন নিজের অদৃষ্ট। তাই এ গ্লানি তাঁরও। এই ধিক্কার তাঁরও প্রাপ্য।

রোজকার মত আজ ভোরেও বের হয়েছেন মনোরমা গঙ্গাস্নান করতে

উদয় ক-দিন থেকেই কথাটা ভাবছিল। যাত্রার দলের এই পরিবেশ অর্ধভুক্ত মানুষগুলোকে সহ্য করতে পারে না সে। আসরে ধর্মরূপী উদাত্তকণ্ঠে জ্ঞানগর্ভ গান শুনিয়ে আসে, ত্যাগের মহিমা ঘোষণা করে, বেন্দাই আবার তুচ্ছ এক ছিলিম গাঁজার জন্যে খিস্তি করে নিদারুণভাবে।

লোকগুলোকে সহ্য করতে পারে না উদয়।

তাই দল দিন কয়েকের জন্য এদিকে গাইতে আসতেই উদয়ও ট্রেন। নেমে পিসীমার এখানেই চলে আসে। ক-দিন বিশ্রামই নেবে।

ভোরবেলায় দরজাটা ভেজিয়ে মনোরমা গঙ্গায় গেছেন। উদয় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। প্রায়ান্ধকার ছোট উঠোন একফালি। ওপ ঘরের দরজা তালাবন্ধ।

সারারাত ট্রেনে এসেছে। খিদে আর ঘুম দুটোই পেয়েছে। ওই - ওপরই চাদরটা মুড়ি দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ামাত্র ঘুমিয়ে যায় এভাবে যত্র-তত্র পড়ে ঘুমোনোর অভ্যাস তার আছে। তাই এতে অ- হয় না।

মনোরমা স্নান সেরে ফিরছেন ভিজে কাপড় হাতে। নিজে এসে ধরালে তবে একটু চা জুটবে। বয়স হয়েছে। নিজের এসব কাজ অভ্যাস ছিল না কোনকালে। আজ ভাগ্য-বিপাকে সবই করতে হচ্ছে। গজগজ করেন,—মরণও হয় না আমার! সব গেল, সোনার সংসার গেল, বৌমা-নাতি-নাতকুড়-ভাইপোদের নিয়ে ঘর সব ভেসে গেল। রইলাম আমি! যমকেও বলি!

ওদিকে চাদর মুড়ি-দেওয়া মূর্তিটাকে দেখে এগিয়ে যান।—উদয়!

উদয় চোখ বুজেই জড়িতকণ্ঠে জবাব দেয়,—উদয়ের আর উদয় নেই সব অস্ত হয়ে গেছে। তাই কখন আসি-যাই টেরও পাবে না। একটু চা দিকি! শীতে কন্‌কন্ করছে হাত-পা।

মনোরমা উনুন ধরাতে থাকেন চায়ের জন্য।

উদয়ের ঘুম ভেঙে আসছে। কেমন নির্বিকার উদাস সে। উঠে মনোরমা বলে ওঠেন,—তবু এসেছিস তাহলে?

চুপ করে থাকে উদয়। মনোরমা চা তৈরি করে নিয়ে আসেন। উদয়
। দিকে চাইল।

—চা নে।

—চা? দাও।

মনোরমা বলেন,—হ্যাঁরে, বৌমার কোন খোঁজ-খবর পেলি না? এদিক-
়ক যাস—চোখে পড়েনি?

হাসে উদয়, মলিন বিষণ্ণ হাসি। বলে ওঠে,—যখন যাই তখন যে চোখ
়ল চাইবার ক্ষমতা থাকে না পিসী! আর চেয়েই বা লাভ কি? তাছাড়া
জানো, চেনার মুখ আর নেই। সেদিন পয়সা ছিল, হাঁক-ডাক ছিল, তাই
ণ চিনতো। আজ?…

মনোরমা চুপ করে থাকেন। বলে উদয়,—কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি
? কে জানে? তাদের খবর তাই নিতে সাহস হয় না পিসী।

মনোরমা বলে ওঠেন,—না, না। যেখানেই থাকুক, বাছারা বেঁচে থাকুক।
খ থাকুক। তুই বাছা একটা কাজ-কম্ম দেখ। আবার সাজানো ঘর…

হাসে উদয়,—ঘর! বৌ-ছেলে!…আমাদের সবকিছু!

কেমন যেন মাথা গরম হয়ে ওঠে উদয়ের। এ কল্পনা, এ আশা, সে-ও
রছিল আগে। তাদের জন্য ঘুরেছে। পথে-ঘাটে অনেক এমন সুখী
রিবারকেও দেখেছে, হিংসায় জ্বলে উঠেছে মন। সব ভুলতে চেয়েছে নেশায়
কণ্ঠ ডুবে গিয়ে। এমনি করে পথ খুঁজতে গিয়ে আরও পথ হারিয়েছে।

চিৎকার করে ওঠে,—চুপ করো, চুপ করো পিসী!

পকেট থেকে ছোট বোতল বের করে গিলতে থাকে। ও সবকিছুই ভুলতে
সে।

সারা মনের ব্যাকুল যন্ত্রণাটাকে ওই মদের নেশায় সে ভুলতে চায়। সব
থ্যা হয়ে গেছে তার কাছে। ভাবতে চায় সে, তার কিছুই নেই, কোনদিন
লও না কোনকালে।

মনোরমা দেখছেন উদয়ের ওই কাণ্ডটা। আজ উদয় সবকিছুর সীমা-
লীনতা হারিয়েছে।

মনোরমা বলেন,—এতেই সব গেছে উদয়, ওই পাপেই সব গেল!

লক্ষ্মীছাড়া উদয়ের ওসব কোনদিকে খেয়াল নেই। নিজের স্বপ্নে সে
ভোর হয়ে যায়।

সেই অতীতের সুর-মুখর বাগানবাড়ি, বাঈজীর গানের কথা মনে পড়ে মদের নেশায় সে সেই জগতে ফিরে যায়।

কার ডাকে সে চোখ মেলে চাইল। দলের লোক এসেছে। পদ্মনাথকে পাঠিয়েছে অধিকারী।

—একটা বায়না আছে ওস্তাদ। অধিকারীমশায় বললেন, আজ একপালা বাজিয়ে দাও। তোমার বাজনা না হলে আসর জমে না। যা রাগ বাজাও।

—বাজাব! হাসছে উদয়।

—শালা অধিকারীকে বলগে, আমার বাগানবাড়িতেই কত আচ্ছা বাঈজীকে বসিয়ে রাতের পর রাত মাইফেল দিয়েছি। আজ দশটা টাকার জন্য রাতভোর ছড় টানতে হবে! ভাগো হিঁয়াসে! শ্যাম সিং, রাম ভজন, শালাকো নিকাল দেও! কেওয়াড়ি বন্ধ করো!

গর্জন করছে আগেকার সেই তরুণ উদয় নেশার ঘোরে।

—ওস্তাদ! ওই গর্জনে চমকে উঠেছে পদ্মনাথ।

—অ্যাঁ। চমকে উঠেছে উদয়। মনে হয় সে-যুগ অনেক আগেই হারিয়ে গেছে।

একটা বোতল আর পাঁচটা টাকা নামিয়ে দেয় পদ্মনাথ চুপিচুপি।

—বাকি দেবে গাওনার আসরে। মাইরী! অধিকারীমশায় বলে, উদয়বাবুর বেউলো না হলে আসর ফাঁকা লাগে। টাকা আগাম দেবে গো!

—বলছিস?···ঠিক আছে! উদয় মদ দেখেই ভুলেছে, টাকাটা যেন তুচ্ছ।

বেহালাটা বের করে বাজাতে থাকে উদয়। লোকটা মাথা নাড়ে।

—ওস্তাদ! পদ্মনাথ ওকে ডাকছে মুগ্ধস্বরে।

সুরের রাজ্যে যেন ডুবে গেছে উদয়। ওর কথায় মাথা তুলে চাইল মাত্র।

—কি?

—এমনি বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে এ-জিনিস নষ্ট করো না মাইরী!

—তবে?

পদ্মনাথ বলে ওঠে,—থিতু হও ওস্তাদ! এ সাধনার জিনিস। ঘর-সংসার করো, থিতু হও। এমন জিনিস ওই মদের নেশায় ঘুচিয়ো না। কত ঘুচোবে?

লাফ দিয়ে ওঠে উদয়, যেন লোকটা ওর মুখের ওপব চাবুক কষেছে। চিৎকার করে ওঠে,—নিকালো শালা, আভি নিকালো! থিতু হও, ঘর-সংসার

।! বেইমানি! বেইমানের ভিড়ে দুনিয়া ভরে গেছে। নিকালো! পদ্মনাথ
রে গেল। অবাক হয়েছে সে। মনোরমা এসে পড়েন।

—কি হয়েছে?

তখনও গজরাচ্ছে উদয়,—থিতু হও! ঘর-সংসার করো! ঘরের কি জ্বালা
! কি বুঝবি পদ্ম! শালা তুই ঘর বেঁধেছিস কখনও যে বুঝবি?

মনোরমা চুপ করে চেয়ে থাকেন ওর দিকে। উদয়ের বুকের জ্বালার দীপ্তি
র দুচোখের চাহনিতে ফুটে ওঠে।

স্কুলের ঘণ্টা বাজছে। মিষ্টি রোদ শিরীষ-বটগাছের পাতায় সজীব প্রাণ-
াঞ্চল্য এনেছে—হাওয়া কাঁপছে পাতায়। স্কুলের ফটকের সামনে ছেলেরা
ভিড় করেছে। কলরবে ভরে ওঠে সবুজ মাঠটা। শান্তনু চুপ করে দাঁড়িয়ে
াছে একপাশে। বাড়ির গাড়ি এসে ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়।

মা-ও এখন সব দিন আসে না। মা নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত।
কমন যেন দূরে সরে গেছে মা। আজ শান্তনু একাই সেই কথাগুলো মাঝে
াঝে ভাবে। মনের সেই শূন্যতার মাঝে তাই একটা ছবি তার বড় হয়ে
উঠে। একদিক থেকে তার কোন স্বাদই পায়নি সে।

কালো গাড়ি থেকে কে ডাকছে তাকে,—শান্তনু!

দীপঙ্কর নামছে। ওর বাবা ওকে রোজ পৌঁছে দিতে আসেন। সৌম্য
চহারার মানুষটি। দীপঙ্কর ওর বাবাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে দৌড়ল
শান্তনুর দিকে। বোধহয় বাবার কাছ থেকে পাওয়া কিছু উপহার দেখাবার
ন্য।

প্রমথও ছবির বইটা আনে। ওর বাবা কলকাতা থেকে এনে দিয়েছেন।
শান্তনুর মনে মনে ওই অভাবটাই বোধ হয়।

দীপঙ্কর বলে,—তোর বাবা আসেন না?

শান্তনু জবাব দিল না। ক্লাশের দিকে এগিয়ে যায়। দুচোখ ফেটে জল
ামে। ক্লাশে ঢোকার মত সাধ্য নেই। ছাতিমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে
অসহায় একটি শিশু। এতবড় পৃথিবীতে সে যেন একা—হারিয়ে গেছে সবকিছু
তার।

ঘণ্টা বাজছে। ক্লাস সুরু হয়েছে। শান্তনু এগিয়ে গেল।

সুমিতার মনে আজ নিজের জীবনের ভবিষ্যতও একটা প্রশ্ন হয়ে উঠেছে পড়া সুরু করেছিল। ক্রমশঃ সেই পড়ার রাজ্যে ঢুকে মনের সেই নিঃস্বতাকে ভুলেছে। হাসপাতালেও যায় মাঝে মাঝে প্রায় বিকেলে, ট্রেনিং-এর জন্য।

প্রশান্ত মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্র ছিল। ডাঃ বোসের কথায় সে-ও সুমিতাকে মাঝে মাঝে পড়াশোনা দেখিয়ে দিতে আসে। সে-ও দেখেছে ওই মেয়েটির মনের জোর, ওর বুদ্ধিমত্তা। সব বিষয়েই ওর নিষ্ঠা আর আগ্রহ। তাই পড়াতেও ভাল লাগে তার।

সুমিতা ক-বছর ধরে পড়ছে। এইবার ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে হবে। এখন তার জীবন-মরণ সমস্যা! এ পরীক্ষায় তাকে পাশ করতেই হবে। বলে সে ভয় জড়ানো কণ্ঠে প্রশান্তকে,—কি হবে জানি না। ভয় করছে কিন্তু!

হাসে প্রশান্ত,—ঠিক ভালোভাবেই পাশ করবে তুমি।

সুমিতা বলে,—পাশ করার বরাত আমার নয়। জীবনের অনেক পরীক্ষায় ফেল করেছি কিনা, তাই ভয় হয়!

প্রশান্ত ওর দিকে চাইল। ক-বছর ধরে দেখছে মেয়েটিকে।

কোথায় ওর মনের অতলে কি গভীর বেদনা লুকিয়ে রয়েছে।

প্রশান্তর মনে ওর স্তব্ধ বেদনাহত মূর্তিটা কি একটা সকরুণ নীরব কান্নার আভাষ এনেছে।

ওর সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছে ডাঃ বোসের কাছে। সুমিতার কাছে এসব কথা সে পাড়েনি। কিন্তু ক্রমশঃ মনে হয়েছে, সুমিতাকে এই সময়ের মধ্যে সে চিনেছে। তার মনেও কোথায় ওই মেয়েটির জন্য একটু কোমলতা রয়ে গেছে।

—সুমিতা!

বিকেলের মিষ্টি আলো নেমেছে। সুমিতা ওর ডাকে ফিরে চাইল। মনে হয় নিজের জীবনের সেই অসীম শূন্যতার বেদনাটা আজ সে প্রকাশ করে ফেলেছে ওই মানুষটির কাছে। এটা সে চায়নি।

সুমিতা সহজ হবার চেষ্টা করে।

—মেডিসিনের চ্যাপ্‌টারটা আজ পড়ে রাখবো।

সুমিতা উঠে পড়ল। প্রশান্তকে সে এড়িয়ে যেতে চায়। মনের দিক থেকে কোন স্পর্শকেই সে আমল দিতে চায় না।

প্রশান্ত চলে গেছে। হাসপাতালে সন্ধ্যার পর তার ডিউটি আছে। কলের রোদটা গঙ্গার ধারে বাবলাবনের মাথায় সবুজ—হলুদ খুশির আভাষ নছে।

সুমিতা নিজের মনের এই দুর্বলতায় নিজেই চমকে উঠেছে।

তবু ভাল লাগে। অতীতের সেই একটি মানুষের স্মৃতি তার কাছে আজ বর্ণম্লান হয়ে গেছে। সে কোন যন্ত্রণার স্মৃতি। ব্যর্থ সেই জীবনের বোঝা এতোগুলো বছর সে এসেছে। দুঃসহ হয়ে উঠেছিল জীবন।

তবু এখানে এসে সে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। বাঁচার আশ্বাস পেয়েছে। াস্তকেও তার মনের সামনে আজ দাঁড় করিয়ে এই ক্ষীণ সত্যটাকে অস্বীকার তে পারে না। তার শূন্য ব্যর্থ মন কোথায় যেন কি বিচিত্র স্বপ্ন রচনা ছিল।

পাশ করতেই হবে তাকে। ওসব কথা ভাববার অবকাশ নেই।

পাখিগুলো ডাকছে। তবু মনে হয় কোথায় এখনও সুর আছে, মাধুর্য াছে।

হঠাৎ মনের এই খুশিটুকর কারণ অনুমান করতে পারে না সুমিতা। ছনের সব ভুলে তাই আবার নতুন করে বাঁচতে চায় একটি ব্যর্থ নারী অন্য ান পরিচয়ে।

—মা! মা-মণি!

শান্তনুর ডাকে চমকে ওঠে সুমিতা। অন্য কোন্ জগতে সে ভেসে লছিল এতক্ষণ, কি কল্পনার রঙীন স্রোতে। ওই ডাকে চমকে উঠে সে ফিরে াসে এই পৃথিবীর বুকে। ছেলেকে কাছে টেনে নেয়।

—বাপি, স্কুল ছুটি হয়ে গেল?

শান্তনুর মুখে আজ বেদনার কালোছায়া। মায়ের ওই আদরে অন্যদিন খুশিতে ভরে উঠত। আজ মুখ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওপাশে।

সুমিতা ছেলের ব্যবহারে অবাক হয়।

—শান্তনু ওর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে স্থিরকণ্ঠে,—আমার বাবা কোথায় মা? আমাকে দেখতে আসেন না কেন?

চমকে ওঠে সুমিতা। এতদিন এই কথাটা ভাবেনি সে। ভেবেছিল, তার কেটে যাবে কোন জবাব না দিয়েই। কিন্তু আজ শান্তনুই সেই প্রশ্ন সে অনুযোগ করে আজ,—দীপঙ্করের বাবা কত খেলনা কিনে দেন,

নিজে গাড়িতে করে এসে পৌঁছে দিয়ে যান, প্রমথর বাবা ওর জন্য কলকাতা থেকে কত বই এনে দেন—

সুমিতা যেন বিচারকের সামনে দাঁড়িয়েছে। আজ মনে হয় সে-ও অপরাধী। কোথায় তার মনে একটা অন্য সুর উঠেছিল। ভুলতে চেয়েছিল অতীতের সেই দিনগুলোকে।

শান্তনুই সেই কথাটাকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

সুমিতা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,—তোমার বাবাও আসবেন। অনেক দূরে আছেন কিনা তাই আসতে পারেননি। তোমার বাবাও মস্ত-লোক ছিলেন—বড় বাড়ি, জমিদারী, কত লোকজন!

সুমিতা ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে মনের সেই আবেগটাকে থামাবার চেষ্টা করে। সে-ও মানুষটিকে ভোলেনি। আজ ছেলের কাছে তার মনের অপরিসীম দৈন্যটা বড় হয়ে ওঠে। নিজেকে চাপতে পারে না। কাঁদছে অসহায় একটি নারী।

অতীত আর বর্তমান দুটোর মাঝে মিল নেই। তবু সেই বোঝা আর বেদনাকে এড়িয়ে বাঁচার পথও নেই সুমিতার। কোথায় সে হেরে গেছে বার বার সেই কথাটাই মনে পড়ে।

একটি মানুষের কাছে এই হার মানাটা বড় হয়ে ফুটে ওঠে। তিনি ডাঃ বোস।

বৃদ্ধ সদানন্দময় মানুষটি দেখেছেন সুমিতাকে। সে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজের ঠাঁই করে নিতে চেষ্টা করছে।

বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে।

তার জীবনে অপরিসীম শূন্যতার কথাও জানতেন তিনি।

প্রশান্ত এখানে আসে। সুমিতার সঙ্গে মিশেছে সে-ও। সুমিতার মনের অতলে সেই ক্ষীণ সুরটা তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায়নি।

তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বলতেও চাননি। ওরা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনায় ওদের পথ ঠিক করে নিক্—তাই চেয়েছিলেন।

আজ সুমিতাকে শান্তনুর সামনে ওই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে দেখে মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন তিনি।

সুমিতার চোখে জল।…ডাঃ বোস সরে গেলেন।

বাগানে অন্ধকার নেমেছে। নদীর বালুচরে কোথায় একক একটা পাখি

প্রশান্ত তাকে স্বীকৃতি দিতে চায়।

হাসপাতাল সেরে বিকেলে দু-একটা রোগী দেখে প্রশান্ত বের হয়েছে। সন্ধ্যার ফিকে আঁধার নেমেছে গাছ-গাছালির মাথায়। অন্ধকারে দু-একটা তারা জ্বলছে।

স্তব্ধ শান্ত একটি পরিবেশ।

প্রশান্ত আজ তৈরি হয়েছে মনে মনে। তার মনে হয় সুমিতাও নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছে সবকিছু থেকে। এ তার আত্মনিগ্রহই।

এর স্বপথে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। বেদনাময় অতীতকে মন থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেলে আবার নতুন করে বাঁচার দাবি তার নিশ্চয়ই আছে।

এতদিন পড়া আর পড়া। তার ফাঁকে বাড়ির কাজ-কম্মো করেছে। কোথাও মুক্তির আশ্বাস ছিল না সুমিতার মনে। তাই সন্ধ্যায় প্রশান্তর সঙ্গে বের হয়েছে একটু।

প্রশান্ত আর সে চলেছে। বাবলা ফুলের গন্ধ মেশা ভারি বাতাস গঙ্গার জল ছুঁয়ে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

দেহমনে একটি নীরব প্রশান্তির আভাষ আনে।

সন্ধ্যার অবস্থা অন্ধকারে নামে রূপালী বালুচরে। ছায়াকালো বনভূমির নিচে মধুর একটি স্নিগ্ধতা ভরে আছে আজ। প্রশান্ত আর সুমিতা দুজনে ফিরছে বাড়ির দিকে।

নির্জন ছায়াঘন নদীতীরে পাখিগুলো ডেকে ফেরে। প্রশান্ত দেখছে সুমিতার মাঝে নিজের জীবনের একটা প্রতিচ্ছবি। ওকে ডাকছে প্রশান্ত,—সুমিতা!

সুমিতা অবাক হয় ওর ডাকে। সারা মনে ওর ঝড় ঘনিয়ে আসে। অনেক ভেবেছে সে। দেখেছে শূন্য জীবনের কোথাও তার কোন অমৃত-সঞ্চয় নেই। সে-ও যদি আবার নতুন করে বাঁচতে চায় কি তার অপরাধ?

কিন্তু কথাটা কল্পনা করতে পারে না সুমিতা। তার পক্ষে এ সম্ভব নয়। প্রশান্ত বলে চলেছে,—তোমার জীবনের সব কালো দাগগুলোই জানি। তার জন্য তুমি দায়ী নও, সুমিতা। তাই সেগুলো পেছনে ফেলে নতুন করে বাঁচতে পারো না?

—তবু আমি বিবাহিতা ডাঃ মুখার্জী? স্বামী—

হাসে প্রশান্ত,—এতদিন সে কোন খবর নেয়নি। স্ত্রী আর ছেলেকে যে

নিশ্চিত মৃত্যু আর অনাহারের মাঝে ফেলে চলে যায়, তার স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকা
আছে নিজের দাবিতে বাঁচার। ওই পরিচয়ের গ্লানি মুছে ফেলে আবার ঘ
বাঁধার।

সুমিতা ওই অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। দু-একটা তারা ফুটে
উঠেছে। অতল আঁধারে কোথাও কোন নিশানা নেই। সব জ্ঞানটুকু নিঃশেষে
ডুবে গেছে। এ তার মনের অতলের সেই কামনার কান্না। ব্যর্থ কান্না
তবু সুমিতার চোখে জল নামে। অস্ফুটকণ্ঠে বলে,—না, না।—এ সম্ভব
নয়।

কোথায় একটা বেহালার করুণ সুর ওঠে। নীরব মনের কান্নার মত ওই
সুর শুনে থমকে দাঁড়াল সুমিতা।

প্রশান্ত ওর দিকে চেয়ে থাকে। সুমিতা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলবে
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরছে তারা। দুজনের চোখে-মুখে সেই প্রশ্ন।

রাস্তার ধারে বটগাছটার নিচে এমনিই আঁধার জমাট বেঁধে আছে।
অতীতে কবে কে জায়গাটা বাঁধিয়ে দিয়েছিল, আজ সেটা ফেটে গেছে
রাস্তার ধারেই গাছটার নিচ থেকে শুরু হয়েছে গঙ্গার চরভূমি। ওখানে আলো
নেই, আবছা অন্ধকার।

সুমিতা আর প্রশান্ত উঠে আসছে। বেহালার সুরটা ওঠে। সুমিতার
মনে ওর অনুরণন। কে যেন বেহালা বাজাচ্ছে ওইখানে বসে।

লোকটাকে ঠাওর হয় না। সুরটা উঠছে। ওরা দুজনে রাস্তার আলোর
নিচ দিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে সুরটা থেমে যায়।

সুমিতা আর প্রশান্ত দাঁড়াল না। ওরা এগিয়ে গেল।

উদয় কি খেয়ালবশেই বাজাচ্ছিল ওখানে বসে। মাঝে মাঝে সে পালিয়ে
আসে নির্জনে।

এমনি একা একা নিজেকে ফিরে পেতে চায়। বাজাচ্ছিল বহুদিন আগেকার
হীরা বাঈজীর কাছে তোলা ঠুংরীর ধুণ। কোন বিরহী প্রিয়ার কান্নার মত
সেই সুরটা আকাশকে কি বেদনায় সকরুণ করে তোলে।

এই সুরের সঙ্গে মিশে আছে উদয়ের অতীতের সেই দিনগুলোর স্মৃতি।
বাগানবাড়ির আনন্দ-মুখর সেই পরিবেশ। প্রাচুর্যের স্বপ্নমাখা দিন। সেদিন
উদয় ছিল পূর্ণ। মুঠো মুঠো করে সে সেদিন ছড়িয়েছে তার অর্থ-সম্পদ, প্রাণ-
প্রাচুর্য।

আজ এই চরম নিঃস্বতার মাঝে একান্তে বসে সেই দিনগুলোর অনুভূতি ফিরে পায় ওই ঠুংরীর সুরে সুরে।

আর একজনের কথাও মনে পড়ে। সলজ্জ অবগুণ্ঠনবতী একটি নারী। কপালে সিন্দুরের টিপ—সীমন্তে সিন্দুর রেখা। পরনে লাল ঢাকাই শাড়ি।

সব কোন্ দিকে হারিয়ে গেল কোন এক রাতের দেখা স্বপ্নের মত কোন্ শূন্যে।

উদয় বাজাচ্ছে আনমনে। অন্ধকারে সেই সুরের বেদনাময় আবেশে ডুবে যায় সে। হঠাৎ সামনের দিকে চেয়েই চমকে ওঠে। সারা দেহ-মনে কি বিচিত্র শিহরণ জাগে। এতকাল ধরে যাকে খুঁজেছে পথে পথে, দেশে দেশে, সেই সুমিতাই তার সামনে! ওর সুন্দর মুখে পড়েছে একফালি আলো। সেই মুখ —আয়ত দুচোখ, ও তার চেনা। উদয়ের সব খোঁজার যেন শেষ হয়েছে আজ।

ডাকতে যাবে। থামলো। সুমিতা একা নয়। ওর সঙ্গে রয়েছে আর একটি যুবক। সুন্দর দীর্ঘ চেহারা। পরনে দামী স্যুট। সুমিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে কি কথা বলতে বলতে চলেছে। সুমিতা আজ বদলে গেছে। ওর মনের পর্দা থেকে উদয়ের সব ছবি মুছে গেছে নিঃশেষে।

মনে রাখার মত কোন স্মৃতিই বোধহয় সুমিতার নেই। সেই নিষ্ঠুর অপমানের দিনগুলো ভুলে আজ নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে সে। সেই জগতে উদয় আজ বেঁচে নেই। তার অপমৃত্যু—অবলুপ্তি ঘটেছে অনেক দিন আগেই।

সহজ সাবলীল গতিতে ওরা চলেছে। হাসছে সুমিতা। মিষ্টি হাসি।

চিৎকার করে ডাকতে যাবে উদয়, হঠাৎ বেহালা ফেলে দিয়ে দুহাতে নিজের কণ্ঠনালীটাই নিজে টিপে ধরল উন্মাদের মত। দম বন্ধ হয়ে আসছে। না, মরতে সে পারছে না। বাহ্যিক মৃত্যুর যন্ত্রণা তাকে স্তব্ধ করে দেয়।

হাত দুটো ছেড়ে দিল। হাঁফাচ্ছে কুকুরের মত উদয়। ভীরু—বিস্মৃত একটি মানুষ।

হঠাৎ বেহালা তুলে নিয়ে বিপরীত দিকে অন্ধকারে ছুটছে সে ভীত-ত্রস্ত জানোয়ারের মত। ওদের থেকে অনেক দূরে। তবু পালাতে পারে না। থমকে দাঁড়াল। দেখবার চেষ্টা করে ওদের দুজনকে।

অন্ধকারে ওই দুজনকে আর দেখা যায় না। তারা হারিয়ে গেছে। উদয় টলতে টলতে চলেছে। নিষ্ঠুর অতীতের কঠিনতম আঘাতটা আজ তাকে উন্মাদ করে তুলেছে।

সুমিতা আজ মনের অতলে নীরব একটা ঝড়ের সন্ধান পেয়েছে
ঘোস তখনও ফেরেননি। হাসপাতালে একটা জরুরী কেসে আটকে রয়ে

শান্তনু ঘুমিয়ে পড়েছে।

আজ মনে হয় সুমিতার, সে যেন অন্যের সব কথা ভুলে গিয়ে স্বা
মত নিজের কথাটাই ভেবেছে। কি এক নেশার ঘোরে বিবশ হয়ে গেছে

প্রশান্তর ডাকে মুখ তুলে চাইল সুমিতা। বাড়ির কাছে এসে গেছে তা

—সুমিতা! প্রশান্ত তার আবেদনের সাড়া ফিরে পেতে চায়।

সুমিতা অসহায় কণ্ঠে বলে ওঠে,—রাত হয়েছে, আপনি আসুন!
সারা শরীর কাঁপছে দুঃসহ বেদনায়।

প্রশান্ত চলে গেল। ও যেন বুঝেছে ওর মনের এই অবস্থার কথা।
আবেগ আর নীরব যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে সুমিতা। শান্তনু। ওই তার এক
অবলম্বন আজ। ঘুমন্ত ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বেদনায় আতঙ্কে কাঁদছে অস
একটি নারী। সুমিতা আজ কাঁদে।

মনোরমা জীর্ণ ঘরের দাওয়ায় বসে মালা জপছেন। ঝিমুনি আসে। হ
রাতের আবছা অন্ধকারে উদয়কে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক
দেখে ফিরে চাইলেন। ও যেন ভয়ে পালিয়ে এসেছে তাড়া-খাওয়া প্র
মত।

মনোরমার সংসারের অবস্থা আজ দেখেই বোঝা যায় কতখানি
নেমেছে। উনুন জ্বলেনি, দড়ির আলনায় দু-একখানা থানধুতি আর
ঝুলছে। তাও ছেঁড়া। বাইরের জ্বালা ওঁর মনের কোমলতাকেও কঠিন
তুলেছে।

—আসা হল? তা, চুরি-ডাকাতি করে এসেছিস, না মদ খেয়ে মা
হয়ে ঢুকেছিস? কি হল তোর?

উদয় কথা কইল না। দাওয়ায় বসে হাঁপাচ্ছে। মনোরমা বলে ও
—এদিকে ঘরে যে হাঁড়ি চড়বে না, রুজি-রোজগারও ছেড়ে দিলি···চলবে
করে? চিরকাল কি একভাবেই থাকবি তুই উদয়?

উদয় জবাব দিল না। তখনও তার চোখের সামনে সেই নিষ্ঠুর ছ
ভাসছে। একদিন সেই-ই তাড়িয়ে দিয়েছিল সুমিতাকে। তার কঠিন আ

কদেছিল—মাথা খুঁড়েছিল সুস্মিতা। আজ সেই চরম বেদনার কিছুটা অনুভব করতে পারে সে।

উদয় বেদনাহত দৃষ্টি মেলে চাইল। বিড় বিড় করে বলে,—চলতেই হবে, না? এরপরও বাঁচতে সাধ যায় পিসী? রাজ্য হারিয়ে, সব হারিয়ে এই ভাঙ্গাঘরে এখনও বাঁচতে বলো? কিসের জন্যে বাঁচব বলতে পারো পিসী?

আর্তনাদ করে ওঠে উদয়।

ওর বেদনাহত কণ্ঠস্বরে মনোরমা চমকে ওঠেন।

উদয় বলে,—মদ খাইনি পিসী। সাদাচোখেই দেখলাম চোখের সামনে দিয়ে আমার সব ফুরিয়ে গেল। এই কঠিন ছুনিয়া সব ছিনিয়ে নিয়েছে। এখানে বাঁচার আর দরকার কি বলতে পারো? আজ আমি ফুরিয়ে গেছি।

কাশছে উদয়। জীর্ণ দেহটা কাশির ধমকে কেঁপে ওঠে। চোখ দিয়ে জল বের হয়।

—উদয়! মনোরমা এগিয়ে আসেন।

উদয় সামলে নিয়ে বলে চলেছে,—এতদিন নিয়তিকে বিশ্বাস করিনি পিসী। আজ মনে হয় সবই সেই নিয়তির বিধান। ললাট-পটের কালের লেখা—

বেহালায় ছড় টেনে করুণ সুরটা বের করে। অন্ধকারে মনে হয় কে যেন করুণ হতাশভরা সুরে কাঁদছে।

আমি কখন ভাঙি কখন গড়ি,
নাইকো ঠিকানা।
ফিরি সাথে সাথে কি বিপথে,
চিরদিন অজানা অচেনা॥

ওই কান্নার রেশ যেন আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

কথাটা ভাবছে সুস্মিতা। প্রশান্ত তার মনে ঝড় তুলেছে।

অন্ধকার ঘরটা। জানলা দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছে ঘরে। প্রশান্ত শুয়েছিল। মায়ের কান্না শুনে সে জেগে উঠেছে।

সুস্মিতা আজ একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। আজ বর্তমানে কোন পথ-নির্দেশ সে পেতে চায়।

স্মিতা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। এসব অতীতের সেই স্মৃ
সম্পদ, জীবনের এতটুকু অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় আজ সে হারাতে চায় না। হারাব
ভয়ে অসহায় ভীত-ত্রস্ত একটি না ী ব্যাকুল কাঁদনে অন্ধকার ভরে তুলেছে।

ডাঃ বোস বারান্দায় এগিয়ে আসছিলেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে
তিনি।

ওঁর মুখে পাইপটা জলছে ম্লান লালাভ আভায়। স্তব্ধ মুখে ফুটে উঠে
বেদনার ছায়া। গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন দূর অন্ধকার আকাশের দি
মুখ তুলে। ওই তারার ভাষায় কি খুঁজছেন দূর-দিগন্তের অসীমে।

পৃথিবীর সবখানেই যেন এমনি বেদনার সঞ্চয় রয়ে গেছে। মানুষ
প্রতিনিয়তই এই বেদনা সয়ে সয়ে পথ কেটে কেটে যেতে হয়। এ থেকে তা
নিষ্কৃতি নেই, মুক্তি নেই। তাই ওরা কাঁদে। তিনি একজন মুক্তপুরুষ, তিনি
বেদনা বোধ করেন।

উদয় আজ রুগ্ন, শীর্ণ। রাত জেগে আসরে আর বাজাতে পারে না
রোজগারও নেই। এতদিনের অত্যাচারে তার সারা দেহে এসেছে ব্যাধির
প্রকোপ।

তবু বাঁচতে হবে। তাই বের হতে হয়েছে তাকে। জীর্ণ দেহ কাশির
আবেগে কেঁপে ওঠে। পরনের জামা-কাপড়টা ময়লা, জীর্ণ। মুখের দাড়ি
বেড়েই চলেছে অযত্নে। ও যেন একটা মানুষের ধ্বংসস্তূপ। বর্তমান নেই।
শুধু অতীতের পথ চেয়ে চলেছে, ভবিষ্যতও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

চেহারাও শীর্ণ—সেই সুন্দর মানুষটি কঠিন আঘাতে আজ কুৎসিত। স্বাস্থ্যও
ফুরিয়ে গেছে। তবু নেহাৎ বাঁচার তাগিদেই বেহালা নিয়ে বের হয়। শহরের
অনেকেই ওর মুখ চেনে। বেহালার হাতও মিষ্টি। কোর্টের ধারে, কলেজের
বাইরে, এখানে-ওখানে বসে বেহালা বাজায়। কেউ দু-চার আনা পয়সা দেয়
দয়া করে। লোকজনের ভিড় লেগেই থাকে। ছায়াঘন রেইনট্রি গাছের নিচে
বসে বেহালা বাজায়। যা পায় তাতেই খুশি থাকে।

রেস্তোরাঁয় উকিল-মোক্তার-মক্কেলের ভিড় জমে। ওকে দেখে কে পকেট
থেকে পয়সা বের করে এগিয়ে দেয়। হাসে উদয়। চটে উঠতে গিয়েও পারে
না। বলে,—ভিক্ষে নিই না। বাজনা শুনিয়ে পয়সা নিই।

পয়সা ফেলে রেখেই চলে গেল অতীতের রূপপুরের যুবরাজ উদয়নারায়ণ ধুরী।

পথের শেষ নেই। উদয় আজ সেই পথেই ঘোরে। বিকেলের আলো দ্র হবার আগে স্কুলের ফটকে এসে দাঁড়ায়। ঘণ্টা বাজে। ক্লান্ত উদয় একটা াছের নিচে বসেছে।

অলস অপরাহ্নে ওই ঘণ্টার সুর শুনে মনে হয় তাদের বাড়ির দেউড়িতে ণ্টা বাজছে। কেমন যেন তন্দ্রামত এসেছিল। ধড়মড়িয়ে উঠে চোখ খোলে।

হঠাৎ কাকে দেখে একটু হকচকিয়ে যায়। একটি সুন্দর ছেলে দাঁড়িয়ে মাছে। যেন পথ হারিয়ে গেছে। ওকে দেখে মনে হয় খুব চেনা। দুচোখের ওই চাহনি, ওই মুখের আদল তার চেনা। উদয় বলে,—পথ হারিয়ে গেছো খোকা? চলো, তোমায় পৌছে দিই।

ওর সঙ্গেই চলেছে শান্তনু। আজ বাড়ি থেকে গাড়ি আসেনি, একাই বের য়ে পড়েছে পথে।

শান্তনুর কেমন ভাল লাগে লোকটাকে। বেহালার সুর তোলে। উদয় ছোট্ট ওই শ্রোতাটিকে পেয়ে বেহালা শোনায়।

—ভাল বাজাতে পার তো তুমি!

শান্তনু অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। হাসে উদয়।

কথার তুবড়ি ছোটে শান্তনুর,—জানো আমার বাবা মস্ত জমিদার। আর ডাক্তার দাদু আমাকে খুব ভালোবাসেন। আমার বাবাও ভালো বেহালা বাজাতে পারেন।

—তাই নাকি? তোমার বাবার নাম কি? উদয় প্রশ্ন করে হাল্‌কা স্বরে।

শান্তনু জবাব দেয়,—শ্রীউদয়নারায়ণ চৌধুরী।

উদয় চমকে ওঠে। সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। ওর হাতটা অকারণেই জোর করে ধরে ফেলে সে। শান্তনু অবাক হয় লোকটাকে বদলে যেতে দেখে।

—তুমি তাকে চেনো? শান্তনুর কণ্ঠে ব্যাকুল সুর। সে-ও খুঁজছে এক-জনকে।

হাঁপাচ্ছে উদয়। কাশিটা যেন বুক ঠেলে আসে। দম বন্ধ হয়ে যায়। কোনরকমে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল উদয়। সারা গা ঘেমে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,—না, তিনি মস্ত জমিদার, আমি তো পথের মানুষ। তাঁকে চিনবো কি করে?

—অ! ক্ষুণ্ণ হয় শান্তনু।

বাড়ির কাছে এসে গেছে তারা। বাগানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। চমকে ওঠে উদয় দূর থেকে তাকে দেখে।

সেই চেনামুখ। বিকেলের আলোয় আরও সুন্দর দেখায় সুমিতাকে। এ যেন অন্য কোনজন। অধরা দূর আকাশের কোন তারার উজ্জ্বল আলোক-স্বপ্ন। থমকে সরে দাঁড়াল সে গাছের ওপাশে। উদয় নিজেকে দেখাতে চায় না।

—যাবে না? শান্তনু ওকে ডাক দেয়,—চলো আমাদের বাড়িতে?

ওই আলোক-সুন্দর জীবনে তার কোন ঠাঁই নেই। ওখানে সে কোন অশুভ গ্রহ। তার ছায়া পড়লে ওদের জীবনের আনন্দ নিঃশেষ হয়ে যাবে।

—না। তুমি যাও।

কোনরকমে সরে গেল উদয়। পালাচ্ছে সে। ওই দেওয়ারের বাবলাবনের আড়ালে সরে গেল। এখনও ওর হাতে শান্তনুর স্পর্শ। কি বিচিত্র সেই অনুভূতি। উদয়ের সামনে আজ হঠাৎ যেন পৃথিবীর রূপ বদলে গেছে এতদিন সে খুঁজেছে। আজ সর্বস্ব খুঁজে পেয়েছে সে। ওই তার স্ত্রী—ওই ফুলের মত সুন্দর তার সন্তান। রায়পুরের চৌধুরী বংশের বংশধর।

দেখেছে সে ওই সুন্দর শিশুটির মনে তার বাবার প্রতি কি শ্রদ্ধা আগ্রহ সে-ও খুঁজছে তার বাবাকে। উদয়ের শূন্য বুক কি পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। জীবনের সব ভুল শুধরে আজ আবার নতুন করে বাঁচতে চায় সে।

আবেশে দুচোখ বুজে আসে।

আজ মনে হয় এ জীবন অনেক সুন্দর। পাখিডাকা ওই দিগন্তের আলো তাকে বাঁচার আশ্বাস নিয়ে ডাক দেয়। বাড়ির দিকে ছুটে চলে উদয় আলো-ভরা মন নিয়ে। আশ্বাসে ভরে উঠেছে তার শূন্য বুক।

মনোরমা ওকে ঢুকতে দেখে অবাক হন,—কি রে? কি হল তোর?

উদয় আজ খুশিতে ফেটে পড়ে। জীবনের সব গ্লানি আর কালো দাগগুলো মুছে ফেলে সে আবার বাঁচবে। ঘরের ভেতরে চারপাইয়ের নিচে জমানো ক'টা মদের বোতল টেনে বের করে উঠোনের দিকে ছুঁড়ে দেয়। সশব্দে ফেটে যায় বোতলগুলো। আবার সুস্থ হতে চায় সে। বাঁচতে চায়।

—হল কি তোর? কি করছিস? মনোরমা অবাক হন।

হাসে উদয়। খুশিভরা কণ্ঠে বলে,—জঞ্জাল সাফ করছি পিসী—ঘরের,

ীবনের সব জঞ্জাল। তুমি বলেছিলে না, আবার বাঁচতে হবে? তাই বাঁচব, াবার মানুষের মত বাঁচব পিসী। সব আমার ফুরিয়ে যায়নি। আবার সব িরে পাব। সব কিছু। ওরা আছে—বেঁচে আছে। ভালো আছে—

হঠাৎ প্রবল কাশির ধমকে জীর্ণ দেহটা প্রচণ্ড বেগে কেঁপে ওঠে। কোন-কমে খুঁটি ধরে সামলাবার চেষ্টা করে।

চমকে ওঠে উদয়। হাত দিয়ে মুখটা টিপে ধরে ফেলে, কিন্তু তাতেও বাধা ানে না। তাজা উষ্ণ রক্ত পড়ছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে। আর্তনাদ করে ওঠে দয়। কাঁপছে ওর সারা শরীর। মনোরমা ছুটে এসে ওকে ধরে ফেলেন।

—উদয়! ওরে, একি সর্বনাশ করলি বাবা?

উদয় এই প্রচণ্ড ধাক্কাটাকে সামলে নিয়েছে। সহজভাবেই বলে ওঠে,— ও কিছু নয় পিসী। ও ঠিক হয়ে যাবে।

—এ যে রক্ত! নিজেকে শেষ করেছিস তুই এতদিন এমনি করে বাবা?

হাসে উদয়, মলিন বিষণ্ন হাসি। বলে সে,—আজ সব পাবার দিনে এমনি করে সব হারাবার খবরই আসে। বলছিলাম না, এ সেই নিয়তি। তবু াচতে চাই পিসী, জীবনের সব পরমায়ুটুকু ঠোঁটের প্রান্তে এনে তবু মন কাঁদে ··আমি আবার বাঁচতে চাই। বাঁচতে চাই!

কান্নায় ভেঙে পড়ে উদয়।

মনোরমার চোখে জল নামে। উদয় অস্ফুট কণ্ঠে বলে চলেছে,—সব ফিরে পেয়ে বাঁচতে চাই পিসী। কিন্তু—

পরীক্ষার ফল বের হয়েছে।

ডাঃ বোস খুশি হয়েছেন। সুমিতা এ জেলা থেকে প্রথম হয়েছে।

রাত্রির আবছা তারাজ্বলা অন্ধকারে বসে আছে সুমিতা আর প্রশান্ত। স্তব্ধ রাত্রির প্রহরে আজ ওরা যেন দুজনে কোথায় হারিয়ে গেছে। কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই সুমিতার। প্রশান্ত ওকে যেন কাছে পেয়েছে আরও।

—সুমিতা!

প্রশান্তর ডাকে ওর দিকে চাইল সুমিতা। ওর মনে ঝড় ওঠে। নিজেও ওকথা ভেবেছে বার বার। কেন এই বঞ্চিত ব্যর্থ জীবনের বোঝা বইবে জানে না। মনে হয় আজ সে সাড়া দেবে।

প্রশান্তর কাছে সে ঋণী। এতদিনে দেখেছে ওকে বিশ্বাস করা যায়। তবে দ্বিধা কোন্‌খানে সে জানে না। মনের অতলে কোথায় একটা প্রতিবাদের ক্ষীণ সাড়া জাগে। সুমিতা মনের অতলের সেই কামনাকে আজ একেবারে স্তব্ধ করে দিতে পারে না। একটা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে তাকে।

প্রশান্ত আজ সুমিতার মনে একটি নতুন সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছে, ভালবাসতে চায়। আবার সব ফিরে পেতে চায় নতুন করে।

—সুমিতা! প্রশান্ত তাকে সেই স্বপ্নজগতের পানে ডাকছে।

আর্তকণ্ঠে বলে সুমিতা,—আমাকে ভাবতে দাও। তোমাকে ফেরাতে অনেক ব্যথা আমারও বাজে প্রশান্ত। আমি হারিয়ে যেতে চাই না। আর দুটো দিন সময় দাও। ভাবতে দাও।

সারা বাড়িটায় স্তব্ধতা নেমেছে। ডাঃ বোস হাসপাতালের ম্যানেজিং কমিটির মিটিং-এ গেছেন। ফিরতে দেরি হবে। শান্তনুও পড়া শেষ করে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে।

সুমিতা আর প্রশান্ত বসে আছে দুজনে।

ওদের মুখে ভাবনার কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। সামনে তাদের অনেক প্রশ্ন।

প্রশান্ত অনেক ভেবেচিন্তেই এগিয়েছে।

সে বলে,—তোমাকে অপমান করতে চাইনি সুমি। তোমার মত মেয়ের জীবনে অনেক পাওনা উচিত। তোমাকে আমি স্বীকৃতি দিয়েই নিয়ে যেতে চাই সেই ঘরে।

সুমিতার মনের অতলে সেই দ্বন্দ্ব। একদিকে তার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। অন্যদিকে সেই মৃত অতীতের জড়তা-মাখা কঠিন সেই পরিচয়।

সুমিতা আজ প্রশান্তকে জানাতে পারে না সব কথা। তবু মনে হয় ভালবাসার স্পর্শ সে পায়নি জীবনে। আজ এই অফুরাণ ভালবাসাকে নিঃশেষে ফিরিয়ে দিতে সেই ব্যর্থ কাঙাল নারী-মনের অন্তরালে কোথায় বেদনা অনুভব করে।

—প্রশান্ত!

সুমিতার ডাকে প্রশান্ত ওর দিকে চাইল। সুমিতা উদ্বেলকণ্ঠে শোনায়, —আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমার সব ভাবনা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। তার মনেও সমবেদনা জাগে ওই মেয়েটির জন্য।

—পরে দেখা হবে সুমিতা।

সুমিতা ওর কথার জবাব দিল না। ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে। প্রশান্তকে ফিরিয়ে দেবার আগে তাকে আরও ভাবতে হবে। সে-ও বেদনা পাবে ওই মানুষটির মতই।

সুমিতা একাই বসে আছে। বার বার সেই মন সাড়া তোলে। এমনি বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি তা জানে না সে। সে কোনও অপরাধ করেনি। তবে সব পাবার অধিকার কেন তার থাকবে না?

সাহসী হয়ে উঠতে চায় তার মন।

রাতের নির্জনে হু হু হাওয়া বয় চরের বাবলাবনে। গঙ্গার জলধারার ওপারে দিগন্ত রেখা কালো একটা পর্বতসীমার মতই কি বাধাপ্রাচীর রচনা করেছে। ওই বাধা তার কাছে যেন দুর্লঙ্ঘ্য।

ওরই সামনে এসে পথ না পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে একটি অসহায়া নারী।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে ওঠে। ওপাশে শান্তনুর ঘরের জানলায় কার একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে চেয়ে আছে।

ডাঃ বোসও নেই। চিৎকার করতে যাবে সুমিতা, হঠাৎ লোকটাকে দেখে ফিরে চাইল। ওর কোটরগত দুটো চোখ জলছে।

স্তব্ধ একটা শীর্ণ মানুষ। যেন অতীতের কার প্রেতাত্মা। ধরা পড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। এগিয়ে আসে সুমিতা। ওর দাড়ি-ঢাকা মুখে পড়েছে এক-ফালি আলো। বেদনায় করুণ বিষণ্ণ সেই মুখ।

—কে? কে তুমি?

—চিনতে পারো সুমিতা? চেনা কণ্ঠস্বর। অনেকদিন আগেকার হারানো সেই মানুষ। উদয়!

—তুমি! আর্তনাদ করে ওঠে সুমিতা দুহাতে মুখ ঢেকে।

উদয় বলে,—আমার ছেলেকে দেখতে এসেছিলাম।

সুমিতা আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে লোকটাকে দেখে। মনের মাঝে ঝড়টা ঠেলে ওঠে। অসহায় লোকটার দিকে চেয়ে থাকে সে। সুমিতা কঠিনকণ্ঠে বলে ওঠে,—ও পরিচয়ে আর কোনদিন এখানে এসো না। ভেবো তারা কেউ নেই।

মাথা নাড়ে উদয়। বেদনাহত কণ্ঠে বলে,—কোন দাবি নিয়ে আর আসব না সুমিতা। সব দাবি জানাবার অধিকার আমার ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সব

অতীতকে একেবারে তুমি ভুলে গেছো সুমিতা? মনের কোণে কোথাও এতটুকু স্মৃতি-ক্ষমা-দয়া কিছুই কি আর নেই? সব ভুলে গেছো?

সুমিতার মুখের উপর যেন একটা চাবুক পড়েছে সশব্দে। আর্তনাদ করে ওঠে সুমিতা। ওসব সে ভাবতে চায় না আজ।

—না, না, সব কিছুকেই আমি ভুলতে চাই। ভুলে গেছি।

এগিয়ে আসছে ওর দিকে উদয়। ওর মুখে পড়েছে একফালি আলোর আভা। দাড়ি-ভরা মুখখানায় কি এক নিবিড় জ্বালা আর বেদনার ছায়া রয়েছে।

কঠিনকণ্ঠে বলে উদয়,—তবে ওই শাঁখা-সিঁদুর? ওটুকু এখনও টিকিয়ে রেখেছো কার কল্যাণ কামনায়? ওর কোন প্রয়োজন নেই। ওটুকুকেও নিঃশেষ করে দিও। মুছে ফেলো তোমার সেই পরিচয়।

নিদারুণ বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে সুমিতা,—থামো, থামো তুমি। ওকথা বলো না। আমার সব নিয়েছ তুমি। শুধু ওইটুকু নিয়ে আমাকে শান্তিতে বাঁচতে দাও।

উদয় ওকে আজ বেদনা আর আঘাত দিয়েই আনন্দ পায়। অভিমান ভরা মন তার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বলে ওঠে সে,—তা হয় না সুমিতা। জীবনের এতটা পথ ধুঁকে ধুঁকে চলে আজ আমি ফুরিয়ে গেছি। হয়তো হাসবে শুনে, তবু বিশ্বাস করো, তোমাদের অনেক খুঁজেছি। সব হারিয়ে গেল। বিষয়-আশয়-ঘর-বাড়ি-তোমরা। তবু তোমাদেরই খুঁজেছি এতদিন। ভেবেছিলাম আবার সব ফিরে পাবো। মানুষের মত বাঁচবো। হঠাৎ শান্তনুকে দেখলাম, তাই আজ এসেছিলাম একটা কথা জানতে। যার নিশানায় চলেছি, সে আলো না আলেয়া? দেখলাম অনেক দুঃখে সে আলেয়াই। ও শুধু কঠিন বন্ধুর পথে ঘুরিয়ে নিয়ে যায় নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ওর জন্যেই এতটা পথ বৃথা ঘুরেছি। সে ঘোরার আজ শেষ হোক। এই বেদনা নিয়েই আমি ফুরিয়ে যেতে চাই।

কাশির ধমকে কাঁপছে উদয়ের দেহ। আজ তার সামনে জীবনের শূন্যতা দুঃসহ হয়ে উঠেছে। কাশছে সে। হঠাৎ কি দুর্বার ভয়ে পালাতে যায় উদয় হাত দিয়ে মুখটা টিপে ধরে। ভীত হয়ে ওঠে উদয়। মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়। জিভে নোনতা আস্বাদ ঠেকে। কাশির ধমকে বের হয়ে আসছে তার নিঃশেষিত-প্রায় প্রাণশক্তিটুকু ওই রক্তধারায়। সে ওই অবস্থাতেই বের হবার চেষ্টা করে।

সুমিতা অসহায় লোকটার দিকে এগিয়ে আসে। মুখে ওর বেদনার ায়া।

—শোন!

উদয় অস্পষ্টকণ্ঠে আর্তনাদ করে,—এখানে এসো না। মৃত্যুবীজ ছড়ানো য়েছে এতে। না, না, না। তোমাকে বাঁচতে হবে সুমিতা। তুমি এখানে সো না। এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

আঁধারে হারিয়ে গেল উদয়।

চিৎকার করে ওঠে সুমিতা। অন্ধকারে নির্জন বাড়িটায় ওর চিৎকার ভসে ওঠে একটি নিষ্ফল আতঙ্ক-ভরা হতাশ কান্নার বেদনায়,—শোন! শান!

শান্তনুর ঘুম ভেঙে গেছে। সে বের হয়ে এসেছে ঘুমচোখে। মাকে াকছে,—মা! মা!

সুমিতা কি এক দুর্বার আবেগে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে,—কি যেন প্ন দেখছিলাম শান্তনু, আমার সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে! না, না! হারাতে ামি দেবো না!

অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে সুমিতা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। ওইটুকু বলম্বনই যেন তার কাছে সবচেয়ে বড়। এটা আজ বুঝেছে সে।

প্রশান্ত রাস্তায় পা দিয়েছিল। হঠাৎ ওই চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়াল। মিতার আর্ত কণ্ঠস্বর তার কানে আসতেই এ-বাড়ির দিকে ফিরেছে সে ওই ন্ধকারেই। কে জানে কোন বিপদই হয়েছে বোধহয়!

সুমিতা তখন শান্তনুকে জড়িয়ে ধরে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়েছে। শান্ত এগিয়ে এসে ডাক দেয়,—সুমিতা!

সুমিতা তার মনের এই দুর্বলতম মুহূর্তে প্রশান্তকে দেখবে কল্পনা করেনি। কে দেখে চমকে ওঠে। কি অজানা আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে ওঠে ওর চোখমুখ। মিতা বলে,—তুমি যাও। তুমি কেন এসেছো আবার? যাও, দয়া করে াও এখন!

প্রশান্ত ওর দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। বলে চলেছে সুমিতা কান্না-ভজা কণ্ঠে,—আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও প্রশান্ত। দয়া করো।

প্রশান্ত কি ভেবে ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল। সুমিতা তখন আঁধারে চাখ মেলে হারিয়ে-যাওয়া উদয়ের সন্ধান করতে থাকে।

শান্তনু মাকে এত বিচলিত হতে দেখেনি কখনো। বলে ওঠে,—ডিউটিতে যাবে না মা?

রাতের হিমেল হাওয়া ভেসে আসে ঘন বাবলাবনের দিক থেকে। গঙ্গা জলসিক্ত হাওয়া। সুমিতার উত্তেজিত দেহ-মনে শান্ত স্পর্শ বুলোয়। আ জীবনের একটা কঠিন রূপকে প্রত্যক্ষ করেছে সে! সেই উত্তেজনা কমে আসে মনের সব শক্তি—সাহস ধীরে ধীরে ফিরে আসে সুমিতার। স্বাভাবিক হবা চেষ্টা করে সে।

ছেলের দিকে চাইল। শান্তনুর দুচোখে তখনও বিস্ময়।

সুমিতা আনমনে বলে,—কাল সকালে ডিউটিতে যাবো বাবা। নাই ডিউটি আজ নেই।

আবার কাজের চিন্তায় মন দেবার চেষ্টা করে। কাজ করেই তাকে বাঁচতে হবে।

অন্ধকারে যেটুকু আলোর চমক সে দেখেছে, সেটা আলো নয়—আলেয়াই নীরব বেদনায় ভরে ওঠে সুমিতার মন।

ছায়ান্ধকার পথ দিয়ে পালাচ্ছে উদয়। চলবার সামর্থ নেই। শরীরের স শক্তিটুকু যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সারা দেহ কাঁপছে। ওর চোখের সামনে ঘনিয়ে আসে পুঞ্জীভূত জমাট অন্ধকার।

ওরই অতলে ফুটে ওঠে সুমিতা আর শান্তনুর মুখ। একটি সুন্দর স্বপ্নে ছবি। হাতটা বাড়িয়ে শূন্যে সুমিতার হাতখানা ধরতে যায় সে। টলে সারা দেহ, কাঁপছে পায়ের নিচেকার মাটি।

কে যেন দূর থেকে ডাকছে তাকে। কাতর করুণ একটি ডাক। সে ডাকে সাড়া দেবার অধিকার উদয়ের নেই। সে পালাচ্ছে।

উদয় সুমিতা আর শান্তনুকে দূর থেকেই দেখে চলে যেতে চেয়েছিল সুমিতার সামনে আসতে সে চায়নি। কিন্তু তাকে ওড়াতে পারেনি মুখোমুখি হয়ে গেছল।

একদিন অতীতে যার সবকিছু কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে পথের ওপর বে করে দিয়েছিল, সেই সুমিতার মনের অতলে সে দেখেছে সেই ঝড়।

তার স্ত্রী-সন্তান!…

ডাকটা অন্ধকার বাতাসে যেন ভেসে আসছে। অন্ধকার অতীত থেকে কে ডাকছে তাকে।

সেই পাখীডাকা আলোভরা দিনগুলো, একটি নববধূর সলজ্জ চাউনি, সেই
|রব-মুখর বাড়িটার কথা মনে পড়ে। বাবার কঠিন চাউনিটা আজও
ালেনি সে! বাতাসে উঠত হীরা বাঈজীর স্বর।

সব মিলিয়ে গেছে ওই অন্ধকারে।

একটি পথহারা মানুষ তাকেই খুঁজেছে এতদিন। কিন্তু হাতের কাছে
|কিছু পেয়ে সে আবিষ্কার করে, আজ কোনকিছুতেই তার দাবি নেই।
তগুলো বছরের যবনিকা তার মন থেকে সব মুছে নিয়ে গেছে।

ভীত-ত্রস্ত সেই মানুষটা পালাচ্ছে।

পালাবার সামর্থ তার নেই। টলছে সারা দেহ। মুখে তখনও রক্তের
দ।

চোখের সামনে অন্ধকার নামছে। পায়ের নিচ থেকে সরে গেছে
টিটুকু। সর্বশক্তি একত্রিত করে সে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না—
টকে পড়ে ওর দেহটা।

সকালবেলায় সুমিতা হাসপাতালে ডিউটিতে এসেছে। কাল রাত্রির সেই
িনাটা তার কাছে দিনের আলোয় কেমন যেন দুঃস্বপ্নর মতই মনে হয়।
সব পরিচয় তার হারিয়ে গেছে যেন। তবু ভুলতে পারে না সেই লোকটার
তর চাহনি। তাকে অস্বীকার করতে পারে না। আজও তারই কল্যাণে
রণ করেছে সে সেই শাঁখা—সীমন্তে সিন্দুর রাগ। তার সন্তানকে ঘিরেই
বার বাঁচতে চেয়েছে সে।

সুমিতা হঠাৎ ওয়ার্ডে ঢুকে সাদা চাদর ঢাকা চেতনাহীন রোগীটার দিকে
য়ে অবাক হয়। কাল রাতে ওকে পুলিশ রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল।
মিতা ইন্‌জেক্‌শন দিতে গিয়ে চমকে উঠেছে। ওর অস্ফুট আর্তনাদে ডাঃ বোস
রে চাইলেন।

বিবর্ণ পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে আছে সুমিতা। কি উত্তেজনায় কাঁপছে তার
র। খাটের রেলিং ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে। ডাঃ বোস
গিয়ে আসেন,—সুমিতা!

সুমিতার দুচোখে জল নামে।

এতদিনের সেই প্রতীক্ষা—সেই বেদনা সবকিছু যেন ওই কান্নায় ফুটে ওঠে।

ডাঃ বোস সুমিতার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে থাকেন,—কি ব্যাপার ? তু
কি অসুস্থ সুমিতা ?

—না !

সুমিতা নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। দুচোখ জলে ভরে ও
আজ সে কোন কথাই গোপন করে না। এতদিনের রুদ্ধ কান্না অশ্রু হয়ে
পড়ে। জানে না সুমিতা, যাকে এতদিন ঘৃণা করে এসেছে সেটা ঘৃণা
অভিমান।

চোখ মেলেছে উদয়। আজকের সকালের আলোভরা পৃথিবীতে পা
ডাকে। ওকে ঘিরে রয়েছে অনেকেই।

—সুমিতা !

ওর চোখে আজ আলোর আভা জাগে। সে আলেয়ার আলোর নয়
ওর চোখের জলে সব অভিমান মুছে গেছে।

মনোরমাও এসেছেন। ডাঃ বোস বলেন,—ও বাঁচবে মা, কোন
নেই। জীবনে যেদিন মানুষ আশা, আনন্দ আর ভালোবাসার স্বাদ পা
সেদিন সে আবার নতুন করে বাঁচে।

সুমিতার হাতে উদয়ের হাতখানা। বহু দুঃখ পার হয়ে আবার যেন ন
জগতে এসেছে সে। তাই আকাশে এত রঙ, এত সুর জাগে। সুমিতা
কণ্ঠে আজ আশার সুর। অভয় দেয় সে উদয়কে,—আমরা আবার
বাঁধবো। তুমি, আমি আর শান্তনু।

উদয় স্বপ্ন দেখছে। দুচোখে তার তৃপ্তির আশ্বাস। সব দুঃখ পার হ
ওরা যেন কোন্ নতুন তীর্থের পানে চলেছে। সেখানে আছে মুক্তির আশ্বাস

———

হরিপদবাবুর গতিটা হঠাৎ বেড়ে ওঠে। অবশ্য গতিটা এসময় সকলেরই বেড়ে যায়, বিবাদী বাগে ট্রামটা থামার সঙ্গে সঙ্গেই মুখবন্ধ-করা আলুর বস্তা খুলে গেলে যে ভাবে নানা সাইজের আলুগুলো ছিটকে বের হয়ে ছত্রাকার হয়ে গড়িয়ে পড়ে ঠিক—সেইভাবে নানা বয়সের মানুষগুলো বিবাদী বাগের এলাকা ছাড়িয়ে চারদিকের বড় বড় বাড়িগুলোর দিকে ধেয়ে যায়। ছোকরা-আধবুড়ো মায় মেয়েদের দলও। ইদানীং বিবাদী বাগে তাদের রকমারি রং-এর শাড়ির আঁচলও হাওয়ায় ওড়ে।

তবে এই সময় কেউ কারো দিকে চেয়ে দেখেনা, সারবন্দী ধাবমান গাড়িও লোকে নানা জ্যামিতিক অঙ্ক কসে ট্রাফিক আইনের বিধি নিষেধকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ওরা দৌড়তে থাকে। অপিসের খাতায় লাল ঢ্যারা পড়ার চেয়ে এসময় গাড়ির তলায় পড়ে শহীদ হতেও তাদের দ্বিধা নেই।

আর ঘড়িগুলোও এসময় নির্দয়ভাবে দৌড়তে থাকে। বর্ষাকাল হলে তো কথাই নেই; মেঘগুলোও যেন ওৎ পেতে থাকে। ঠিক এই সময় ভেঙ্গে পড়ে বিবাদী বাগের ওপর। এরা বলে 'কেরাণীভিজে' বৃষ্টি।

ঠিক আসার সময় নামবে, দুপুরে আবার সুমসাম। হয়তো মেঘের ফাঁক দিয়ে আলোও ছিটকে আসে। দুচারটে গাছপালা যা এখনও বিবাদী বাগের মাটিতে টিকে আছে তাদের গায় যৌবনের ঝিলিক জাগে।

আবার বিকাল হবার মুখে অপিসের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়ে বের হয়ে আসবে কেরাণীকুল, মেঘও সেজে আসবে। ক'দিন ধরেই এমনি বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা চলেছে।

ঘড়িটার বিকট শাসানির শব্দ ওঠে—ঢং ঢং ঢং! দশটা বেজে চলেছে।

হঠাৎ বিকট শব্দে হর্ণটা বেজে ওঠে কানের কাছে। হরিপদবাবুর হাত থেকে ছাতাটা ছিটকে পড়ে, পায়ের জীর্ণ জুতোটা যে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা ভাবেনি, পিছলে পড়েছে লোকটা।

হরিপদ ঘোষের হঠাৎ মনে হয় যেন একটা চলন্ত পাহাড়ের সামনে পড়েছে সে, আর বিকট আর্তনাদ করে পাহাড়টা তার গড়িয়ে পড়া দেহটার সামনে এসে থেমে গেল।

কলরব ওঠে, গেল গেল বুড়ো মানুষটা!

ড্রাইভার চিৎকার করছে। পথচারী দুচারজন ছুটে আসে।

হরিপদবাবুও অবাক হয়। না—ডবল ডেকার বাসটার নিচে পড়েনি সে, পিষে চ্যাপটাও হয়নি।

ওকে ধরে তুলেছে দু'চারজন। কে ছাতাটা এগিয়ে দেয়। রাস্তায় এসেছে হরিপদবাবু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে।

এক ছোকরা বলে—বয়স তো হ'ল। এখনও চাকরিতে লেগে থাক কেন—রিটায়ার করে 'হরিনাম' করগে বাড়িতে।

অন্যজন বিজ্ঞের মত শোনায়—দাদু আর কেন? এবার চেয়ার ছাড়ুন না হলে কোনোদিন পথেঘাটেই অপঘাতে মরতে হবে।

হরিপদবাবু উঠে দাঁড়িয়েছে। সাদা টুইলের জামায় কাদার কালো ছোপ পড়েছে। হাঁটুটা ছড়ে গেছে। তবু এতদিনের দেহটা টিকে আছে।

—কোন অপিস দাদু? কে একজন শুধোয়।

হরিপদবাবু কি জবাব দেবে জানে না। এককালে সেই জবাব দেবার মত একটা অপিসে চাকরি করত সে। এখন সে চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে ক'মাস হ'ল। তবু আজও আসতে হয় তাকে রোজই কি এক নেশার ঘোরে।

ও ভাবতে পারেনা তার চাকরি নেই, আজ সে বাতিলের দলে। কোথাও তার ঠিকানা নেই কোনো অপিসের। তবু বলে সে,—কিলমার কোম্পানীর অপিস! নিজেই যেতে পারবো।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় হরিপদ ঘোষ।

এই পথে এসেছিল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে একটি তরুণ। সেদিন ডালহৌসী স্কোয়ারের ছিল অন্যরূপ। ওটা ছিল সুন্দর ফুলের সাজানো বাগান। শীতের সময় ফুটত কত মৌসুমী ফুল। ডালিয়া-জিনিয়া আর সব ফুলের নাম জানেনা হরিপদ। বাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সেদিনের হরিপদ। তার মনের অতলে অনেক আশা।

কলকাতার ওদিকে কেষ্টপুরের খালধারে তাদের গ্রাম। ঝুপড়ি মত দুটো মাটির ঘর, পিছনে একটা টোকাপানা ভরা ছোট্ট পুকুর, কয়েকটা নারকেল গাছ, সামান্য একটু জমিতে কিছু তরিতরকারী লাগায়। কিন্তু তাতে সংসার চলে না।

দের গ্রামের মদনবাবুকেই ধরেছিল হরিপদর বাবা।

দনবাবু কিলমার এ্যাণ্ড প্যাট্রিক কোম্পানির অপিসের পুরোনো রী। তিনিই বলেন—এসো দেখি কি করা যায়।

হরিপদ তাই চলেছে। ডালহৌসী স্কোয়ারে নেমে বাঁ-হাতি বড় রাস্তা চলেছে। সামনে মাথা তুলেছে হলদে রং-এর চারতলা বাড়িটা। পথে জনের ভিড় গিস গিস করছে। গাড়ি ঘোড়ার ভিড়-এ গেঁইয়া ছেলেটা ন হতভম্ব হয়ে যায়।

সাদা চামড়ার সাহেব বড় একটা দেখেনি, এখানে তাদের অভাব নেই। ঝকঝকে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে তারা।

সামনে পিতলের ফলক বসানো, বাঁকা বাঁকা ইংরাজী অক্ষরে লেখা 'কিলমার ও প্যাট্রিক্'। হরিপদ বারদুয়েক বানানটা ভালো করে পড়ে নিয়েছে এর , একজন বেয়ারা সাদা প্যান্ট কোট পরে দেখছে ওকে। লোকটার কপালে নের ইয়া ফোঁটা তিলক। গোলগাল চেহারা। ভুঁড়িটা কোটের মধ্যে ক ঠেলে উঠেছে। দরোয়ানদের দুচার জনকে দেখেছে হরিপদ। তাদের ইহাটি, বেলগাছিয়া-দমদমার দিকে অনেক জমিদারদের পাঁচিল-ঘেরা নো বাগানের গেটে দেখেছে এদের। সকলের চেহারাতে নিশ্চিন্ত ভাব র দুধ ঘি খাওয়ার ফলে, তোয়াজে থাকার জন্য ভুঁড়িটা ঠেলে উঠেছে।

—ক্যা মাংতা—

দরোয়ানের হুঙ্কারে চাইল হরিপদ। একটু ঘাবড়ে গেছে সে। তখন ও গদাধর ছেত্রীকে চেনেনি। লোকটাকে এ অপিসের অনেকেই সমীহ র থাকে।

কোন মতে বলে সে—মদনবাবুর কাছে যায়েগা দরোয়ানজী।

—মদনবাবু! কৌন মদনবাবু? দরোয়ান তবু যেন দরজা ছাড়তে জী নয়।

হরিপদকেও যেতে হবে। সে তার দোখনো ভাষার সঙ্গে ছুট হিন্দী শিয়ে হাতপা নেড়ে চলেছে, কাম করে এখানে সে। মোটা গোঁট্টা বু।

এমন সময় একজন বেয়ারা খাবার নিয়ে ঢুকছিল। সেই-ই বলে—হ্যাঁ, নতলায় বসে। চলুন!

মদনবাবর চেষ্টাতেই হরিপদ চাকরিটা পেয়েছিল। ডেসপ্যাচ সেকশনে

একটা টুলও জুটে যায় তার। চিঠিপত্রে নাম ঠিকানা লেখা আর ডাকে করা ছাড়া অন্য টুকটাক কাজও করতে হয়, মাস মাইনে তিরিশ টাকা।

তিরিশ টাকায় তখন হেসেখেলে সংসার চলে। তিন টাকা একমণ শশীবালাম চাল মেলে কেষ্টপুরের হাটে। টাটকা পারসে, ভেটকি মেলে দুআনা সের। টাকায় ষোল সের দুধ, ঘি-এর দর একটাকা সের। মাসকাবারে শ্যামবাজারে বাজার করে বারো আনায় একটা নতুন ধুতি মাল বেঁধে আনে—সেইটাই ধোলাই করে পরা চলে।

এ হেন তিরিশ টাকার বেতনের চাকরিটা পাকা ফলের মত ঘোষের হাতে এসে পড়েছিল টুপ করে।

মদনবাবু ওকে সাহেবের ঘরে নিয়ে গেছিল তালিম দিয়ে। মদন পোষাকটাও বিচিত্র। টুইলের সার্টে—নিচের দিকটা দেখা যায় না, উপর কাপড়পরা, কোঁচাটা পিছনে গোঁজা, পায়ে মোজা আর ডার্বির জুতো কোটটা চেয়ারে রাখা থাকে—সাহেবের ঘরে যাবার সময় সেটাকে চাপিয়ে নেয় মাত্র।

—হোয়াট ম্যাডন!

মদনবাবুর পিছু পিছু সাহেবের ঘরে ঢুকেছে হরিপদ। এর আ এতকাছে থেকে সে সাহেব কখনও দেখেনি। ওই বাজখাই গলার হুঙ্কার চমকে কাঠ হরিপদ। ঘামছে সে। মদনবাবু বলে—মাই ভাইপো স্যার ভেরি পুওর—ভেরি গুড বয়। ইয়োর মোষ্ট অবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট স্যার বেগস্ ওয়ান চাকরি স্যার। নাহলে ডাই—নো ফুড স্যার।

হরিপদ সেবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তাদের পরীক্ষার কড়া ক ট্র্যানশ্লেসন থাকত ইংরাজীতে, সে ভালো নম্বরও পেয়েছে—কিন্তু মদন এ হেন ইংরাজী শুনে সে ঘাবড়ে গেছে।

সাহেব দেখছে হরিপদকে। হুঙ্কার ছাড়ে, রাইট ইয়োর নেম। ক অন।

প্যাড এগিয়ে দেয়। মদনবাবু বলে—সাহেব যা বলছে কর। সে কর আগে।

হরিপদর হাতের লেখাটাও ভালো, নিজের নাম লেখা। সাহেব দে বলে, গো। ম্যাডন টেক হিম টু ডেসপ্যাচ সেকশন।

…এ্যাই রে মাল আবার এসেছে!

হঠাৎ চমক ভাঙে হরিপদবাবুর। কখন হেঁটে হেঁটে বিবাদী বাগ থেকে পুরোনো অপিসে এসে পৌঁছেছিল খেয়াল করে নি। অপিসের গেটে উর্দি পরে দাঁড়িয়ে আছে। এ সেই অতীতের গদাধর ছেত্রীর ছেলে ণ ছেত্রি' অবশ্য নামেই দুধবরণ, আসলে ওর নামটা কালীচরণ হলেই হত।

ছেত্রি হরিপদবাবুকে চেনে তাই আটকায় নি—ভিতরে খানিকটা ফাঁকা। কয়েকটা পাম—কিছু ফুলের টব দিয়ে সাজানো, তখন জায়গাটা ফাঁকা ছিল সবুজ ঘাসে ঢাকা একটু মাঠ। চারিদিকের বড় বড় বাড়িগুলোর র ওই মাঠটুকু সুন্দর একটা আভাস আনত।

এখন সেখানে ঘাসের সবুজ ছোঁয়া আর নেই। ওপাশে উঠেছে ছতলা ন বিল্ডিং—সামনে বেশ কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা। অপিসের আয়তন ড়ছে—বেড়েছে নতুন কত ডিপার্টমেণ্ট, স্টাফ, মায় অফিসার অবধি। আর সঙ্গে গাড়ি। ঠাট-বাটও বেড়েছে। সেটা দেখেছে ওই হরিপদ ঘোষও।

—হরিদা কেমন আছেন ?

হরিপদ দেখেছে একটু আগে একদল নতুন ছেলেদের। সবে কবছর াসে ঢুকেই লায়েক হয়ে উঠেছে। সিগ্রেট-এর ধোঁয়া মুখের উপর ছেড়ে কশনে চলে গেল, তাদের বিশ্রী মন্তব্যটা কানে আসে।

হরিপদবাবুর চোখ মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা পরিবর্তন দেখা যায়, ওটা াকের জন্যই।

পরক্ষণেই সামনে ডিলিং সেকশনের গোবিন্দ পাইনকে দেখে চাইল। জন পুরোনো বেয়ারা ফাইল নিয়ে যাচ্ছিল—সে হরিপদকে দেখে দাঁড়াল।

—ভালো আছেন বড়বাবু ? নমস্কার ?

হরিপদ খুশী হয়, দাঁড়াল সে। বিপিন বেহারা তার সেকশনেও কাজ করেছে নকদিন। হরিপদবাবু বলে,—ভালো ? তুমি ভালো আছো তো ? হে গোবিন্দ—তোমার ডেসপ্যাচ সেকশনের খবর কি ? সব ইনকামিং ঠিপত্তর নোট করছ তো ? নোট করে ফাইল নাম্বার সেকশন সব এন্ট্রি খবে। তোমাদের বড়বাবু কে ?

—আজ্ঞে মহেশ নাথ—

চমকে উঠে হরিপদবাবু—এ্যাঁ ! মহেশ ! সে এখন বড়বাবু হয়েছে ? া কি হল হে ? জয়োফাঁকিবাজ, কেলার সাহেব তো সেবার ওকে 'স্যাক'

করত—নেহাৎ দয়া করে রেখে দিল। সে এখন বড়বাবু! যাই
রেকর্ড সেকশন হয়ে ওদিকে যাবো। বলি এইসব লোককে কি পয়েন্টে
অপিস চলবে? না, ছোট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে দেখছি

হরিপদ বাবু লিফ্‌ট দিয়ে উপরে উঠে গেল। ওর মাথায় এখন
ভাবনা।

চারতলায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকশন। এখানে বহুকাল কাটিয়েছে হরি
বাবু। প্রথম যেদিন এই অপিসে চাকরি করতে আসে সে সেদিন এ
এখানে মদনবাবুর সঙ্গে।

মদনবাবু বলে—পায়ের জুতোর শব্দ করবি না। চুপচাপ
এখানে।

জুতো পরে যেন ঢোকাই নিষেধ, আর ঢুকতে হবে কাচুমাচু ভাব
বিনীত ভাবে। মদনবাবু বলে—এই সেকশন হচ্ছে মাথা, মাথা
দেহকে চালায় এই সেকশন দেখছিস তেমনি এতবড অপিসকে চালায়

দেওয়াল জুড়ে র‍্যাক—তাতে ফাইল সাজানো, অসংখ্য ফাইল!

আর ওদিকে এদিকে টেবিলে বসে বাবুরা খস খস করে ইংরাজী লি
ফাইল পাঠাচ্ছে। ফোন রয়েছে একটা টেবিলে। সামনে একজন ভদ্রে

চিনেবাজারের তৈরি প্যাণ্ট কোট পরা। লম্বা টিকটিকির মত
নাকটা লম্বা। বাজপাখির ঠোঁটের মত। শুধোন তিনি—কি হে মদন,
আবার এ খোঁয়াড়ে ঢোকালে বাবা? কেলার সাহেব তো দেখি
কথায় ওঠে বসে—হ্যাঁ, ইটি কে?

হরিপদকে দেখছেন তিনি। মদনবাবু সাহেবের চিরকুটখানা ওর
দিয়ে বলে, খুব গরীব মিত্তিরদা, একটা কাজ কম্মো পেয়ে তবু বেঁচে
একটু চরণে রাখবেন বেচারাকে।

হরিপদকে ইশারা করে প্রণাম করতে।

হরিপদ এখন গরজে পড়ে ঢ্যালাকেও দণ্ডবৎ করতে পারে, তা
জলজ্যান্ত মানুষ একটা। প্রণাম করে সে।

তখনই বুঝেছিল এই সেকশনকে খুশী রাখতে পারলে তার চাকরি
আর ধনাই মিত্তিরই এই সেকশনের মাথা।

হঠাৎ ধনাই মিত্তিরের বাজখাঁই গলার আওয়াজ ওঠে, কে যায়? আ
ডাক তো।

বাইরের করিডরে কারা একটু জোরে কথা বলে যাচ্ছিল, আবদুল বেয়ারা বড়বাবুর হুকুম পেয়ে দুজনকে ডেকে আনে। ধনাই মিস্তির-এর চেহারা তখন বদলে গেছে! বিড়ালের যেমন রোম ফুলে ওঠে রেগে গেলে—ধনাই মিস্তিরও তেমনি রেগে উঠেছে। বলে সে,—এটা কি এসটার থ্যাটার পেয়েছো যে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে রসের গল্প করতে আসবে? কি নাম—কোন সেকশনে কাজ করো? এ্যাঁ—ডিউটি আওয়ারে আড্ডা জমাচ্ছ?

লোক দুটোর অবস্থা তখন কেঁচোর মত। বলে তারা—অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। এবারের মত মাপ করুন।

ধনাই মিস্তির গর্জে ওঠে—খেয়াল রাখবে এটা এ্যাডমিন সেকশন। এর ধারে পাশে কোন রকম গোলমাল করবে না। এখানে মাথার কাজ করতে হয়। যাও।

এবার বুঝতে পারে হরিপদ—মদনকাকা কেন তাকে জুতোর শব্দ না করে ঘরে ঢুকতে বলেছিল।

ডেসপ্যাচ সেকশনে ঢুকেছিল চাকরিতে—সেদিন যেন আজও হরিপদবাবুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

—কই হে মহেশ বলি ক্যামন আছো? সব ভালো তো? বড় হল ঘরে কয়েকটা টাইপ মেসিনের শব্দ উঠছে।

ওদিকের কয়েকটা টেবিলে কয়েকজন কেরানী বিভিন্ন চিঠির হিসাব রাখছে, টেবিলে খোলা চিঠির স্তূপ।

মহেশবাবু ফিরে চায় হরিপদবাবুর দিকে। বছর খানেকও হয়নি রিটায়ার করেছে লোকটা, এর মধ্যে মাথার চুলগুলো সব পেকে উস্কোখুস্কো হয়ে গেছে। চোখের কোলে পড়েছে কালির দাগ। কাপড় জামাটা আগে বেশ ধোপদুরস্ত থাকত। ছিটের গলাবন্ধ কোট-এর ইস্ত্রিও থাকত ঠিক-ঠাক।

হরিপদ ঘোষকে সাধারণ পোষাকেও তখন ফিটফাট দেখা যেত, লোকটা অতীতকাল থেকে সাহেবদের কাছাকাছি থেকে দেখেছিল ওরা জুতোর শব্দ পছন্দ করে না। তাই তখন থেকেই কেডস পরত। ক্যাম্বিসের জুতো।

এখনও সেই জুতোই পরেছে তবে পায়ের কড়ে আঙুলটা ছেঁড়া জুতোর ফাঁক দিয়ে বের হয়ে এসেছে। গালে কদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

লোকটাকে দেখল মহেশবাবু। হরিপদ শুধোয়—ডেসপ্যাচ সেকশনের

কাজ কম্মো ঠিকমত চলছে তো হে? দেখো বাপু, চিঠির হিসাব ঠিক রাখবে।

পরক্ষণেই ওদিকের টেবিলের ছোকরা এক কেরানীকে চিঠিগুলো গোল পাকিয়ে ড্রয়ারে রাখতে দেখে সাঁ করে এগিয়ে যায়। বলে ওঠে—চিঠি কি ড্রয়ারে পুরে এরিয়ার জমাচ্ছ ছোকরা?

ছেলেটি কবছর সবে ঢুকেছে এখানে। এখন কিলমার প্যাট্রিক কোম্পানীর ব্যবসা আরও বেড়েছে। দু-তিনটে বড় কোম্পানীর চা বাগান—কারখানা কিনেছে। রীতিমত পরীক্ষা দিয়ে সুশান্ত এই চাকরিতে ঢুকেছে। বি এ অনার্স সে। ওই বুড়ো লোকটা আগেই রিটায়ার করে গেছে। তবু দেখছে বেহায়ার মত অপিসে এসে এ সেকশনে—ও সেকশনে ঘোরে। একে ওকে যাতা বলে।

সুশান্তর ওপাশে কাজ করে ধীরা। কবছর হল এদের অপিসেও মেয়েরা বহাল হয়েছে। টাইপিস্ট অধিকাংশ মেয়েরাই, কেরানীও আছে।

ধীরা দেখছে লোকটাকে। জামায় কাদার দাগ, হাঁটুটা ছড়ে গেছে। লোকটার কথায় সুশান্ত বলে হরিপদকে।—কি করছি না করছি আপনি দেখার কে?

হরিপদ তবু দমে না। আজ যেন তার মনে পড়ে কয়েক বৎসর আগেকার কথা। তখন দাপটের সঙ্গে বড়বাবুগিরি করেছে সে এই সেকশনে।

প্রথম ও কদিন ধরে চিঠিপত্র জমিয়েছিল, মহা ফাঁকিবাজ ছোকরা।

অপিসের কাজে ফাঁকি দিয়ে রেসের মাঠে যেত। বন্ধুবান্ধবদের কাছে এত ধার দেনা করেছিল যে অপিস আসার পথ ছিল না। দরোয়ান গদাধর ছেত্রি তো মাইনের দিন জোর করে তার কিস্তির টাকা আদায় করত ওই প্রমথর কাছে।

তবু ডাঁটে থাকত সে। আদ্দির পাঞ্জাবি—বাহারী ধুতি পরত। সেদিন হেনরী সাহেবের জরুরী চিঠির খোঁজ হয়। বিল সেকশনে হৈ চৈ পড়েছে। চিঠি আসেনি।

হরিপদ খবর পেয়ে সিধে এসে প্রমথর ড্রয়ার খুলে সেই সব চিঠি—বিলের তাবড়া বের করে। তার থেকে বের হয় হেনরী সাহেবের সেই জরুরী বিল।

কদিন ধরে অপিস তোলপাড় করেছে ওরা! এই সময় হরিপদকে সেই সব বের করে নিয়ে ওর ঘরে ঢুকতে দেখে হেনরী সাহেব যেন হাতে স্বর্গ পায়।

—হরিপদো ইউ আর রিয়েলি এ জেম অব বড়বাবুজ। ইউ সেভড মি।
পরক্ষণেই গর্জে ওঠে সাহেব—হু ইজ রেসপনসিবিল ? গেট ছাট ব্যাষ্টার্ড ?
চাকরি যায় যায়। প্রমথ কান্নাকাটি শুরু করেছে, আর কখনও এ কাজ
না সাহেব !
হনরি তো ওর মুণ্ডু নেয় আর কি। গর্জে ওঠে সে,—আই শ্যাল শ্যাক্
ব্লাডি সোয়াইন।
চেম্বারের বাইরে ভিড় জমে গেছে, সাড়া পড়ে গেছে অপিসে। হেনরী
ব রগচটা মানুষ, আজ সে ক্ষেপে গেছে। তাড়াবেই প্রমথকে।
ঘরে ঢোকে হরিপদ—স্যার ! ওয়ান রিকোয়েষ্ট স্যার ! ইউ গ্রেট ম্যান—
কিল এ পুওর ম্যান দিস টাইম স্যার !
হরিপদবাবুর কথা রেখেছিল সাহেব। সেদিন প্রমথর চাকরি টিকে যায়।
অপিসে ছড়িয়ে পড়েছিল হরিপদবাবুর সাহেবদের সঙ্গে দহরম মহরমের
।
বিল সেকশনের কালুবাবু বলে, একটা লোকের অন্ন বাঁচালেন হরিদা।
গদাধর ছেত্রীর বেশ কিছু টাকা ডুবতে বসেছিল প্রমথর সঙ্গে। চাকরি
ল সেটা কোন মতেই উদ্ধার হত না। সেই লোকশান থেকে বেঁচে গেছে
র, অপিসের আরও অনেকে।
গদাধর ছেত্রি বলে, বৃহৎ পুণ্য কাম কিয়া বড়াবাবু, মেরা লেড়কার একঠো
করীর জন্য কোশিস করছি—আপনি বোড়া সাহেবদের বলিয়ে দিন।
হরিপদবাবু যুদ্ধে জয়ী হয়ে সেকশনে ফিরে ড্রয়ার খুলে কৌটা বের করে
গী গুণ্ডী পান মুখে দিয়েছে। ওই তার একটা নেশা। পান খায় দিনে
কটা।
পান মুখে দিয়ে বলে ছেত্রিকে—পরে এসো। এখন অনেক কাজ পড়ে
ছ।
গদাধর ছেত্রির তাতেও আপত্তি নেই। বলে সে—ঠিক আছে বড়বাবু।
আজ আবার ওই ছোকরা সুশান্ত তেমনি একটা গর্হিত কাজ করছে, ড্রয়ারে
র তাড়াপুরে তার কাজে ফাঁকি দিয়ে পালাবার মতলবটা ধরে ফেলেছে।
সুশান্ত তার জন্য এতটুকু ভীত নয়, লজ্জা পাওয়া তো দূরের কথা।
হরিপদবাবু বলে—কি হে মহেশ, চিঠি ডিটেন করাচ্ছ এইভাবে—বলি
স তাহলে গোল্লায় যাবে যে—

ধীরা দেখছে লোকটিকে। কে ফোড়ন কাটে—ওর বাবার অপিস তাই এত ভাবনা।

মহেশ জানে হরিবাবুকে। এখুনি চেঁচামেচি শুরু করবে। আসলে যা করেছে সুশান্ত তা বেআইনীই। ওর ড্রয়ারে এমন আগেকার চিঠিই খুঁজলে মিলবে। মাঝে মাঝে চিঠি নষ্টও করে ফেলে।

ফলে অন্য সেকশনের কাজ বাড়ে। ক্ষতিও হয়। কিন্তু মহেশ সুশা তেমন কিছু বলতে পারে না। কারণ ইদানীং ইউনিয়ন নানা ব্যাপারে বা দেয়, কর্মচারীরা যেন একটু বেড়ে উঠেছে।

সুশান্ত ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা। তাকে ঘাঁটাতে চায় না ওরা। মহেশবাবু উঠে এসে বলে,—আমি দেখছি হরিদা। আপনি গিয়ে বসুন। চিঠিআপটু-ডেটই করা আছে, ভাববেন না!

অর্থাৎ হরিবাবু খুশী হয় মনে মনে। বলে সে—ঠিক আছে। সব নিজে চেক আপ করবে মহেশ। এসব তোমার চার্জে। দেখি গে কি হ অন্য সেকশনে। কথাগুলো বলে হরিপদবাবু বেশ সতেজ ভঙ্গীতেই হয়ে গেল। পিছনে তখন সেকশনের দুচারজন কর্মচারী এবার ক্ষুব্ধ ক প্রতিবাদ করে, ওই বুড়ো ভাম কেন আসবে এখানে? রিটায়ার করেছি গলায় মালা পরে, আবার এখানে মাতব্বরি করতে আসবে কেন?

ধীরা চুপ করে শুনছে কথাগুলো। অন্যজন বলে—এবার এলে বের কা দেব।

লেডিজ রিটায়ারিং রুমে ও কথাটা নিয়ে আলোচনা হয়।

বীণা নতুন এসেছে। বলে সে,—ভদ্রলোকের বাড়িতে কেউ নেই নাকি এভাবে ছেড়ে দেয়। শুনছিলাম আজ নাকি গাড়ির তলায় পড়ছিল।

বিজয়া এদের মধ্যে একটু লীডার গোছের। সেজেগুজে অপিসে আ তবু মাঝে মাঝে লেডিজ রিটায়ারিং রুমে এসে মেক আপটা চেক করে যায় এর মধ্যে ইউনিয়নের কাজেও ভিড়েছে। তবে অনেক মেয়েরা বলে—ও নাকি সুশান্তের জন্যই। কারণ সুশান্তের সঙ্গে ওকে দেখা যায় প্রায় এখা ওখানে। আজও ওদের দুজনের ম্যাটিনি শোতে সিনেমায় যাবার কথা ছিল

বিজয়া বলে—ওই বুড়োটার এগেনেষ্টে এবার ইউনিয়ন এজিটেশন করবে ও কোম্পানীর কর্তাদের দালাল। চুকলি খেতে আসে।

ধীরা এদের মধ্যে একটু সিনিয়ার। সেও অতীতে দেখেছে হরিপদবাবুকে

অপিসকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত লোকটা, কাজ পাগল মানুষ। ভালো মানুষও।

ধীরার চাকরির ব্যাপারে হরিপদবাবুর অবদানও কম ছিল না। ধীরা তখন বাবাও মারা যাবার পর বিপদে পড়েছে। মাথার উপর বিধবা মা, নাবালক তুই ভাই-বোন। নিজে বি-এ পাশ করে অপিসে অপিসে ঘুরছে। সেদিন বৈশাখের তুপুরে কয়েকটা অপিসে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এসেছে এখানে, যদি কোনো পার্টটাইম চাকরির খবর থাকে।

মাথা ঘুরে যায় করিডরে, হরিপদবাবুও এসে পড়ে। তার সেকশনের বাইরে ঘটনাটা ঘটেছে। এ যেন হরিপদবাবুরই দায়-দায়িত্ব। গরম তুধ খাইয়ে ধীরাকে চাঙ্গা করে তোলে। হরিপদবাবু শুধোয় ওকে—কি ব্যাপার বলত মা?

ধীরার তখন লজ্জার শেষ নেই। এতগুলো কৌতূহলী চোখের চাহনির সামনে ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেছে। সে বলে—চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি। চাকরির খুব দরকার। বাড়িতে বিধবা মা—নাবালক ভাইবোন। ওদের না-খেয়ে মরতে হবে নাহলে। এখানে এসে মাথাটা ঘুরে গেল।

হরিপদবাবু শুনছে ওর কথা। একদিন চাকরির সন্ধানে সেও পথে পথে ঘুরেছিল। আর আজ মেয়েদেরও বের হতে হয়েছে পথে বাঁচার তাগিদে।

কবছরেই সারা দেশের সব নীতি কানুন বদলে গেছে, সমাজের রূপটাও বদলেছে। হরিপদবাবুও দেখেছে সেটা। বলেছে, শান্ত হও মা।

ধীরা বলে—আজ আমাদের কেউ নেই তাই—

হরিপদবাবু বলেন—যার কেউ নেই তার ভগবান আছে মা। দরখাস্তখানা দিয়ে যাও, আমি দেখছি। তুমি দিন-সাতেক পর একবার খবর নিও।

ধীরা বলে—আপনি আমার বাবার মত।

হরিপদবাবু মনে পড়ে নিজের বাড়ির কথা। তার মেয়েও বড় হয়েছে। লেখাপড়া তেমন করে নি। ছেলেটাও এক ক্লাশে তুবার গড়ান দিয়েছে। আজ তার কিছু হলে তাদের কি অবস্থা হবে কে জানে। তবু কিছুটা জমি কিনেছে খালের ওদিকে—এই যা ভরসা। না হলে তাদেরও এমনি ভাবেই ঘুরতে হবে।

হরিপদবাবুর চেষ্টাতেই চাকরিটা পেয়ে যায় ধীরা।

সেদিন সে প্রণাম করেছিল মানুষটাকে। ধীরা বলে, আপনিই আমাদের বাঁচালেন।

হাসে হরিপদ ঘোষ—কি যে বলো মা। পড়াশোনায় তুমি খুব ভালো, টাইপের হাতও ভালো। সাহেবরা দেখে শুনেই নিয়েছেন। তবে মা—হুন যার খাবে তার দিকটাও দেখবে। চাকরিই অন্নদাতা—তাকে অবহেলা করো না।

আজও ধীরা সেই কথাটা ভোলে নি। হরিপদবাবু দালাল নয়। বিজয়ার কথার পর ধীরা বলল,—হরিপদবাবু ভালো লোক। ওকে তোমরা চেনো না। আমি চিনি। স্টাফদের জন্য অনেক করেছেন। সাহেবরাও ওকে ভালোবাসত।

বিজয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল—তুমি থাম ধীরাদি। বুড়ো হয়েছে—রিটায়ার করে আবার এখানে আসে কেন? দালালি করে নিশ্চয়।

হরিপদবাবুর কানে এমন দু-একটা কথা আসে না তা নয়। তবে ওঁর সহ্য শক্তি একটু বেশীই। তার কারণ ওর দায়িত্ববোধ। কর্তব্যনিষ্ঠা।

ছত্রিশটা বছর এইখানে কাটিয়েছে, দেখেছে ওদিকের বিল্ডিং-এর ভিত পত্তন হতে। তখন এপাশের বাড়িটার দুটো তলা উঠেছিল তার দেখতা। সব খরচের বিলও তার নখদর্পণে। ভিত্তিপ্রস্তর গেঁথেছিলেন তখনকার ম্যানেজিং ডিরেক্টার লর্ড ইঞ্চকেপ সাহেব। বিলেত থেকে এসেছিলেন--রিচার্ড লর্ড ফ্যামিলির ছেলে।

সারা চত্বরটায় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল, নিচে সোনালী জরির কাজ করা চাঁদোয়া, সিংহাসন এসেছিল মল্লিক বাড়ি থেকে—আর এসেছিলেন গণ্য মান্য ব্যক্তিরা।

রাতের পার্টি হয়েছিল গ্রাণ্ড হোটেলে—ইলাহি ব্যাপার।

—হরিদা!

হরিপদবাবু চাইল, পিওন সুধানাথ ওকে দেখে নমস্কার করে।

সুধানাথ চেনে হরিবাবুকে।

ওর চাকরিও তার আমলেই। সুধানাথকে শুধোয় হরিপদ—কি রে চাকরি ক্যামন চলছে?

সুধানাথ জানে বড়বাবু বছর খানেক আগে রিটায়ার করেছে তবু রোজই আসে এখানে। সুধানাথ দেখেছে বাবুরা আড়ালে হাসাহাসি করে।

কল্যাণবাবু বলে—বুড়ো ভামকে একদিন গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

৮

সুশান্তবাবু, বিজয়া দিদিমণিদের আলোচনাও শুনেছে। সুধানাথের মনে হয় কথাটা জানাবে সে বড়বাবুকে। কিন্তু সুধানাথের মনে হয় বড়বাবুর মনের অবস্থা। লোকটার জন্য মায়া হয়।

ওর এলোমেলো চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল—কাদামাখা জামা দেখে বলে—কি হয়েছিল বড়বাবু?

বড়বাবু ডাকটা শোনার জন্যই যেন এখানে আসে রোজ হরিপদবাবু। বলে রাস্তায় পা হড়কে গেছলাম রে।

সুধানাথ বলে—এই বাদলার দিনেও কেন আসেন অপিসে?

অবাক হয় হরিপদ—কি বলিস রে? অপিস আসব না?

পরক্ষণেই কৈফিয়ৎ-এর সুরে বলে হরিপদবাবু, একদিন না এলে সব ভণ্ডুল করে দেবে এরা? সব সেকশনেই ফাঁকি দেবে? স্টেটমেণ্টগুলো সময়ে যাবে না। বিল সব বাকি থাকবে। আর কাজ যা হচ্ছে দেখছি তো। এমন করে ফাঁকি মারলে এতদিনের রক্ত দিয়ে গড়া কোম্পানী শেষ হয়ে যাবে রে। সেবার রিচার্ড সাহেব বলেছিলেন—হরিপডো অপিসটাকে দেখো। বড ভালো সাহেব ছিল রে—রিচার্ড সাহেব। যাই এ্যাডমিন সেকশনের স্টেটমেণ্ট-গুলো টাইমে গেল কিনা দেখি গে।

হরিপদবাবু উঠে গেল চারতলার দিকে। এবার বুঝতে পারে সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে। বয়সটা জানান দিচ্ছে। তবু এগিয়ে চলে সে।

দুপুরের বিবাদী বাগ-এর চেহারাটা অন্য রকম। কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের পানওয়ালা বাড়ুজ্যে বলে—এ ডবল বদমাইসীর পাড়া গো, ওদের খ্যাখনি? সকালে ওদের হাঁক ডাক সাড়া শব্দ থাকে না। যেন ঘুমন্ত পুরী, দুপুরে আড়িমুড়ি ছেড়ে ওঠে—খোঁয়ারি ভাঙে। আর বিকাল থেকে সাড়া জাগে, সাজগোজের বাহার শুরু হয়। পথে ঘাটে ভিড় জমছে। পানের দোকানে ঝকমকে বাতি জ্বলে, রাস্তার ধারের দোকানে ওঠে মাংস রান্নার কড়া খোসবু। বেলফুল—চাঁপাফুল ওয়ালারা হাঁক পাড়ে, লচকদার বাবুদের আনাগোনা শুরু হয়। ওঠে গানের সুর, তবলার র‍্যালা, ঘুঙুরের শব্দ। রং-রঙ্গিলার হাট বসে রাত ভোর। এও তেমনি। এই বিবাদী বাগও সকালে সুনসান—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এর রূপবদলের খেলা।

জেগে ওঠে পথগুলো। হাজার লক্ষ মানুষের আনাগোনা—ঠকবাজি ত হয়। পয়সার ধান্দায় নানা জন নানা পথে নানা মতলবে ঘোরে। কেরানী কুল আসে কাজের বদলে জীবনের পরমায়ু বিকিয়ে দিতে। এও যেন এ দেহপসারীর হাট, কর্তারা গাড়িতে এসে নামে। বিকি-কিনি রাজ্য ওল পালটের খেলা চলে দিন ভোর।

আবার সন্ধ্যা নামে—তখন শূন্য ক্লান্ত বিবাদী বাগ। পড়ে থাকে কি বাতিল মানুষ। পাহারাদার আর রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরের পাল। তখন এর রংবাহার ছুটে গেছে।

এও এক বদ পাড়া গো বাবু, বদমাইসদের আখড়া।

দুপুরে বিবাদী বাগে যেন হাট বসে। বাঁধা দোকান—ঝকঝকে রেস্তোরাঁ-গুলো জমে ওঠে। সেখানে অনেক ঘটা। তাই বাকি লক্ষ মানুষ সামান্য জলযোগ সারে এই পথের ধারে বসা হকারদের কাছে।

সব মেলে এই হাটে। ভাত-তরকারি, রুটি তড়কা— ধোসা-ইডলি-মুড়ি থেকে শুরু করে কলা, কমলা, আঙুর, আপেল, হাফ বয়েল কোয়াটার বয়েল ডিম, মায় টাকায় চারটে রসগোল্লা, বনগায়ের কাঁচাগোল্লা অবধি।

ওদিকে কে অয়েল ক্লথে ধ্যাবড়া কালির অক্ষরে নবগ্রহকে শান্ত করার বিজ্ঞাপন লিখে সামনে একরাশ লতা-শিকড়-গাছ নিয়ে বসে আছে।

তার চার পাশে ভিড় জমেছে অনেক বাবুদের। ইদানীং গ্রহরাজদের প্রকোপ নাকি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাদের কোপ থেকে বাঁচার জন্য সস্তায় এই লতাপাতার চাহিদাও বেড়েছে।

নমস্কার বড়বাবু।

পানওয়ালা ব'ড়ুজ্যে দেখছে হরিপদবাবুকে। হরিপদবাবু আগেকার মত এখনও দুপুরে অপিস ছেড়ে বের হয় বাইরের পথে। চাকরিতে থাকার সময়েও রোজ এই সময় বের হত হরিপদ ঘোষ।

ফুটপাথ থেকে মুড়ি চিনাবাদাম আর কলা খেত। কলার দর এখন আকাশ ছোঁয়া। একগাল মুড়িও চার আনার কমে মেলে না।

ওদিকের ঝকঝকে রেস্তোঁরায় বাবুদের ভিড় জমেছে। বাতাসে এখানে আশপাশে ওঠে রোস্ট ফ্রাই—চপ-এর মিষ্টি খোসবু। রিলায়েন্স গাঙ্গুরামের শো-কেসে দেখা যায় থরে থরে সাজানো রয়েছে বড় সাইজের রাজভোগ—জল ভরা তালশাঁস সন্দেশ—আরও কত মিষ্টি।

এসব এখানের উঁচুতলার কেরানী কুলের জন্যে। ব্যাঙ্ক, বড় মার্চেন্ট
...সের বাবুদের মাইনে এখন চারের কোঠায়, কাজ কি করে তা দেখেছে
...দবাবু। ওইসব ভাগ্যবানদের জন্যে এসব সাজানো থাকে। ভিতরে
... শব্দ ওঠে—দামী কিংসাইজের সিগ্রেট পোড়ে—ধোঁয়া ওঠে।

...হরিপদবাবু চাকরির শেষ মাসেও এতকাল ধরে কাজ করে অপিস চালিয়ে
...ঙ্কের কোঠাতে উঠতে পারে নি।

...তার অনেক পরে ঢুকে নীলু মিত্তির, ছাতুবাবুরা স্রেফ সাহেবদের
...মুদি করে আর চুকলি খেয়ে, অফিসার হয়ে গেছে। আজও চাকরি
... নীলু মিত্তির।

...নিজের আলাদা ঘর পেয়েছে, বেয়ারা বসে থাকে টুলে তার ঘরের
...র। ও নীলু মিত্তিরকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছিল হরিপদবাবু।

...একগাল মুড়ি কখন শেষ হয়ে গেছে। রাস্তার কলের জল খেয়েই টিফিন
... হরিপদ। মুড়ির সঙ্গে লঙ্কাটা ছিল খুব ঝাল। হরিপদবাবুর মনে হয়
...ং ঝাল খুব বেড়েছে লঙ্কাগুলোয়, আর বাড়বে নাই বা কেন? মানুষের
... কত বেড়ে গেছে।

...তাহলে আগে দেখত ট্রামে বাসে—পথে কত আনন্দে হাসিতে সোরগোল
লোকজন যাতায়াত করত, খোশ গল্প করত।

এখন সকলেরই মুখ বোজা। টুক করলেই তেরিয়া হয়ে চেল্লামেল্লি শুরু
যেন ঝগড়া আর ঝালঝাড়ার উপরই জীবনটা নির্ভর করছে।

কখন এলেন বড়বাবু?

...হরিপদবাবুর এতদিনের অভ্যাসটা যায় নি। মানুষ অভ্যাসের দাস।
...জন্যই রিটায়ার করার পরও হরিপদবাবু রোজ অপিসের দায়িত্বের কথা মনে
...ই ছুটে আসে। অপিসে সেকশনে ঘোরে।

টিফিনও করতে বের হয়। সে টিফিন যাইই হোক না কেন। আর
নের পর ঠিক আগেকার মতই এসেছে ব্যানার্জির পানের দোকানে।

ব্যানার্জি পানওয়ালা বিবাদী বাগের এই রাস্তার ধারে এসে পানের পশরা
...য়ে বসে আছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। লোকটা দেখেছে এখানের
...তব অনেক বিচিত্র ঘটনা। আজ পড়েছে ছেলেটাকে নিয়ে। বলে
...ক—ব্যাটা চাকরি খুঁজছিস? বামুনের ছেলে হয়ে? এ্যাঁ—তাও থার্ড
...শনের ম্যাট্রিক। ওরে বাবা সিডিউল কাষ্ট না হয় আদিবাসী হয়ে

জন্মাস নি, বামুন কায়েতের ঘরে জন্মে থার্ড কেলাস হয়ে মানুষের খাত বাতিল হয়ে গেছিস বাবা। কিস্সু হবে না এখানে। কিলিন কে তোর পিওর জালি কেস। ফোট বাবা।

ওদিকে পানে চুন মশলা লাগিয়ে চলেছে হাতে আর মুখে খই ছেলেটা বলে কাঁদ কাঁদ স্বরে—একটা কিছু নাহলে বাবা মা না খেে কত দিন ঘুরছি।

ব্যানার্জি বলে—বৈকালে আয়, তা বিজিনেস করবি? সব যাবে। খেটে খাবি।

ছেলেটা তাতেই রাজি।

এ সময় হরিপদবাবুকে দেখে ফিরে চাইল বাড়ুজ্যে।

—এক বাণ্ডিল কাল সুতোর বিড়ি—একটা পান চারশো বাইশ জর্দা জলদি করো—ওদিকে দাস সাহেবের স্টেটমেণ্ট বাকি।

বাড়ুজ্যে দেখছে হরিপদবাবুকে। হাসে সে। বলে—ঘোড়াট. বাঁধুন বড়বাবু। অপিস পালিয়ে যাবে না। আর বিনি মাইনে খাটবেন?

বাড়ুজ্যে জানে লোকটা যেচে অপিসে আসে। ওই অফিসের অনে এখানে পান-সিগ্রেট নেয়, তারাই বলে। এমন সময় সুশান্ত আর বি আসতে দেখলে হরিপদ। সুশান্ত বলে—এক প্যাকেট রিজেন্ট কিং জলদি।

একটা পাঁচ টাকার নোট শুকনো পাতার মত ছিটিয়ে দিয়ে দাম দামী সিগ্রেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়েছে, খুচরো কি পেল দেখার করে না। পকেটে পুরে পাশে দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল দুজনে হয়ে গেল।

হরিপদ অবাক হয়। বলে, এ সময় অপিস ছেড়ে দুজনে কোথায় বাড়ুজ্যে বলে—ওসব খপরে আপনার দরকার কি বড়বাবু?

হরিপদ বলে,—ওদিকে অফিস ডিসিপ্লিন, কাজ—এসব কেউ না?

বাড়ুজ্যে বলে—আপনার দেখার কি দরকার? নিন?

পান বিড়ি নিয়ে পায়ে পায়ে এগোলো হরিপদ অপিসের দিকে।

অপিসের হলগুলো প্রায় খালি।

্-চারজন ফিরেছে, তারা টুকটাক কাজ করছে মাত্র। বাকি অনেকে
র্ডর ফাকা জায়গায় কি সব পতাকা টতাকা নিয়ে মিটিং করছে।

চেঞ্জ সেকশনের একটি ছেলে উস্কোখুস্কো চুল—চোখে পুরু লেন্সের
। পরে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করছে, এই ম্যানেজমেণ্ট-এর অন্যায় শাসন
রা মানবো না। টিফিনের দাবি মেনে নিতে হবে। সেকশনে ওয়াটার
বসাতে হবে যাতে ঠাণ্ডা জল পাই। আর জানলায় খস খস-এর পর্দা
ত হবে। তাতে জল দেবার জন্য লোক রাখতে হবে ইউনিয়নের মত
।

হরিপদবাবু শুনছে কথাগুলো। অনেকেই দু-চারজন তার চেনা—তার
লের ছেলে। বলে হরিপদবাবু, কি হচ্ছে এখানে? এ্যাই রতন—কি হে
? এ্যাঁ কাজ ফেলে কি করছো?

তারা জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করে না।

হরিপদবাবু বলে—সেকশনে যাও সবাই। ওসব পরে হবে।

একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে লেকচার দিচ্ছিল পন্টু ঘোষ। সে চীৎকার করে
নায়—ভাই সব, ওই মালিকের দালালদের কোনো কথায় কান দেবেন না।
আমাদের জাতশত্রু।

পরেই গলা ফাটিয়ে স্লোগান দেয়:

—দালালদের হালাল করো।

ভিড়ের মধ্য থেকে বীরু, রতন হরিবাবুকে একদিকে নিয়ে আসে দূরে,
ও অদৃশ্য দালালদের হালাল করার শপথ উচ্চারিত হচ্ছে।

হরিবাবু বলে—আমি দালাল? কি বলছে ওরা?

বুড়োর দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। বলে সে,—ওই পন্টু ঘোষ-এর
করিতে আমিই রেকমেণ্ড করেছিলাম পিনকল সাহেবকে। তবে না ওর
রি আজ। বীরু ওকে থামাবার চেষ্টা করে। বলে সে—আপনি যান
দা।

হরিপদবাবু চুপ করেই উঠে এল এ্যাডমিন সেকশনের চারতলার দিকে।
তার পুরোনো জায়গা—ওখান থেকেই রিটায়ার করেছিল হরিপদ কেরানী
রখানেক আগে।

…এ্যাডমিন সেকশনে এখনও পুরোনো দু-চারজন সহকর্মী বন্ধু আছে।
রটা এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অপিসে। ইউনিয়ন মিটিং-এ গিয়ে হরিপদ-

বাবু বাধা দিয়েছে। তাই নিয়ে ইউনিয়ন-এর অন্যতম পাণ্ডা পল্টু তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছে।

বলাই সেন ক্লান্ত অপমানিত হরিপদবাবুকে ঢুকতে দেখে বলে,—কেন গেছলেন হরিপদদা ?

হরিপদবাবু বলে—এমনি করে অফিসের কাজ নষ্ট করবে ?

ওরা লোকটাকে বুঝিয়ে পারে নি এতদিন।—বলে মদন দত্ত।—ে দাও হরিদা। অপিসে এসে বেড়িয়ে চলে যাবে। ওসবে নজর দিও না।

তবু হরিপদ সেদিন গিয়ে হাজির হয় নীলু মিত্তিরের চেম্বারে।

—কি হে নীলু।

নীলু মিত্তির অতীতে এ অপিসে সামান্য কেরানী হয়েই ঢুকেছিল, হরিপদবাবুর সেকশনেই। সেদিন হরিপদবাবুই রেকমেণ্ড করেছিল ' পিলকিন সাহেবের কাছে—এ গুড ওয়ার্কার স্যার।

হরিপদবাবু বলে—মন দিয়ে ডিলিং শেখো ছোকরা, লেখাপড়া জা উন্নতি হবে। এই ফাইলটা দেখে নাও—সব নোট দিয়েছি। ক্যামন ব নোট দিতে হয় ফাইলে এটা শিখতে হবে—ব্যস, তাহলেই দেখবে চি ড্রাফটিং এসে যাবে।

সেই নীলু মিত্তির আজ নিজের এলেমের জোরে ধাপে ধাপে উপরে এসে এখন লেবার অফিসার হয়েছে। আড়াই হাজারী মনসবদার।

অবশ্য সেবার অপিসে ধর্মঘট হয়েছিল—ওই হরিবাবুও সেদিন কর্মচারীে সামিল হয়েছিলেন। তখন বড়সাহেব এণ্ডারসন। ঘুদে লোক।

হরিপদবাবুর মত একনিষ্ঠ কর্মীকে তিনি চেনেন, সারা অপিসের কাজ নখদর্পণে। দায়ে অদায়ে হরিপদই ভরসা। সাহেবদের ডান হাত। ে হরিপদকেই ডাকিয়েছেন তিনি।

—এসব কি করছো হরিপডো ?

হরিপদ বলে—ওদের দাবি অন্যায় না স্যার ? নাথিং রং। তোমরা এ মেনে নাও।

সাহেব চুপ করে যান।

ষ্ট্রাইক শুরু হল। হরিপদও সেদিন কর্মচারীদের দলে। এগিয়ে আ নীলু মিত্তির, আই হেট দেম স্যার। ভ্যাট গুপীনাথ, মদন দত্ত, বিকাশ আর মেন কালপ্রিট।

সাহেব সেদিন নীলু মিস্ত্রিরের পিঠ চাপড়ে বলে,—ইউ আর এ রিয়েল ম্যান নীলু। কিছু কাগজপত্র যোগাড় করো, ওদের যাতে চার্জসিট করে স্যাক করতে পারি ?

—ইয়েস স্যার। নীলু মিস্ত্রির এবার করণীয় কাজ পেয়েছে। বড়সাহেব কিছু টাকাও দেন গোপনে। বলেন, ট্রাই টু পারচেজ সামবডি, যে তোমাকে এ বিষয়ে হেল্প করবে।

ছাতু বাবুই এগিয়ে আসে টাকায় লোভে। রেস খেলে সে। দেনাও বেড়েছে। ছাতুবাবু ওদিকে ধর্মঘটী কর্মচারীদের সঙ্গে জোর গলা মিলিয়ে স্লোগান দেয়। মিটিং-এ থাকে।

রাতের অন্ধকারে আসে নীলু মিস্ত্রিরের বাড়িতে। বের হয় খুশি মনে বশ মেজাজ নিয়ে। পকেটে টাকাও আসে আর নিজে মাল খায় না নীলু মিস্ত্রির, কিন্তু ওকে খাওয়ায়।

তেইশদিন ধর্মঘটের পর মিটমাট করল কর্তৃপক্ষ, বড়বাবুদের সতেরো টাকা—কেরানীদের চৌদ্দ টাকা তেষট্টি পয়সা আর বেয়ারাদের মাইনে হিসাব নিকাশ করে বেড়েছিল ন টাকা বাইশ পয়সা।

কিন্তু চার্জ সিট হল আট দশ জনের।

সেদিন হরিপদবাবু গিয়ে বড় সাহেবের সামনে কেঁদে পড়েছিল প্রায়। সেভ দেম স্যার। অল পুওর ম্যান—পানিশ মি ইফ ইউ ওয়াণ্ট স্যার, বাট ফরগিভ দেম ইউ ফাদার-মাদার। নেভার ওরা এসব করবে।

হরিপদবাবু দেখে নীলু মিস্ত্রির বড়সাহেবের ঘরে। দুজনে কি আলোচনা হয় গলা নামিয়ে। বড় সাহেব চতুর লোক। তিনি জানেন কখন কি পন্থা নিতে হয়। হরিপদবাবুকেও মনে মনে ভালোবাসেন—অপিসের ঘুণ। তাই বলেন,—কাম ইন দি আফটারনুন। সাহেবের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মুখ শুকনো কর্মচারীদের দল। আজ হরিদাই তাদের ভরসা। ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে গুপীনাথ, রতন, মহিম, মদনের দল। ওদের শিয়রে এখন শমন।

অনেকেই ব্যাকুল কণ্ঠে শুধোয়—সাহেব কি বলেন হরিদা ?

সেই ধর্মঘটের তেজ কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে। এদের মুখ চোখে বিষণ্ণতার ছায়া।

হরিপদবাবু নিজে ওদের একজন। জানেন চাকরী গেলে কেরানীদের করার কিছুই নেই। সপরিবারে উপবাস দিতে হবে না হয় পথে পথে ঘুরতে হবে ভিক্ষার সন্ধানে। সেটা পারবে না অনেকেই—মধ্যবিত্ত মানসিকতা নিয়ে উপোস দিয়েই শেষ হয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে।

হরিপদ বলে—দেখছি চেষ্টা করে, পরে যেতে বলেছেন সাহেব। আশ্বাস দেয় সে।

—এত কি ভাবছিস রে? সাহেবের হাতে পায়ে ধরে একটা পথ করবই।

গুপীনাথ বলে—ওই নীলু মিস্তিরটাই শয়তান হরিদা, আর ছাতুবাবুকে চিনতে পারি নি। ওরাই সর্বনাশ না করে?

হরিবাবু বলে—ঠাকুর কি করেন ছাখা যাক।

হরিপদবাবুকে বৈকালে হেণ্ডারসন সাহেব যাতা বলেন, হরিবাবু নির্বিকার। বলে সে, কিল মি সাহেব, বাট ফরগিভ দেম। দেয়ার ফ্যামিলি ডাই সাহেব, ইউ ফাদার-মাদার।

সকলকেই বাঁচিয়ে দিল কিন্তু গুপী আর ভূপেনকে পারেনি। তারা নাকি অফিসের রেকর্ডপত্র নষ্ট করেছে, দু-একজন সাহেবকে মারতে গেছল। প্রমাণও আছে—

কিছু কাগজ কিছু চিঠি—ইস্তাহারের মূল খসড়া বের করেন সাহেব—লুক হরিপডো—দে আর ডেঞ্জারাস। আই স্পাল স্যাক দেম, নট আদারস. ডোণ্ট রিকোয়েস্ট ফারদার। গো। ফর ইউ আই হ্যাভ ডান এ লট।

ন-জন আসামীর মধ্যে সাতজনকে বাঁচিয়েছিল হরিপদবাবু, দুজনের চাকরি গেল।

চোখে জল পড়েছিল সেদিন হরিপদবাবুর। গুপী-ভূপেনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে,—তোদের হরিদাকে ক্ষমা করিস রে? পারলাম না ভাই কিছু করতে।

সারা অপিসে সেদিন স্তব্ধতা নেমেছিল। হরিপদকে সেদিন ওরা সকলে নতুন করে চিনেছিল এই বিপদের দিনে!

এর কিছুদিন পরই নীলু মিস্তির-এর উন্নতি হল চারতলার সাহেবদের ঘরের এক কোণে, এখানে কোনো সেকশন নেই। সব সাহেবদের নিজের নিজের ঘর, এক কোণে নতুন দুটো ঘর হল।

নীলু মিস্তির হল লেবার অফিসার আর ছাতুবাবু হল সেকেণ্ড অফিসার।

ছাতুবাবুর সঙ্গে অবশ্য দু-একজন সাহেবের ভাব আগেই ছিল, সে ওদের

াকি ঘোড়ার মুখ থেকে শোনা রেসের টিপস এনে দিত। তার আরও সুবিধা ল।

নীলু মিস্ত্রির তার তুলনায় একটু গম্ভীর, তবে সাহেবদের সামনে তার প আলাদা। ইতিমধ্যে তার তাঁবের লোকও কিছু অপিসে ঢুকেছে। তাদের ড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন সেকশনে।

তারা সবকিছু শোনে—দেখে, আর সেগুলো এসে জানায় নীলু মিস্ত্রিরকে।

নীলু মিস্ত্রির আজ তাদের মূলধন করে অপিসের কর্তাদের কাছে নাম কনছে। সেবার প্রমোশনের সময় অবশ্য হেণ্ডারসন সাহেব ছিলেন না। পিনকিন্স সাহেবকে হাত করে হরিপদবাবুর নামটাকে পিছনে ফেলে প্রমোশন পেল ছাতুবাবু।

হরিপদবাবু নাকি অপিসের কর্মচারীদের সমর্থন করে, স্ট্রাইকেও যোগ দিয়েছিল। তাদের হয়ে বড়সাহেবের কাছে দরবার করে ওই বিশ্বাসঘাতক র্মচারীদের শাস্তি মকুব করেছিল।

সেই নীলু মিস্ত্রিরের চেম্বারে ঢুকেছে আজ হরিপদ।

হরিপদ অনেকদিন এখানে আসেনি। দেখছে ঘরখানাকে। এয়ারকুলার মেশিন চলছে। ঘরের মধ্যে গরম নেই, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। পায়ের নিচে ব্লু জুট কার্পেট পাতা, চেয়ারগুলো গদরেজ কোম্পানীর তৈরি, নীলু মিস্ত্রির-এর গদিমোড়া হাইনেক রিভলভিং চেয়ারটার দাম কয়েক হাজার টাকা।

নীলু মিস্ত্রির হরিপদবাবুর দিকে তাকাল। ওর পরনে গলাবন্ধ সাবেকী আমলের কোট, ময়লা ধুতি—জামাটায় ঘামের দাগ, পায়ে ছেঁড়া কেডস। মূর্তিমান একটা কেরানীর শেষ পরিণতির ছবি। নীলু মিস্ত্রির গম্ভীর হয়ে বলে—কি চাই ?

হরিপদবাবুকে বসতেও বলে না।

হরিপদ বলে, বাইরের মাঠে সব স্টাফ কি করছে, অপিসের কাজ, ডিসিপ্লিন এসব ও দেখবে না ? কি করছো ? যেন কৈফিয়ৎ চাইছে সে নীলু মিস্ত্রিরের কাছে।

চটে উঠেছে নীলু মিস্ত্রির। আজ ইউনিয়নকে সে চটাতে চায় না। কারণ কোম্পানীর নতুন ডিরেক্টাররাও ধীরে ধীরে কাজে বাধা এনে তারা প্রডাকশন —আমদানী কমিয়ে ফেলে কোম্পানীর লাভের অংশ কমাতে চায়। বেশি

লাভ হলেও ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ অনেক বেশি চলে গিয়ে যা থাকে সে আদৌ লাভের নয়। তাই তাদের নীরব প্রশ্রয় রয়েছে এতে। আর নী মিত্তিরও ইউনিয়নকে খুশি রেখে জনপ্রিয় হয়ে তার চাকরি বজায় রেখে মাে শেষে আড়াই হাজার টাকা ঘরে তুলছে।

এসময় সেই লোকটাকে এসব কথা বলতে দেখে মনে হয় দরোয়ান দিে বের করে দেবে। কিন্তু রাগটা চেপে যায় নীলু মিত্তির এখন অন্য কৌশ গুলো সে সব শিখে গেছে।

সে বলে নরম দরদ ভরা সুরে, আপনারা থাকলে ভরসা পেতাম হরিবা এখন তেমন লোক কেউ নেই। তাই ইচ্ছে থাকলেও কড়া ষ্টেপ নিতে পা না। ওদের ঠাণ্ডা করা দরকার। কাজে ফাঁকি দেবে?

হরিপদ একটু নরম হয়, মনে হয়, নীলু মিত্তির আজও তাকে সম্ম করে। এর মধ্যে নীলু মিত্তির বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে কফির অর্ডা দিয়েছে।

হরিবাবু বলে—সত্যিই খুব অসুবিধায় আছো বুঝছি। তবু অপিসে তো দেখতে হবে। আরে বাবা—ইউনিয়ন করবি কর, তাই বলে কাজে ফাঁ দিবি কেন? ওই তোমার সুশান্ত আর বিজয়াকে দেখলাম ছুটোর সময় যুগে বের হয়ে গেলেন। এসব কি?

নীলু মিত্তির কৃত্রিম হাসিভরা মুখখানা চকিতের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে সুশান্ত তার হাতের লোক, বিজয়াও মেয়ে মহলে খুব পরিচিত। তাদে সম্বন্ধে হরিপদবাবুর এই মন্তব্যটা তার ভালো লাগে না। জানে নীলু বুে হরিপদ একথা নানা সেকশনে প্রকাশ্যে বলে বেড়াবে।

ডিরেক্টার মিঃ মালহোত্রা তবু কড়া লোক। তার কানে উঠলে নী মিত্তিরকে অন্য ষ্টেপ নিতে হবে, অর্থাৎ ইউনিয়নও তাকে ছাড়বে না। বিপ ঘনিয়ে আনতে পারে ওই বুড়োটা। ও রিটায়ার করেও শান্তিতে থাকতে দেবে না।

কফি এসেছে। সুগন্ধ ওঠে, দুধ মেশানো ঘন ফেনাওয়ালা কফি। দোকাে এর অনেক দাম। অফিসাররা এমনি পায়, সঙ্গে বিস্কুটও।

হরিপদ বিস্কুট সহযোগে তারিয়ে তারিয়ে কফি খাচ্ছে। নীলু মিত্তি বলে—আমি দেখছি হরিপদবাবু। তবে ভরসা দেবার কেউ নেই।

হরিপদ বলে—কেন? আমি তো রোজই অপিসে আসি। বুঝে

মণ্টে জল মেশাতে হবে সেটাও শিখিয়ে দিতে হয় অখিল, নন্দদের।
চিঠির ড্রাফটিং তেমনি।

নীলু মিত্তির সায় দেয়—যা বলেছেন। সব হোপলেস।

হরিপদ বলে—রোজ আসি। দরকার হয় ডাকবে। আরে হাতে ধরে শিখিয়েছি, এখনও সাহায্য করব বৈকি। তবু অফিসটাকে ডুবতে দেব। চলি—

বের হয়ে গেল হরিপদ। ও চলে যাবার পর নীলুর মুখ চোখ কঠিন হয়ে বেল বাজাতে বেয়ারা ঢোকে।

নীলু মিত্তির কঠিন স্বরে বলে—বাইরে বসে কি করো? যে সে লোক আসে ভিতরে?

পুরোনো বেয়ারা বিপিন বলে—উনি আপনার চেনা, এতকাল কাজ য়েছেন এখানে…

—স্যাট আপ! নীলু গর্জে ওঠে। বলে সে—উইদাউট পারমিশনে টকে ভিতরে আসতে দেবে না। স্লিপ দিতে হবে। বুঝলে?

বেয়ারা মাথা নাড়ে।

নীলু মিত্তির কেয়ারটেকারকেই ফোন করবে ভাবছে, গেটে যেন বলে খ ওকে ঢুকতে দেবে না। যাতে ওই বুড়ো শয়তানটাকে গেটেই আটকায়, ফিসের ভিতরে এসে কোনোরকম গোলমাল না বাধাতে পারে। কিন্তু এটা এক্তিয়ারের বাইরে। তাই কি ভেবে ফোনটা নামিয়ে রাখে। বলে সে বেয়ারাকে—ইউনিয়নের পণ্টুবাবুকে একবার দেখা করতে বলো আমার সঙ্গে।

বেয়ারা বের হয়ে গেল।

নীলু মিত্তির এবার অন্য পথই নেবে। তার সাম্রাজ্যে এই বাতিল বুড়োর ঠাঁই নেই।

খুশি মনে নেমে আসছে হরিপদ।

এ্যাডমিন সেকশনে বিজয়ীর মত ঢুকে বলে—দিয়েছি তোমাদের নীলু আচ্ছাসে কড়কে। কাঁচুমাচু মুখ করে বসে রইল চুপসে।

ওপাশের চেয়ারে বসে বলে,—কফি বিস্কুট খাওয়াল, ছাড়ল না। বলে -হরিদা, দিন বদলে গেছে। পাশে আর ভরসা দেবার কেউ নেই।

হঠাৎ খেয়াল হয় তার—কই হে অতুল, তোমার মান্থলি রিপোর্ট তৈরি হল?

অতুল ওকে এড়াবার জন্য বলে,—একটু বাকি আছে বড়বাবু ?

হরিপদবাবু কোটের পকেট থেকে কালো কার বাঁধা ডোম্বা করে। ওটা তার বহুদিনের সঙ্গী। অপিসে সেবার সময় নিষ্ঠার হিসেবে ঘড়িটা দিয়েছিলেন হেণ্ডারসন সাহেব। প্রতিটি দিন ওর কাঁটা দশ ঘর ছোঁবার আগেই এসে পড়ত হরিপদ।

ঘোষসাহেব বলত—এ যে ঘড়ির মত চলো হে ?

আজও সেই ঘড়িটা রয়েছে। হরিপদ হাত বুলিয়ে যেন হারানো অং অনেক মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে স্মরণ করতে পারে।

হরিবাবু বলে—পাঁচটা বাজে হে। চলি, না হলে আর গাড়িতে যাবে না। যা ভিড় বেড়েছে দিনে দিনে—অতুল, রিপোর্টটা করে দেখো যেন কোনো পয়েণ্ট বাদ না যায়। কাল দেখে দেবো। চলি হে—

খুশি মনে বের হলো হরিপদবাবু আজকের অপিস সেরে।

বাড়ুজ্যে পানওয়ালার দোকানে ভিড় রয়েছে, দিন শেষের ভিড়। আর একটা জর্দা পান মুখে দিয়ে এবার হাঁটতে শুরু করে শিয়ালদা দিকে। ছটা বারোর লোক্যাল ধরতে হবে।

ইদানীং ওই কেষ্টপুরের পাট উঠে গেছে, নতুন করে আশ্রয় নিতে নিমতার ওদিকে।

কেষ্টপুরের জমি ঘর যাওয়ার কারণটা ও অতি সাধারণ।

শরিকানা সম্পত্তি, এককালে খালের ধারে বাঁশবন, পচা ডোবা দু-চ আম-গাবগাছ ছিল। দু-এককাঠা জমিতে তরিতরকারিও হত। এ বসতি নেই। শুধু খাল—বাঁশবন—কচুরি পানা ঢাকা জলাভূমি। সেই জমির বিস্তার চলে গেছে দূর ভাঙড় পর্যন্ত।

মাঝে মাঝে মেছো ভেড়ি জমেছে নল খাগড়ার বন। উঁচু ঢিবির ওই জলাজমির বুকে দু-চার ঘর জেলেদের বাস। তারা মাছ ধরে ওই তাদের জীবিকা। কলকাতার পূবদিকের ছবিটা এমনিই দেখে ছেলেবেলা থেকে হরিপদ ঘোষ।

হঠাৎ এলো যুদ্ধ। তারপরই দেশ বিভাগের পালা। তখন হরিপদ কিলমার এ্যাণ্ড প্যাট্রিক কোম্পানীর ডেসপ্যাচ সেকশনে। হু হু করে ব্যবসা বাড়ছে। মিলিটারী সাপ্লাই যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকার। নতুন খোলা হচ্ছে, ফ্যাক্টরি বাড়ানো হচ্ছে।

মাইনেও তার এক ধমকে বেড়ে গেল চল্লিশ টাকা। ওই শিয়ালদা স্টেশনে ।দিন লোক ধরে না। সারা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ এসে ভিড় রেছে এখানে। সারা কলকাতা ভরে গেছে যেন সেই দেশবিতাড়িত ানুষদের ভিড়ে। মানুষগুলো প্রাণ ভয়ে এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

কিছুদিন পর তারা এবার তাদের আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয় দল বেঁধে। রিয়া হয়ে ওঠে তারা।

সেদিন খুশি মনে বাড়ি ফিরছে হরিপদ। এক ধাক্কাতে মাইনে বেড়েছে ার চল্লিশ টাকা। শিয়ালদা থেকে একটা মাছ কিনেছে এরিয়ার পেয়ে। লকপিও কিনেছে। গিন্নীকে চমকে দেবে।

করুণাময়ী নামটা কেন যে তার বাবা-মা রেখেছিল এটা আজও বুঝতে পারে না। চেহারা বা কথায় করুণার কোনো চিহ্নই ফুটে ওঠে না।

এর মধ্যে তিনটে ছেলেমেয়েও হয়েছে।

বড় মেয়ে মালতী মায়ের সংসারের কাজ দেখে, বাবাকে সাতটা বাহান্নোর াড়ির ভাত রেঁধে দেয়। ভোরে উঠে চারখানা রুটি আর আলু চচ্চড়ি করে কৌটায় পুরে দেয়। তবু টিফিন খরচাটা বাঁচে!

করুণাময়ী ওঠে বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ। তখনই চা না পেলেই অনর্থ বাধাবে।

—অ মালু মুখপুড়ি, বাপ সোহাগী। বলি, মানুষটা চা খাবে এককাপ, তাও দিবি না?

ছোট মেয়ে লতিকা স্কুল যায়, বাগুইহাটির কোনো স্কুলে পড়ে। লতিকা দেখতে একটু ছিমছাম। মায়ের মুখের আদল, গায়ের রং পেয়েছে। হয়তো ভাবটাও। মালতী সে তুলনায় কালো। বয়স হয়েছে। এখনও বিয়ের কোনো ঠিকই হয়নি। দু-চারজন দেখতে আসে কিন্তু পরে জানাবে বলে আর জবাবও দেয় নি।

করুণাময়ী চা খেয়ে হাঁক পাড়ে মালতীকে,—পান দোক্তা দিতে হয় একটু তা জানিস না?

চোরের মত বার হয়ে আসে বাড়ি থেকে হরিপদ। গিন্নির সামনে পড়লেই ফর্দ শুরু হবে আর অনুযোগ করবে, এটা হয়নি, ওটা হয়নি। মামার বাড়ির বিয়েতে যেতে হবে, একখান গহনা নাহলে চলবে না। লতুর ইস্কুলের শাড়ি চাই—ক্যাদ্দিন বলব। কানে কথা যায় না?

হরিপদর দিনটা তাই অপিসেই কাটে। সেখানে শান্তিতে থাকে। কেউ কথা শোনাবার নেই। নিজের কাজে ডুবে থাকে সে।

বড়ছেলে বাসুদেবকে স্কুলে ভর্তি করেছে। হরিপদ স্বপ্ন দেখে বাসুদেব বড় হলে তাকেও সাহেবদের ধরে করে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবে।

কিন্তু বাসুদেব এর মধ্যেই এক এক ক্লাশে দু বছর করে গড়াচ্ছে। তাই নিয়ে সেদিন হরিপদবাবু ওর মার্কশীট দেখে ছেলেটাকে দুটো থাপ্পড় কষাতেই করুণাময়ী লাফ দিয়ে ওঠে,—খবরদার মারবে না ছেলেকে? নিজে সারাদিন অপিস কাছারির নাম করে কোন ধিঙ্গীদের পেছনে ঘোরো, লজ্জা করে না? রাত করে বাড়ি ফেরো। আবার ছেলেকে মারবে?

কিছু বলতে চায়, হরিপদ। কিন্তু করুণাময়ীর ওই নোংরা কথাগুলো বেড়ে ওঠে,—মুখে আগুন এমন লোকের? ঝাঁটা মারি মুখে—তারপরই শুরু হয় করুণাময়ীর গান বাদ্যি। কোথায় কবে কি হয়েছিল তাই নিয়েই চিৎকার শুরু হয়। ছেলেও মায়ের সমর্থন পেয়ে বাবার শাসন এড়িয়ে চলে।

সংসারে দুঃখ। জাঁহাবাজ বউ। অন্ধকার জীবনে আলোর আভাস আনে ওই অপিসটুকুই। ওখানেই তার সান্ত্বনা মেলে। তাই কাজে ডুবে থাকে। অপিসের লোকদের ভালোবাসা—শ্রদ্ধাই তার শূন্যতার মাঝে কিছু স্নিগ্ধতার অবকাশ আনে।

আজ খুশির খবর নিয়ে ফিরছে হরিপদ। চল্লিশ টাকা মাইনে বেড়েছে।

সন্ধ্যা নেমেছে। বাড়ির এদিকে এসে একটু অবাক হয় হরিপদ। বাঁশ বন—জলা কিছু পতিত মাঠে দেখা যায় লোকজনের ভিড়। ব্যস্ত হয়ে কারা ছুটোছুটি করছে! বাঁশ খোঁটা পুঁতে দড়ি বেঁধে হোগলা মুলী বাঁশের বেড়া দিচ্ছে কারা, দু-একটা টর্চ জ্বলে। ট্রাকও এসেছে একখানা। তার থেকে মালপত্র নামছে।

ওদিকে গ্রামের লোকদের কলরব শোনা যায়।

করুণাময়ীর গলাও ভেসে আসে। হরিপদ জানে ওর স্বভাব। হয়তো পাড়ার কারোও সঙ্গে ঝগড়া বেধেছে।

এগিয়ে গিয়ে অবাক হয় হরিপদ। বাসুদেবের চিৎকার শোনা যায়। তাদের বাড়ির লাগোয়া মাঠ, জমিতেও কারা খোঁটা পুঁতে দখল নিয়েছে। বাধা দিতে গিয়েও পারে নি। সব ফাঁকা মাঠ জমি—বাঁশ বনের জবর দখল চালিয়ে ওই লোকগুলো মরিয়া হয়ে আস্তানা গেড়েছে।

়ানা পুলিশ করেও লাভ হয় নি ;

সকাল বেলা শুধু হরিপদ কেন আশপাশের লোকজনরাও দেখে তাদের জমি সব বেহাত হয়ে গেছে। সেখানে গড়ে উঠেছে রাতারাতি মুলিবাঁশ নতুন এক কলোনী।

কয়েকশো লোকজন ছেলেমেয়েরা কলরব করছে। হরিপদদের বের হবার ও প্রায় বন্ধ।

করুণাময়ী বলে—এখানে বাস করাও যাবে না। আর এই ছন্নছাড়াদের বনবেও না। চলো—এসব বেচে দিয়ে দাদার ওদিকেই চলে যাই—তার দিকে।

গাড়িটা চলেছে দমদম ছাড়িয়ে। আজ দশ বছর হয়ে গেল সেই ুরের সবুজ জগৎটা হারিয়ে গেছে হরিপদর জীবন থেকে। সেই ুর থেকে তারাও উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে এখানে।

ক-বছরেই হরিপদর হিসেবটা বদলে গেছে একেবারে। ট্রেনেও ভিড় ড়ছে। ট্রাম বোঝাই লোক। আগে এমনি ছিল না। ক-বছর আগেও আরামে যাওয়া যেতো। এখন? দমবন্ধ হয়ে আসে। কলরব।

আর ফেরিওয়ালাদের রকমারি চিৎকার কানে আসে। বেড়েছে মেয়েদের ও। অপিসে বিবাদী বাগেও দেখেছে হরিপদ ওদের ভিড়। শিয়ালদা নের আশপাশেও দেখেছে মেয়েদের সেজে গুজে ঘুরতে। ওদের হাসির শব্দ ওঠে।

এসব কাণ্ড আগেও দেখেনি সে।

কি করতে যায় ওরা কলকাতায় কে জানে!

বেলঘরিয়া স্টেশন এসে গেছে। কাতারে কাতারে লোক নামছে। ত হয় না নিজেকে—দরজার ধারে কাছে এলে ভিড়ের চাপেই ঠেলে ়য়ে দেয়।

প্ল্যাটফর্মে লোকজন গিসগিস করছে, আবছা আলো রয়েছে এখানে। ৎ হরিপদ থমকে দাঁড়াল কার যেন হাসির শব্দে। ডাউন প্ল্যাটফর্মে এখন ে নেই। কলকাতা যাবার তাড়া থাকে না সন্ধ্যার পর।

এদিকটা ফাঁকা—কিছু ছেলেমেয়েরা এই আবছা আলো আঁধারের মাঝে জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলে। হাসাহাসি করে।

হরিপদ এসব আগে দেখেনি। ইদানীং চোখে পড়ে অনেক কিছুই। যা
মনে মনে কোনো দিনই সহ্য করতে পারে নি সে।

হঠাৎ ওই হাসিটা চেনা মনে হয়। তার ছোটমেয়ে লতিকার গলা যে
থমকে দাঁড়াল হরিপদ। একফালি আলোয় ছেলেটাকে চিনতে পারল।
চোয়াড়ে মুখখানা। উস্কো খুস্কো চুল। গলায় একটা চেন ঝুলছে। সিগ্রে
আগুনের আভায় ওর কঠিন মুখের রেখাগুলো স্পষ্টতর। ছেলেটাকে চে
হরিপদ। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে ওর দলবল। রাতের অন্ধকারে না
ওয়াগন ভাঙে, মাল পাচার করে।

নিজে দেখেছে হরিপদ ছোকরাকে সেদিন লোহা কারখানার ধর্মঘটের স
দলবল নিয়ে বোমা মেরে কাদের আহত করতে। ওই গুপীর সঙ্গে লতি
এভাবে মেশে তা ভাবে নি। হরিপদ সরে এল। দারুণ লজ্জা। অজানা ভ
সে শিউরে উঠেছে।

পরীক্ষার ফল বার হয়েছে। হরিপদ হঠাৎ কলরব শুনে দাঁড়াল। প্ল্যাটফ
ওদিকে দু-পাঁচজন ছেলেকে ঘিরে কি যেন কাড়াকাড়ি চলেছে।

চীৎকার করছে কারা—রেজাল্ট জেনে যান। হায়ার সেকেণ্ডারী
রেজাল্ট।

মারামারি গুঁতোগুঁতি চলেছে। কেউ ভিড় ঠেলে হাসি মুখে বের হ
বাড়ির দিকে দৌড়চ্ছে।

চমকে ওঠে হরিপদ। তার ছেলে বাসুদেবের রোল নাম্বারটা পকেটে
রয়েছে। অনেক আশা করেছিল হরিপদ বাসুদেব হায়ার সেকেণ্ডারী পা
করলে রিটায়ার করার আগেই ধরে করে তাকে তার অপিসে একটা চাক
করে দেবে। রিটায়ার করার বছরই পরীক্ষা দিয়েছিল বাসুদেব।

স্বপ্ন দেখে হরিপদ, ছেলে তার দোসর হবে। রিটায়ার করার পর ব
বসে ছেলের মাইনেতে তার গ্র্যাচুইটির টাকা সামান্য যোগান দিয়ে সংসা
চালাবে। সেবারও ফেল করেছিল বাসুদেব। মুষড়ে পড়েছিল হরিবাবু
আগেকার দিন আর নেই। কোম্পানীর রূপ বদলেছে। এখন চাকরির জ
হাজার হাজার বি. এ. এম. এ. পাশ ছেলে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। সঙ্গে ভি
বাড়িয়েছে মেয়েরাও। তবু হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করলে ধরে করে যা হো
একটা চাকরিতে ঢোকাতে পারত বাসুদেবকে। কিন্তু তাও হয় নি।

রিটায়ার করার পরের বছর তবু হাল ছাড়েনি হরিপদ।

বাসুদেব অবশ্য জানত ফেল সে করবেই। তা নিয়ে কোনো ভাবনাও নেই। ইদানীং বাসুদেব কলোনীর ভূষণবাবুর দলে ভিড়েছে। ভূষণবাবু কের প্রায় সর্বজন প্রিয় ভূষণদা। কারণ অকারণে মিছিল বের করে। নিয়ে বাসুদেবও তার দলে যায়।

কোথায় হকারদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা চলছে, ওরা নাকাল করে পক্ষকে। দরকার হলে বোমাবাজিও চলে। বাসুদেব এর মধ্যে সে তেও হাত পাকিয়েছে।

সেবার কলোনীতে পুলিশ ধরপাকড় করে। কি যেন গোলমাল করার বাসুদেবকে ধরাও তাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বাসুদেব গোপনে সরে অন্য কোথায় তার সেন্টারের ব্যবস্থা করে দেয় ভূষণবাবুই।

সেদিন হরিপদ বাড়ির থমথমে অবস্থা দেখে অবাক হয়। অফিস ফেরতা নেছে গোলমাল বোমাবাজির খবর। দেখেছে স্টেশন বাজারে সব নপাট বন্ধ। সেই মস্তান গুপীনাথ তার সঙ্গীদের নিয়ে ভূষণবাবুর কে খুঁজছে। হিংস্র চেহারা। হাতে বোধহয় বোমা চোঙা প্যান্টের চেম্বারও থাকতে পারে। গর্জাচ্ছে গুপীনাথ—শালাদের ধরতে পারলে করে দেবে শালা নেংটি ইঁদুরের দলকে।

রিপদ সরে আসে ভয়ে ভয়ে।

াড়ি ফিরে দেখে বাসুদেব নেই। পুলিশও এসেছে তার খোঁজে। ভয় যায় হরিপদ। জীবনে পুলিশের হাঙ্গামায় থাকে না সে। তার ই পুলিশ। করুণাময়ীই বের হয়ে গিয়ে জানায় বাসুদেব তো তিন ন হল মাসীর বাড়ি গেছে। পুলিশ অফিসার মানতে চান না। বলেন— কথা নয়তো? করুণাময়ী স্পষ্ট সতেজ স্বরে জানায়—না। ঠিকই

ারের ভিতর শিউরে ওঠে হরিপদ। সে জানত না তারই ছেলে বাসুদেব উন্নতি করেছে। পড়াশোনা ছেড়ে মস্তানি করছে। আর তার স্ত্রীর রূপও সে দেখেনি। ধন্য এই পুত্রবৎসলা। পুলিশ শোনায়—মাসীর যায় নি। যদি ধরতে পারি মামার বাড়িই পাঠাব তাকে।

পুলিশ চলে যেতে হরিপদ এবার ফুঁসে ওঠে,—এসব কি ? ওই
এইসব বাঁদরামি করবে ? তাকে এ বাড়ি থেকে দূর করে দেবে।

মালতী-লতিকাও দাঁড়িয়ে আছে। মালতীর বয়স হয়েছে।
চেহারা, এখন বয়সের জন্য দেহটা ভারি হয়ে গেছে। সে লাবণ্য আর।
মুখ চোখে জমেছে হতাশার ছায়া। হরিপদ বিয়ে-থা দেবার চেষ্টা
কিন্তু পাত্র অনেক ফিরে গেছে। দু-একজন খোপে যাও বা টিকেছিল
দাবি মেটাবার সাধ্য তার ছিল না। কারণ সব হারিয়ে এখানে এসে
করতেই অপিসে প্রায় বারো পনেরো হাজার টাকা ঋণ নিতে
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে। ফলে মালতীর গতি আর হয় নি। তবে লি
সে তুলনায় সুন্দরীই। লতিকা মায়ের আদল পেয়েছে। এখন তাই
বেড়েছে যৌবনের ছোঁয়ায়। এবার সে স্কুল ফাইন্যাল দেবে। কোন গা
স্কুলেও যায় গান শিখতে। সেলাইও শিখছে—ওসবে ডিপ্লোমা পেলেও চা
মিলতে পারে।

বাসুদেবকে বের করে দেবার কথায় ফুঁসে ওঠে করুণাময়ী—তা
বলবে না ? নিজে তো দু হাতে পয়সা আনছ, ডাইনে আনতে বায়ে কু
না। ছেলেটার চাকরিও দিতে পারো নি। তবু ভূষণবাবুর দলে থেকে
আনবে দেখো। নিদেন পাটকলে—লোহাকারখানাতে চাকরিও পেতে পা
তাকে তাড়াবে বই কি !

তাই বলে এইসব গুণ্ডাবাজী করবে ? হরিবাবু তার সারা মন দি
এতদিনের সংস্কার দিয়ে এই ছন্নছাড়া অসামাজিক ব্যাপারটাকে মানতে পা
না। তাই সে প্রতিবাদ করে।

লতিকা বলে—ও তো পলিটিক্স করে।

—জানবি তুই ? গর্জে ওঠে হরিপদ। তুই কি করিস ? স্কুলে তো
ক্লাশে দুবছর গড়াচ্ছিস ?

করুণাময়ী গর্জে ওঠে—বেশ করছে ? তুমি যে ওদের দুধ-ঘি মাছ এ
খাওয়াচ্ছ ? দুটো প্রাইভেট মাস্টার রেখেছ, নতুন শাড়ি-গহনা দিচ্ছ, কত
রেখেছ যে বছর বছর ফাস-সেকেণ্ড হবে ?

হরিপদবাবু বোঝাতে পারে না যে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হতে গেলে ও
নাহলেও চলে। কিন্তু স্ত্রীকে সে এঁটে উঠতে পারে না। বারবারই
জন্য বিপদে পড়েছে। তার কথাতেই সেই পুরানো বাড়িঘর জলের দরে

দিয়ে আজ এইভাবে সর্বনাশের মুখে পড়েছে। সেই-ই মেয়েটাকেও ওসকাচ্ছে,
:ার নির্লজ্জভাবে সমর্থন করে চলেছে তার ছেলের এইসব কুকাজ।

তবু হাল ছাড়ে না হরিপদ। জন্ম কেরানী সে—নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব
গস কাবারী সামান্ত মাইনেতেই খুশি থাকতে অভ্যস্ত। আজকের এই
:াতের তাণ্ডবে পড়ে সে দিশেহারা হয়ে গেছে। বাসুদেব ফিরছিল বেশ
কছুদিন পরে তখন নাকি দুদলের মধ্যে ভূষণবাবুর মধ্যস্থতায় মিউচুয়াল হয়ে
গছে। 'মিউচুয়াল' কথাটা ইদানীং ওই ক্লাশের ছেলে মেয়েদের মুখে শুনে
:াকে হরিবাবু। ওটা নাকি সাময়িক শান্তির ব্যাপার।

আক্রোশ-লোভ-হিংসাগুলো মনে ঠিক থাকে, তাক বুঝে যে যাকে পারে
খতম' করে দেয়।

ভয় হয় হরিবাবুর। তাই চেষ্টা করেছিল বাসুদেবকে মানুষ করে
লতে। বলে সে—পরীক্ষাটা দে বাসু। তবু একটু চেষ্টা করতে পারি।

বাসুদেব আড়ালে লতিকাকে বলে,—বাবাটা একদম সেকেলে রয়ে গেল।
:ারে অপিসে এই ভিড়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে নাকসে দম খেটে কি পাব,
াচশো? ব্যস্—তার চেয়ে বাবা এ লাইনে এক দিন যুৎ মত দাঁড়াতে
:ারলে দু-পাচ হাজার এসে যাবে।

তবু পরীক্ষা দিয়েছিল বাসুদেব।

ভিড়ের চাপ থেকে বের হয়ে আসছে হরিপদবাবু। রোল নাম্বার নিয়ে
াড়াকাড়ি চলেছে। বলে—আমারটা, ও টেনে ধরেছে গেজেটখানা। কে
নকা দু' টাকার নোট ধরিয়ে উল্লাসে বের হয়ে গেল বিজয়ী সৈনিকের মত।
: দুরু কাঁপছে হরিবাবুর জীর্ণবুক। যদি ছেলেটা পাশ করে অপিসে নীলু
:ত্তিরের দুটো হাত চেপে ধরেও অনুরোধ করবে, আহুজা সাহেবের পায়ে
:রও বাসুর চাকরির কথা বলবে। গেজেটটা আঁকড়ে ধরে নাম্বারগুলো দেখছে
রিপদ—না। তার ছেলের রোল নম্বরটা ওরা এবারও ছাপতে ভুলে গেছে।
রে পাশেও ওরকম কোনো নম্বর ছাপা নেই। সব শূন্য।

ছাড়ুন দাদু। পয়সাটা?

মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে গেছে হরিবাবুর। গেজেটওয়ালা তাড়া দেয়।—
ারে, মুশয় পাশ কইরা দুইখান বেশি হাত-পা গজাইব না। হালায় চাকরি
: দিবে? তৃতীয়, রয়্যাল ডিভিশন-এর দাম তো কাচকলা। ও পাশ ফেল
.লই সমান। দেন অষ্ট আনা—কাইটা পড়েন।

আধুলিটা ছিল বিড়ি কেনার জন্য, ওই একটা বাজে নেশা আছে হরিপ কেরানীর। সেইটাই ওর হাতে তুলে দিয়ে টলতে টলতে বের হল ভি ঠেলে। দাঁড়াবার সাধ্য নেই। পা দুটো কাঁপছে।

ওদিকের কলে জল পড়ে চলেছে। মাথায় মুখে জল দিয়ে একটু শা হবার চেষ্টা করে হরিপদ। ওদিকে আলো আঁধারের মধ্যে তখনও লতিকা তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ ওঠে। গুপীনাথও হাসছে। হরিপদবাবুর মুখটা বিবর্ণ হ ওঠে। চোরের মত পালাল নিজের মেয়ের এই বেহায়াপনা দেখে।

বাসুদেব খবরটা জেনেছে আগেই। কৈলাসের চায়ের দোকানে চা আ সিগ্রেট নিয়ে বসেছে। কয়েকটা পোস্টার লাগাতে হবে। পকেটে তার দরু পঞ্চাশ টাকা এসেছে।

রং-তুলি কাগজ-এর ঘটা আছে, আর কিছু মশলার যোগাড় করতে হবে কারণ যে পাড়ায় পোস্টার মারতে হবে সেটা বিরুদ্ধ পক্ষ গুপীনাথদের এলাকা।

বাসুদেব বলে—কিছু পেটোও নিয়ে যেতে হবে। কেউ বাগড়া দিত এলে ঝেড়ে দাও শালার ওপরে।

ফটিক বলে—আজ রেজাণ্ট বের হয়েছে শুনলাম বাসু।

বাসু বলে—গুলি মার শালা রেজাল্টে। মিঃ ভাম বাড়ি ফিরে স জেনে লেকচার দেবে। তাই আজ গোবরাদের ওখানেই থাকব ভাবছি। তো ন-কড়ির দোকানে বলে দে—দু ভাঁড় মাংস আর গোটা আষ্টেক রুটি উই পিঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা যেন দিয়ে দেয়। পোস্টার মেরেই আসছি। খিদে লেগেছে

ফটিক বলে—দামটা ?

হাসে বাসুদেব—তুই কি রে? আবে বলগে বাসুদেব দিতে বলেছে দেখবি 'গুড্ বয়ের মত সুড় সুড় করে দেবে। নাহলে বাকি পেটোগু ওখানেই কিলিয়ার করে আসব তা জানে। যা—ফোট বে। চল—পোস্টা সেঁটে আসতে হবে। কাল ভূষণদাকে রিপোর্ট করতে হবে।

—বাসুদেব আসে নি ?

হরিপদ বাবু গিন্নীকে শুধোয়। করুণাময়ী চাল বাছছিল। মাল রান্নার চালায় রুটি করছে। কুমড়োর তরকারী হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় ওই রু আর কুমড়োর ঘ্যাট এইমাত্র ব্যবস্থা। তাতেই দম বের হয়ে যায় হরিপ বাবুর।

করুণাময়ী তাকাল। হরিবাবু বলে,—আজ পরীক্ষার ফল বের হয়েছে।

তাই নাকি !—মালতী বের হয়েআসে। ওকে মুখে ব্যাকুলতার ছায়া।
সে—বাসুর ফল দেখেছো বাবা ?
হরিপদবাবু বলে, ফেল করেছে। ও ফেল করবে তা জানতাম রে।
ার সব কিছুই ফেল পড়ে গেল। সব কিছু। মনে পড়ে লতিকার সেই
র দৃশ্যটা। নিজেকে কোন নরকে নিয়ে চলেছে সে তা জানে না।
রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে দু-তিনটে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ ওঠে। এসব
কার ঘটনা। কোথায় কলরব ওঠে।
হরিপদবাবু শুধোয়—কোথায় গেল সেই আপদ ?
করুণাময়ী ফুঁসে ওঠে—আপদ তো সবাই হয়েছি তোমার কাছে। তবে
আছো এখানে ? যাদের ভালো লাগে সেখানেই যাও না, সেই চুলোতে
মরো গে। তাদের টানেই তো রোজ দৌড়ও—জানি না কিছু ? সেই
ড়িদের সর্বস্ব দাও।
করুণাময়ীর বাক্যবাণ শুরু হয়। হরিপদবাবু সেই সকালে বের হয়েছে,
ছে সব অমঙ্গলের খবর নিয়েই। হতাশার বেদনায় ভেঙে পড়েছে সে।
এতটুকু সান্ত্বনা তার নেই। সেইই যেন এ সংসারে একেবারেই অবাঞ্ছিত।
অথচ জানে না করুণাময়ী ওই বুড়ো লোকটার জন্যই আজও এ বাড়ির
প্রাণীর মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জুটছে। কিন্তু করুণাময়ী সেই কঠিন
টা আদৌ স্বীকার করে না, করার এতটুকুও প্রয়োজন বোধ করে না।
হরিপদবাবু তবুও শুধোয়—আর লতিকা কোথায় ?
করুণাময়ী জানায়—কোন সেলাইয়ের স্কুলে চাকরির কথা বলতে গেছে।
মার মুরোদ তো বোঝা গেছে. তবু গানের টুইশানি করে নিজেরটা চালায়।
মার ওদের খোঁজে দরকার কি ?
বাড়িতে ঢুকল লতিকা। ওর চেহারার শান-পালিশ তবু ঠিক আছে।
কার হাসিটা তীক্ষ্ণ।
বাড়ি ঢুকে বলে—আবার সেই চেল্লামেল্লি ? দিনরাত ওসব ভাল্লাগে না।
—শাড়িটা কিনে আনলাম টুইশানির টাকা থেকে, আর তোমার জন্য এক
কেট ঝাল ডালমুটও এনেছি—এক কৌটা জর্দা।
—তাই নাকি। দেখি ?
করুণাময়ী খুশিতে ফেটে পড়ে। শাড়িটা দেখে—জর্দার কৌটা হাতে
য় বলে—বাঃ, সুন্দর হয়েছে শাড়িটা।

নিজেই শাড়িটার ভাঁজ খুলে। নির্লজ্জের মত নিজের গায়ের উপর বলে—নাঃ মানাবে সুন্দর।

ক্ষণিকের জন্য করুণাময়ীও একটি যেন অভিসারিকায় পরিণত হ[illegible] হরিপদ দেখছে ওদের মা, মেয়েকে। তার চোখের সামনে ভেসে ও[illegible] আবছা আলো ভরা প্ল্যাটফর্মে দেখা লতিকার নির্লজ্জ ভঙ্গীটা।

ওই শাড়ি—ওসব কোথা থেকে কিভাবে এসেছে সেটা জেনেছে হরি[illegible] নিজের স্ত্রীকে সেই ঘৃণ্য-পথে আনা-শাড়িটাকে গায়ে জড়াতে দেখে নি[illegible] মনেই ঝড় তোলে। সরে এল সে।

কি সর্বনাশ। ঝড়ে হরিপদ কেরানীর এই জীর্ণ ঘরের সবকিছু [illegible] যাচ্ছে।

—বাবা!

তাকিয়ে দেখল হরিপদ। মালতী চা এনেছে। প্লেটে সেই ঝাল চা[illegible] যা লতিকা এনেছিল। চমকে ওঠে হরিপদ। বলে—ওই চানাচুর খাবার[illegible] নাই রে, চা শুধু চা-ই দে।

বাইরে আবার একটা বিস্ফোরণের শব্দ ওঠে, তার জবাবে যেন আরও [illegible] বোমা পড়ল।

গুম হয়ে কি ভাবছে হরিপদ। আঁধার ঘনতর হয়ে উঠেছে, বাড়ছে। বাসুদেবের ফেরার নাম নেই। অন্ধকারে দু-একটা পুলিশের গা[illegible] যাতায়াত করার শব্দ ওঠে রাস্তা কাঁপিয়ে। ঘুম আসে না হরিপদবাবুর।

ওদিকের একটা ঘরে দুই বোনে শোয়। লতিকা বাড়ি ফিরছে আজ মনে।

মালতী বাবার জন্য দুঃখ বোধ করে। এতদিন ধরে দেখেছে মে[illegible] বাবার এই অবস্থা। বাসুদেবকেও বলেছে মালতী,—মন দিয়ে পড় বাসু।

বাসুদেব বলে—তুই আর জ্ঞান দিস না দিদি। ওটা বাবা অনেক দে[illegible] ওসব ভালো লাগে না। যেতে দে তো?

খেয়ে দেয়ে বাসুদেব বের হয়ে যাবে। লতিকাকেও দেখেছে মালতী।

মেয়ে হয়ে মেয়েদের এই অস্থিরতার কারণ সে জানে। কিছুটা খরচও পা[illegible] সে। লতিকার শাড়ি স্নো পাউডারের অভাব নাই। মাঝে মাঝে প্রা[illegible] সেজেগুজে বের হয়ে সিনেমায় যায়।

ফেরে বেশ রাত করে। আজও ফিরেছে লতিকা রাত করেই।

বাসুদেবের জেল করার খবরটাও শুনেছে। দেখেছে বাবার মানসিক

তবু লতিকা বলে, কি যে ওই শুকতলার মত রুটি আর কুমড়োর করিস—ও খেতে পারি না। আজ উমাদের সঙ্গে মদন কেবিনে খেয়ে াম কাটলেট আর টোস্ট।

মালতী দেখছে বোনকে। শুধোয় সে,—কোথায় থাকিস এত রাত বধি ?

লতিকা মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে—এখানে এই নরকে দিনরাত আটকে থাকতে ালো লাগে না। কাজ কম্মোর চেষ্টা করছি। যা হোক একটা কিছু হলে চে যাই বাবা।

মালতী ছোট বোনের দিকে চেয়ে থাকে। লতিকার রূপ যৌবন আছে। ার মত কুশ্রী কালো নয়। তার নামেও দু-চারটে কথা কানে আসে।

রাত্রিবেলায় দুই বোন এক ঘরে শুয়েছে।

মালতী বলে—গুপীর সঙ্গে কোথায় যাস তুই ? এর আগে অতুলের সঙ্গে নেমায় যেতিস।

লতিকা তাকাল দিদির দিকে। বললে,—অতুলটা একদম অকম্মা। াথায় চাকরি করে কারখানায়, মাইনে পায় মোটে তিনশো টাকা, তার চেয়ে পীদার রোজকার অনেক বেশি। বসন্তবাবুর ডানহাত, ভোটেও দাঁড়াবে পী।

মালতীর জীবনে তেমন কেউ আসে নি। তার রূপও নেই—চটকও নেই। ফুলে কোনো মৌমাছি আসে না। জীবনে প্রেমের কোনো অনুভূতি জনকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকার কোনো আশ্বাসই সে পায় নি।

লতিকাকে দেখছে মালতী। বলে সে—গুপীর নামে অনেক বাজে কথা নি রে।

হাসে লতিকা—ছাড় তো। ওসব বলে ওই বাসুটা, ভূষণদার দলে থেকে া জাহান্নামে গেছে। ওটাকে দেখবি কোনদিন গুপীদারা 'বিলা' না র দেয়।

—'বিলা' কি রে ? মালতী শুধোয়।

হাসে লতিকা। বলে সে—গুপীদার পিছনে লাগতে নিষেধ করিস
বাসুকে। ও যে সে লোক নয়। শেষ করে দেবে।

চমকে ওঠে মালতী। ও খুনে নাকি। ওর সঙ্গে মিশিস না লতু। ওটা
জানোয়ার।

লতু বলে,—রাখ তো। নে ঘুমো। ভোর থেকে তার আবার হেসেল
ঠেলার পাট আছে। ওই বুড়োকে বলিস—কেন যায় কলকাতায়? অপিস
থেকে তো আর মাইনে দেয় না, তবু বেয়ারার মত হন্তে হয়ে যায় কেন? ও
পাড়ার রাখালদা সেদিন চায়ের দোকানে বসে বলছিল—অপিসে এবার
বুড়োকে নিয়ে সবাই মজা করে। বলে—পাগলই না হয়ে যায়।

মালতী তার বাবার সম্বন্ধে লতিকার মুখে এমনি কথা শুনতে রাজী নয়।
বলে সে—কি যা তা বলছিস লতু? বাবাকে সবাই এখনও কতো মান-খাতির
করে অপিসে।

হাসে লতিকা—থাম তো; ওসব পাগলামি, বুঝলি? তুই ওই নিয়েই
থাক।

...হরিপদবাবুর ঘুম আসে না। বাসুদেব এতরাতেও ফেরে নি।
বাইরে দূরে দু-একটা গাড়ি যাবার শব্দে ওঠে। আবার সব চুপচাপ। হরি-
বাবুর কানে আসে লতিকার কথাগুলো।

মেয়েটা যেন অমনিই।

গুপীনাথের সঙ্গে মিশছে, ওই খুনে জানোয়ারের জাতপাতের ঠিক নেই।
কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। মদ গিলে রাস্তায় ঘোরে। আজ
হরিপদবাবুর মেয়েও তার গুণমুগ্ধ!

রাত কত জানে না, হঠাৎ বেড়ার পাঁচিল টপকে কে এদিকে নামল।
জেগে উঠেছে হরিপদ। আলোটা জ্বালতে যাবে বাসুদেব চাপা স্বরে শাসা:
—আলো জ্বালবে না? খবরদার।

ওর চাপা স্বরের গর্জনটা সাপের হিস হিস আওয়াজের মত শোনায়
করুণাময়ীও উঠে পড়েছে। বাসুদেবের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে হরিপদ
বাবু।

জামায় রক্তের দাগ, ধোঁয়ায় যেন কালচে হয়ে গেছে প্যান্ট জামা
দুচোখ জ্বলছে।

—কি ব্যাপার?

বলে বাসুদেব—শালাদের ডাঁট ছুটিয়ে দিয়েছি। বোম চালাবে আমাদের
দুটোকে শুইয়ে দিয়ে এসেছি।

তোর লাগেনি তো বাবা? করুণাময়ী ছেলেকে জড়িয়ে ধরে।

হরিপদ দেখছে বাসুদেবকে। সেদিনের সেই ছোট নিষ্পাপ ছেলেটার হাতে খুনীর রক্ত লেগে আছে। ওরা রাতের অন্ধকারে বোম ছুরি চালায়।

হরিপদ বলে—কি ব্যাপার?

করুণাময়ী যেন এসব ব্যাপারে পোক্ত, সেইই স্বামীকে বলে,—তুমি থাম তো। কিছুই হয় নি। যাও শোও গে। কেউ এলে বলো বাসু ফেরে নি। ছেলেকে বলে—ভেতরে চল বাবা।

মা যোগ্য সন্তানকে আদর করে ভেতরে নিয়ে গেল।

হরিবাবুর মনে হয় ওকে বের করে দেবে, অসামাজিক দুর্বৃত্তটাকে। কিন্তু পারে না। আজ সারা সংসারে তাহলে ওর ঠাঁই হবে না। বৃদ্ধ বয়সে আর আগেকার সেই শক্তি, সাহস নেই যে এতবড় অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে।

লতিকারও ঘুম ভেঙে গেছে।

সে শুনেছে গুপীর কাছে যে ভূষণের দল তাদের এলাকায় ঢুকে কিছু ভাগ বসাবার চেষ্টায় আছে। দেবে শালাদের 'বিলা' করে। তোর ভাইটাও খুব বেড়েছে রে।

আজ সেই এলাকা দখল আর বখরা নিয়েই বোধহয় কোনো গোলমাল হয়েছে। লতিকা দেখছে বাসুকে। ও তার দিকে এক নজর জ্বলন্ত চাহনি হেনে ভিতরে ঢুকে গেল। কি অসহায় রাগে ফুঁসছে বাসুদেব।

মালতী এসব খবর রাখে না।

তার ঘুম ভাঙে সূর্য ওঠার আগে। এ সংসারে সে একটা ভারবাহী জীব মাত্র। মুখ বুজে খেটেই যায় আর মায়ের রকমারি গালমন্দ, আজে বাজে কথা শোনে।

হরিপদবাবুর ভোর রাতে চোখ লেগে এসেছে। ক্লান্ত দেহমন তবু জৈবিক তাগিদে আর শরীর ধর্মে কিছুটা বিশ্রামের অবকাশ করে নেয়। হরিপদবাবুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে আহুজা সাহেবের চেম্বারের ছবিটা। লোকটার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিল সে। হরিবাবুর রিটায়ারের কবছর আগেই কোম্পানীর বেশির ভাগে শেয়ার সাহেবরা বেচে দেয় এদেশী লোকদের হাতে।

ফলে দুধওয়ালা আহুজারাও ডিরেক্টার হয়ে এসে বসেছিল তখন থেকেই। অপিসের রূপ বদলে গেছে। তার কমাস পরই থর্নটন সাহেব রিটায়ার করতে আসতে শুরু হল পাঞ্জাবী গুজরাতি কিছু কর্মচারী। আর নেওয়া হল কিছু মহিলা কর্মচারী।

আহুজা নিজে ইনটারভিউ নিয়েছিল মেয়েদের। বেছে বেছে সুন্দরীদেরই চাকরি হয়েছিল। আহুজার সঙ্গে দু-একজনকে দেখা যায় নাকি কলকাতার কোনো নামীদামী হোটেলে। কোম্পানীর খরচার খাতায় নতুন একটা আইটেম বসল—হসপিট্যালিটি কসট অর্থাৎ কোম্পানীর খরচায় মদের বিল—হোটেলের বিলও মেটানো হতে থাকল।

হরিপদবাবু সেবার দুটো বিলে অবজেকশন তুলতে মিঃ আহুজা তাকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠায়। সেই প্রথম কাজ নিয়ে গেছে হরিবাবু। আহুজা দেখেছে তাকি কঠিন সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে।

—হোয়াট অবজেকশন ?

হরিপদবাবু বলে—কোম্পানীর এসব খাতে খরচার স্যাংশন নেই।

আহুজা কড়া স্বরে বলে, আই সে স্টপ অল দিস ননসেন্স। আই উইল সি। ইউ পাশ ইট।

হেণ্ডারসন—পিনকিল—কেলার সাহেবের মত দুঁদে লোকদের সঙ্গে তর্ক করেছিল বহুবার হরিপদ, তাদের ঘরে ঢুকতে বসতে বলত, তার কথাগুলো শুনে কখনও নিজেদের কাট নিজেরাই কাটছিল। কিন্তু এই আহুজা দুধ-ওয়ালারা যেন অন্য জগতের মানুষ। বসতে বলা তো দূরের কথা, তাকে ধমকে কথা বলে, বেআইনী কাজ করিয়ে কোম্পানীর টাকার শ্রাদ্ধ করতে চায়।

মুখ নিচু করে বের হয়ে এল হরিপদ। মনে হয় তার দিন এখন বদলে যাবে। তার এতদিনের ভালোবাসার কোন দাম নেই।

সেই আহুজার কাছেই গেছে আবার হরিপদ। মাইসন পাসড এগজামিনেশন স্যার, এনি সার্ভিস ইয়োর মোস্ট অবিডেয়িণ্ট সার্ভেণ্ট স্যার ফাদার-মাদার ইউ স্যার।

আহুজা বলে—সিট ডাউন। কল ইয়োর সন।

বাসুদেবের চাকরি হয়ে গেছে। হরিপদবাবুর ঘাড় থেকে বোঝা নামল এবার আর তার ঘুরতে হবে না। সংসারের হাল ফিরবে।

ুদেবের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। সে এবার ভালোভাবে বাঁচতে

।

ঃ কার চীৎকারে চমকে ওঠে হরিপদবাবু।

খ মেলে দেখে সকালের আলো ফুটে উঠেছে। উঠোনে চীৎকার করছে

। কপালটায় কাটার চিহ্ন—মুখ চোখ ফুলে রয়েছে। গর্জন করছে

, লতিকাও কি যেন বলার চেষ্টা করে।

ুদেব গর্জাচ্ছে—তোর পিরীত ছুটিয়ে দোব। রাস্তায় ঢলাঢলি করা

য় দেব।

তিকার চোখ মুখ লালচে হয়ে উঠেছে। চুলগুলো খোলা। গর্জাচ্ছে

-আমি যা খুশি করব, তুই বলবার কে? তুই কি করিস জানি না?

ঠেকে যাস্।—চোলাই-এর ব্যবসা করিস্…

—খবরদার। চোপা ভেঙে দেব হারামজাদী।—গর্জে ওঠে বাসুদেব।

ালতী বোনকে কোনোমতে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল। লতিকার ভাঙা

চীৎকার তখনও শোনা যায়। হরিপদবাবু ওদের দিকে তাকান নি।

সংসারে অভাব ছিল সত্যিই কিন্তু এমনি অস্থিরতা, অসভ্যতা ছিল না।

আজ তার ঘরে বাইরের জীবনে দেখেছে এই অবক্ষয় আর জ্বালা। এসব

ভাবার সময়ও নেই। দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের অভ্যস্ত চোখ, ইন্দ্রিয়গুলো

, সচকিত হয়ে ওঠে। রোদের উত্তাপ সামান্য গায়ে লাগে। উঠানের

 মাথা পার হয়ে সূর্যের দীঘল আলোর রেখা উঠানে পড়ে ওদিকে

াচা ছুঁয়েছে। হরিপদবাবু ব্যস্ত হয়ে গামছাটা নিয়ে বেড়ার ঘেরা দেওয়া

নার দিকে এগিয়ে যায়। হাঁক পাড়ে, অ মালতী, ট্রেনের টাইম হল

অফিস-এর দেরি হয়ে যাবে।

রুণাময়ীর চায়ের পাট চুকেছে, কাল লতিকার আনা নতুন জর্দার কৌটা

সুগন্ধি জর্দা একটু মুখে পুরে পানের পিক ফেলে বলে, আপিস-এ মরতে

হবে কেন? কি হয় সেখানে গিয়ে তা জানি। ছুঁড়িদের মুখ না

 ভাত হজম হয় না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তবু রোগ

কোথায়? মরণ! কইলো মালু, দে ঘাটের মড়াকে পিণ্ডির থালা এগিয়ে

সব কথা হরিপদবাবুর সয়ে গেছে। কি করে বোঝাবে সে স্ত্রীকে সে

স না গেলে এ্যাডমিন সেকশনের স্টাফ স্টেটমেণ্ট মান্থলি রিপোর্ট যাবে

না। বিল সেকশনের আউটস্ট্যাণ্ডিং বিলের অডিট হচ্ছে—অবজেকশ
পাহাড় জমে যাবে। একটা কণ্ট্রাক্টই ক্যানসেল হয়ে দেতে পারে টাই
উত্তর না গেলে।

গরম ভাত আর একটু আলু সেদ্ধ। সঙ্গে গাছের লাউ, দু-টুকরো আ
কাঁচকলার টাসটেসে ঝোল। তাই দিয়ে ভাত নাকে মুখে গুঁজে ছাতাটা নি
কোনে রকমে বের হয়ে পড়ল।

এই বাড়িটা যেন একটা তপ্ত কুণ্ডে পরিণত হয়েছে। বাইরে এসে মু
হাওয়ায়—এত লোক-এর মাঝে হরিপদবাবু নিজেকে সহজভাবে ফিরে পে
চেষ্টা করে।

দীর্ঘ বছরগুলো জীবনের উপর দাগ কেটে গেছে তার অজানতেই
গাছের কাণ্ডের গভীরে প্রতিটি বছর নিভৃতে স্বাক্ষর রেখে যায়, তেমা
মানুষের জীবনেও থেকে যায় এতকালের নিভৃত ছাপ। তার থেকে হরিপ
ঘোষ নামক কেরানীরও অব্যাহতি নেই।

প্ল্যাটফর্মে সাতটা সাতচল্লিশের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ভিড় জমেছে, এই
হরিদা, অপিস যাচ্ছ বুঝি?

নোয়াপাড়ার রমেশ মজুমদার হাঁক পাড়ে।

হরিবাবু বলে—আরে ভাই ছুটি তো নাই। না গেলে আজকের ছেলে
অফিসকে লাটে তুলবে। যাই—এগিয়ে যায় সে।

রমেশ কাকে বলে,—ওই ওর রোগ। রিটায়ার করেও অপিসের মায়া
কাটাতে পারে নি। কি হে রাখাল—তোমাদের হরিবাবুর অপিসে খুব দা
নাকি হে। রাখালও এসে পড়েছে। সেও এক অপিসেই কাজ করে,
হরিপদবাবুর চেষ্টাতেই রাখালের চাকরিটা হয়েছিল ওখানে। রাখালের সে
সব কথা মনে পড়ে না। এখন রাখাল অপিস ইউনিয়নের অন্যতম পাণ্ডা
সাতটা সাতচল্লিশের গাড়িতে গিয়ে শিয়ালদা নেমে কাঁচা বাজারে যায়,
ইউনিয়ন থেকে অপিস ক্যানটিনের চার্জ-এ রেখেছে তাকে, অবশ্য তার জন্য
রাখালকে মাস-কাবারি কিছু দিতে হয়, সেটা পুষিয়ে নেয় সে দৈনিক কাঁচা
বাজার, মাছ-মাংস-ডিম এসবের কমিশন থেকে।

রাখাল ইদানীং জায়গাও কিনেছে স্টেশনের ওপারে, বাড়ি শুরু করবে
সুতরাং ইউনিয়নের গোঁড়া ভক্ত সে।

রাখাল শুনেছে কাল বৈকালে ইউনিয়ন মিটিং-এ হরিবাবুর বা

দেওয়ার ব্যাপারটা। সুশান্তও রাখালের বন্ধু তার পিছনেও নাকি লেগেছে বুড়ো।

এই নিয়ে কাল সন্ধ্যায় মাতব্বরদের মিটিং হয়ে গেছে। রোজই হয়। অপিসের একদিকে এখন কোম্পানীর খরচায় স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব গড়ে উঠেছে।

সেটাও ইউনিয়নের দখলে। সেখানে বসেই চিত্ত বিনোদনের নামে ইউনিয়নের কর্মীদের কিছু স্বার্থান্ধ পেটোয়া বাবুদের শলা-পরামর্শ চলে, আলোচনা হয়। কর্মপন্থা নেওয়া হয় যাতে তাদের এই রাম-রাজত্ব কায়েম থাকে।

সেখানেই পল্টু ঘোষ বলেছে কথাটা হরিবাবুর সম্বন্ধে। রাখালও ছিল।

আজ রাখাল বলে রমেশের কথায়, বুড়ো ভাম কেন যে যায় মরতে জানি না। একদিন এবার ওকে ঠাণ্ডা করতে হবে যাতে অপিসের ভূত ওর ঘাড় থেকে নামে।

হরিবাবুর এসবে নজর নেই। ঘড়িটা দেখছে বুক পকেট থেকে বের করে। আটটা বেজে গেছে তখনও ট্রেনের দেখা নেই। হরিবাবু বলে, আগেকার দিনে ট্রেন দেখে ঘড়ি মেলানো যেতো, এখন ট্রেনেরই দেখা নেই।

কে বলে—ঘড়ি ঠিক আছে তো দাদু।

দাদু ডাকটা সহ্য করতে পারে না হরিপদ। ওতে একটা প্রচ্ছন্ন রসিকতাই রয়েছে। বুড়ো হাবড়া না বলে মিষ্টি কথায় গালই দেওয়া হয় ওতে। হরিবাবু রাগটা চেপে বলে,—এ রদারহ্যাম কোম্পানীর বিলেতী ঘড়ি, এর সময়ের হেরফের হবার নয়। ইংরেজের ওই টাইমজ্ঞান ছিল হে।

ছেলেটা ফস করে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, তাহলে সাহেবদের লেজুড় ধরে বিলেতে চলে গেলেই তো পারতেন। পোড়া ইণ্ডিয়ায় কেন রইলেন ?

গাড়িটা দেখা যায়। প্ল্যাটফর্মে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। হরিপদবাবু ঠেলে ঠুলে তিন নম্বর কামরায় উঠে পড়ল। তিলধারণের জায়গা নেই। কোনো রকমে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওদিকে তাসপার্টি চলেছে, ওপাশের সিটে কজন ছেলে চীৎকার করে সত্যজিৎ রায়ের কোন ছবির সম্বন্ধে আলোচনা করছে, ও কোণে খোল কর্তাল বাজিয়ে হরিসংকীর্তন চলেছে। তার উপর আছে হকারদের গলার শব্দ।

চারিদিকে শব্দ ব্রহ্মের জগতে হরিবাবু গুম মেরে দাঁড়িয়ে চলেছে। এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঝিমুতে পারে। তাই ঝিমুচ্ছে সে। বিবাদী বাগের ব্যানার্জি পানওয়ালার সকাল শুরু সূর্য ওঠার আগে থেকেই। তখন বিবাদী বাগের বড় অপিসগুলোর বারান্দা থেকে রাতের শোবার পার্টিগুলো চট কাঁথা তুলে নিয়ে চলেছে। সকালের সিফটের বাবুরা আসছে।

এখনও বিবাদী বাগ শান্ত, এর পর থেকেই লাখো মানুষের খবরদারি শুরু হবে এখানে। সেদিনের চাকরি খোঁজা ছেলেটাও চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে ফুটপাথে ব্যানার্জির পানের দোকানের লাগোয়া জায়গাটায় তোলা উনুন বসিয়ে চায়ের ব্যবসা শুরু করেছে।

গতিলাল এসেছে, এই অঞ্চলের সে অলিখিত জমিদার। পরনে মিহি ধুতি ঘিয়ে রং-এর টেরিকটের পাঞ্জাবী, এমনিতেই ফিটফাট, শুধু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে কাঁধের গামছাখানা থেকে। ওই পোষাকের উপর গামছাটা বেমানান।

ব্যানার্জি খাতির করে বলে—এসো গতিলালজী, আরে বাদলা চাচাজীকে চা দে, উইদ বিস্কুট। পান সাজি চাচাজী?

গতিলাল বলে—বানাও। তো ব্যানার্জি নয়া ছোকরাকে বসতে দিলে তার ইনাম দো কুছ দিবে?

এখানে পথে ফিরি করতে গেলে ও ওই মুকুটহীন রাজাকে ইনাম দিতে হবে। বাদল চা-বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে শুনছে কথাগুলো। ব্যানার্জি বলে—পেন্নাম কর বাদলা। গতিলালজীকে চিনে রাখ।

প্রণাম করতে বাধ্য হয় বাদলা। দেখছে সে মানুষটাকে।

ব্যানার্জি বলে—গরিব, খুব গরিব। এক নম্বর জালি কেস প্রভু, তা তোমার পেন্নামী নিশ্চয়ই দেবে। দু-টাকা রোজ—

গতিলালজী বলে—ব্যস। উসমে হামার কি থাকল আর উলোককো ক্যা দেগা?

রফা হয় তিনটাকাতে, তাও পয়লা মাসে। পরে বিক্রি বাটা বাড়লে তখন, সালামীও বাড়াতে হবে। গতিলালজী মন্তব্য করে,—ঠিক হ্যায়! বৈঠনে দেও। আউর বাংগালী লোগকা এইসা হাল তবভি নোকরী ঢুঁড়বে। হামারা দেশয়ালী আদমী বেওসা বোঝে।

ও চলে যেতে বাদল শুধোয়,—ও কে ব্যানার্জিদা। ও সালামী নেবে এখানে বসার জন্যে?

ব্যানার্জি বলে—হ্যাঁ বৎস। উনিই এখানের মালিক। পুলিশের হাঙ্গামা
ক বাঁচাবে, তাই ওটা দিতে হবে বাবাজী। ওর কাছে টাকা ধার নিয়ে
ানে ব্যবসা করে অনেকে। সকালে দশটাকা নাও বৈকালে সাড়ে বারো-
গা পুরো ফেরৎ দিতে হবে প্লাস তিন টাকা সিগরেট।
অবাক হয় বাদল। ব্যানার্জি বলে, কলকাতার ফুটপাথ আগেই ওদের
রে চলে গেছে বাবাজী। ওরাই মালিক আমরা এখন ফালতু। যা চা
গে যা, তবে নজর রাখবি। হল্লার আওয়াজ শুনলেই স্রেফ কেটলি
পালাবি। যেন ধরা না পড়িস হল্লাগাড়ির হাতে। নজর রাখবি।
?
বাদল ঘাড় নাড়ে। সকাল থেকে বিক্রি বাটা ভালোই হচ্ছে।
ন-টা বেজে গেছে। দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে ওঠে। ট্রাম-বাসগুলো
ত হয়ে লোকজন আসতে শুরু হয়েছে। পথের এদিক ওদিকে ফেরিওয়ালার
রকমারি বেসাতি নিয়ে এসে বসেছে।
হঠাৎ ওদিকে গেটের ধারে কার চীৎকার শোনা গেল: ভাইসব। এ
ই বাঁচার লড়াই। আমাদের প্রাণপণ যুঝতে হবে যাতে কিলমার এণ্ড
ড্রুক কোম্পানীর মালিকদের কালো হাত…
পথচারীরা অপিসযাত্রীরা দেখছে লোকটাকে। দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে
া মুখ, পরনের কাপড়টা ময়লা ছেঁড়া—গায়ে একটা ছেঁড়া কোট, শীর্ণ হাত
টা শূন্যে তুলে চীৎকার করছে:
—আমাদের দাবি মানতে হবে—ভাইসব…
ব্যানার্জি বলে, খেল শুরু হয়ে গেছে। আরে প্রাতঃ পেন্নাম বড়বাবু,
পস আসা হলো?
হরিপদবাবুও ট্রেন থেকে শিয়ালদায় নেমে জনস্রোতের সামিল হয়ে হাঁটতে
তে এসে পৌঁছেছে বিবাদী বাগে। হেঁটেই যাতায়াত করতে হয়।
নকার আমলের ছ পয়সার ট্রাম ভাড়া বাড়তে বাড়তে আজ কুড়ি পয়সায়
কছে, আর বাসে উঠলেই তিরিশ পয়সা।
তত পয়সা নেই—হাঁটতেও কষ্ট হয়। ভিড় আর রাস্তা ঘাটও ভাঙা
রা, গর্তে ভর্তি। তবু হেঁটেই আসতে হয়। হাঁপাচ্ছে বুড়ো। ব্যানার্জির
ায় বলে,—আসতে হচ্ছে ব্যানার্জি। না হলে এতদিনের কোম্পানীকে
কে তুলে দেবে। হেণ্ডারসন সাহেব যাবার সময় বলেছিলেন, তোমরা রইলে

হরিপদ, হাতেগড়া প্রতিষ্ঠানটা যেন টিকে থাকে। দাও ছ আনার
সুতোর বিড়ি আর দুটো পান।

তখনও ওদিকে চীৎকার চলেছে। হরিপদ বলে,—কেষ্টপদও এসেছে?

ব্যানার্জি বলে—রোজই তো আসে। লেকচার দেয়—পথে পথে জনং
গড়ে, রাতে এদিকেই কোথাও পড়ে থাকে। পাগলই হয়ে গেছে ও।

করুণ সেই ইতিহাসটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে হরিপদবাবুর। সেবা
ধর্মঘটের সময় ওই কেষ্টই ছিল ইউনিয়নের পাণ্ডা। তেইশদিন ধর্মঘট চলা
পর ধর্মঘট ভেঙে গেল নীলু মিস্ত্রির আর ছাতুবাবুদের কল্যাণে।

ন-জনের চার্জসিট হল, হরিপদবাবুই সাহেবদের ধরে করে ছ-জ
ফিরিয়েছিল, কিন্তু কেষ্টপদর বিরুদ্ধে ডেফিনিট চার্জ দিয়েছিল নীলু মিস্ত্রির আ
দুজনের সঙ্গে। ওকেও কোম্পানী তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাকি দুজনের একজ
মারা গেছে।

ভবেশ বীরভূমে তার গ্রামে ফিরে যায় কে জানে বেঁচে আছে কি না, আর
কেষ্টপদ চাকরি হারিয়ে সব খুইয়ে আজ পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরছে।

হরিপদ কেষ্টর দিকে একবার তাকাল। পান-বিড়ি নিয়ে ঢুকছে হরিবাবু,
কেষ্ট ওকে চিনতেও পারে না। সে চীৎকার করে চলেছে বিচিত্র পোষাকে।

হঠাৎ নীলু মিস্ত্রিরকে গাড়ি নিযে ঢুকতে দেখে চীৎকার করে ওঠে
পাগলটা। দুচোখ ওর জলছে। হাতে একটা ডাবের খোলা তুলে নিয়ে
মারমুখী হয়ে গর্জাচ্ছে,—দালালকো হালাল করো। ভাই সব—ওদের কালো
হাত গুড়িয়ে দাও—

সেই বিকট বিকৃত চীৎকার বিবাদী বাগের ব্যস্ত জনতার কানে পৌঁছয়
না। জনস্রোত সমানে চলছে—অপিসের গহ্বরে ঢুকে ধন্য হচ্ছে হাজার
মানুষ। ওদের জীবনে এই নিশ্চয়তার মাঝে কোনো বাধা আনতে তারা চায়
না। গা বাঁচিয়ে নিজেরটা বজায় রাখার জন্যে সীমিত সংগ্রামে তারা
নামতে পারে তাৎক্ষণিক নগদবিদায়ের স্বার্থে—এর বেশী কিছু ভাবার অবকাশ
নেই।

হরিপদবাবু জানে কেষ্টর জীবনের করুণ ইতিহাসটা। সে নিজেকেও দায়ি
মনে করে এই অবক্ষয়ের জন্য, কিন্তু করার কিছু নেই। হরিপদ কেরানী

জীবনেই দেখেছে এই অবক্ষয়টাকে। তার বাড়িতে নিজের মেয়ে, ল-স্ত্রীর সর্বনাশা মনোভাবটাকে সইতে পারে নি। তার সব আশা স্বপ্ন হয়ে গেছে। মনে পড়ে মালতীর কথা। তাকেও বাঁচার মত ানো পথ দেখাতে পারে নি। মুখ বুজে জীবনের নিঃস্বতার বোঝা বয়ে াছে সে। একদিন কোন অতলে হারিয়ে যাবে সবকিছু।

এসেছেন আপনি ?

ধীরার কথায় তাকাল হরিবাবু। তিনতলা ঠেলে উঠে এসে হাঁপাচ্ছে। ম মাথার সামান্য কগাছি সাদা চুল টাকের সঙ্গে লেপটে গেছে। কোটটা ল ছেঁড়া জামাটা বের করতে লজ্জা বোধ হয়।

হরিবাবু বলে—এলাম মা। ওদিকে রমেনের স্টেটমেণ্ট যাবে না, অতুলের লি রিপোর্ট বাকি, তোমার ফাইলপত্র সব আপটু-ডেট আছে তো ? আর াস্ত-জগদীশদের উপর নজর রাখতে হবে। নীলুকেও কাল বলেছি…

ধীরা দেখছে মানুষটিকে।

কালকের মিটিং-এ পণ্টু ঘোষকে বাধা দেন নি উনি। সুশান্তবাবু অবশ্য জ করেই না। সারাদিন এখান ওখানে ঘোরে—কি সাপ্লাই-এর সাইড জনেস আছে তার। বিজয়াকেও দেখেছে ধীরা, সেজেগুজে প্রজাপতির মত দুতিনটে সিট টাইপ করে আর বিভিন্ন সেকশনে গিয়ে বিশেষ ধরনের লেদের সঙ্গে আড্ডা মারে, তাদেরই কারো সঙ্গে অপিস পালিয়ে সিনেমায় য়।

কদিন তো ঘুরে এল দীঘায়। সঙ্গে নাকি ওই সুশান্তও ছিল। অন্যায় ন্তু বলে নি হরিপদবাবু। কিন্তু ওরাই এখন অপিসকে হাতে রেখেছে।

কাল পণ্টু ঘোষকেও দেখেছিল বিকালে নীলু মিত্তিরের চেম্বারে ঢুকতে। ফি-বিস্কুট খেয়ে কি-সব আলোচনা করে সন্ধ্যার পর ওরা বসেছিল।

ধীরা বলে—কেন ওদের নিয়ে কথা বলেন হরিদা ? ওই সুশান্তবাবু, ণ্টুবাবুদের নিয়ে।

অবাক হয়ে হরিবাবু বলে, তাই বলে অপিসের মাইনে নেবে ডিসিপ্লিন নিবে না ? কাজ করবে না ঠিকমত ? তুমি তো ঠিক কাজ করো ?

ধীরা চুপ করে যায়। এ লোককে বোঝানো বৃথা। নিজের সম্বন্ধে য়তো সম্পূর্ণ উদাসীন। কোনো ভালোমন্দ জ্ঞান নেই। তাই মান-অপমান বাধটাও কম। এর জন্যই অনেকের কাছে হাসির পাত্র হয়ে উঠেছে।

অনেকেই বিরক্ত হয় ওর ব্যবহারে। এই বড়বাবুসুলভ মনোভাবটা ভুলতে পারে না।

হরিপদকে এ্যাডমিন সেকশনে ঢুকতে দেখে ফিরে তাকাল অতুলবাবু।

তোমার মান্থলি রিপোর্টটা?

অতুল বিরক্ত হয়ে বলে—ওটা কাল বিকালেই সাবমিট করে দিয়েছি।

তাই না কি। ক্ষুন্ন হয় হরিপদ।

আর রমেশ তোমার স্টেটমেণ্ট হয়েছে? দেখি।

রমেশও কাল সন্ধ্যায় ক্লাবে ছিল। তার স্টেটমেণ্ট নিয়েও কথা হয়েছে অনেক জল মিশিয়ে সেটা তৈরি করতে হয়।

স্টেটমেণ্ট যেন কেড়ে নিয়েই নজর দিয়ে হরিবাবু গর্জে উঠে,—এসব করেছো? এত বেশি দেখাবে ফিগার? কি হে মহেশ, এঁ্যা এমনি বড়ব গিরি করলে চলবে! সাতজন লোক জাষ্টিফাই করে নিয়ে রেখেছো বারো —আরও তিনজনের জন্য দাবি করছ? .

বর্তমান বড়বাবু মহেশ চটে উঠেছে। বলে সে,—ওসব কথা ছেড়ে হরিদা। এখন তবু লোক দু-একজন বাড়ুক। ইউনিয়ন চায় বেশি এমপ্লয়মেণ্ট

হরিবাবু শোনায়—ইউনিয়ন চায়না কি? বেশি এমপ্লয়মেণ্ট, বেশি মাই বেশি ওভারটাইম, সবকিছু বেশি চায়, কিন্তু কাজ করার বেলায় সেটাতো না। তখন বলে—গো স্লো। ওরা একটু থমকে গেছে।

ধীরা ওকে সাবধান করার জন্য বলে—বড়বাবু।

কিন্তু হরিপদবাবু মনে করে এখনও সে হেণ্ডারসন, কেলার সাহেবদের ছায়াতেই রয়েছে। তারা এসব কোনোদিন বরদাস্ত করে নি। আ কেষ্টপদ পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরছে। সেদিন সেও এদের ভালোর ধর্মঘটে নেমেছিল, আজ তার বাড়তি মাইনে, সব সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু কেষ্টপদকে ফিরিয়ে আনার কথা কেউ ভাবে না।

হরিপদ বলে—কই সেদিন ইউনিয়ন করে যাদের চাকরি গেল ছ-জনকে আমিই ফিরিয়েছিলাম। বাকি তিনজনের একজন তো পাগল না খেয়ে পথে পথে ঘুরছে, তাকে ফিরিয়ে এনেছে কেউ?

ওর চাৎকারে আশেপাশের সেকশনের অনেকেই এসে জুটেছে। সুশান্ত বিজয়া—আরও অনেকে ভিড় করে।

পন্টু ঘোষও কাল থেকেই রেগেছিল। কাল বিকালে নীলু মিত্তিরের ঘরে গিয়ে পন্টু অনেক ভরসা পেয়েছে। কর্তৃপক্ষের ভিতরের কথা কিছুটা জানে ইউনিয়নের দু-একজন মাতব্বর। পন্টু ঘোষকে চাকরি দিয়েছিল নীলু মিত্তির ডিরেক্টারদের গোপন নির্দেশেই। কারণ তাদের বাসনা কোম্পানীকে 'সিক' করে তুলতে হবে কৌশলে যে ভাবে 'স্লো পয়জান' করে একটা সুস্থ মানুষকে তিলে তিলে মেরে ফেলে সেইভাবেই শেষ করবে কোম্পানীকে। তাই হঠাৎ চারিদিকের খরচা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টাও চলেছে। হরিপদ ঘোষও যেন এদের গোপন তত্বটা জেনে ফেলেছে, তাই সোরগোল তুলেছে।

নীলু মিত্তির তাই ডেকেছিল পন্টু ঘোষকে, যা হয় একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।

আজ ওরাও এসে গেছে। নিজের কানে শোনে হরিপদবাবুর ওই কথাগুলো। লোকটা যেন মূর্তিমান অভিশাপের মত ঘুরছে এই বাড়িটায় কোন মৃত আত্মার মত প্রতিহিংসা নিয়ে।

মহেশবাবু গোলমাল দেখে বলে,—থামুন হরিদা, অপিসের মধ্যে গোলমাল চেঁচামেচি করে আপনিই ডিসিপ্লিন ব্রেক করছেন।

হরিপদবাবুর খেয়াল হয়। চুপ করে সে। মহেশবাবু, ধরণীবাবুরা বলে—যাও পন্টু, অ সুশান্ত-বিজয়া তোমরা যাও। বুড়ো মানুষ দু-একটা কথা বলেছে কিছু মনে করো না।

পন্টু ঘোষ তবু বলে—উনি অপিসে বেআইনি ভাবে ঢুকে খুব বাড়াবাড়ি করছেন। ওকে বলে দেবেন মহেশবাবু, স্টাফদের অপমান করবেন যখন তখন মালিকদের কাছে চুকলি খেয়ে যাবেন, এ আমরা সইব না।

সুশান্ত বলে—দালালি চলবে না এখানে;

বেশ দু-একটা কথা শুনিয়ে বের হয়ে এল তারা।

চুপ করে বসে আছে হরিপদ, ক্লান্ত সে। সেও শুনেছে ওদের কথাগুলো।

মনে পড়ে হেণ্ডারসন সাহেবের কথা, আগেও বলেছিলেন তিনি। দেখবে কাজ করার লোক পাবে না হরিপডো, অকাজই হবে তখন!

আজ সেই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হতে চলেছে।

ধীরা বলে—চা খান।

চাওয়ালা এসেছে। হরিপদবাবু এসময় এই পুরোনো সেকশনে আসে। যদি কেউ চা খাওয়ায়। নগদ পয়সা দিয়ে চা কেনার সাধ্য আজ নেই।

চা চাইলে বুড়ো মানুষটা। যেন মুষড়ে পড়েছে কি আঘাতে। দু-এক চুমুক খেয়ে চাঙ্গা হয়ে বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার সুরে, ওদের কথায় কিছু মনে করি নি হে। তবে বাপু কাজটা করাতে হবে তো। চলি—একটু বিল সেকশনে।

বিপিন বেয়ারা এখানে বহুবছর কাজ করেছে। হরিবাবুর খুব ভক্ত ছিল সে। আজ দেখেছে অন্যবাবুদের মতিগতি, শুনেছে ওদের কথাগুলো। হরিবাবুকে আজ ওরা অপমানই করতে চেয়েছিল।

হরিবাবু সিঁড়ি দিয়ে নামছে। এখানটা নির্জন। বিপিন এগিয়ে যায়—বড়বাবু।

ফিরে তাকাল হরিবাবু। ঘোলাটে চোখের সামনে বিপিনের বয়সের ছাপপড়া মুখখানা ভেসে ওঠে। হরিবাবু বলল, কি রে!

এদিক ওদিক চেয়ে, বিপিন বলে—ওদের মতিগতি ভালো নয় বড়বাবু, আপনি এসে কাজকম্মো ছাখেন এসব চায় না ওরা।

বুড়ো দেখছে বিপিনকে। ওর কথাগুলো বুঝেছে কিছুটা।

বলে বিপিন—অসুস্থ শরীর নিয়ে ট্যাকের পয়সা খরচ করে শুধু শুধু কেন আসেন বড়বাবু। দিন কাল বদলে গেছে। মানুষগুলোও···হাসে বিপিনবাবু।

—তুই থামতো। হাতে ধরে কাজ শেখালাম কালকের ছেলে সব, আরে বাপু এখন নিজের ছেলেমেয়েরাই বাপ-মায়ের মুখের ওপর জবাব দেয়, এতো পরের ছেলে। তাই বলে কাজ করতে হবে তো? হেণ্ডারসন সাহেব নেই তবু তার কথাগুলো মনে আছে রে। তোরা তো জানিস সব।

বুড়ো নেমে গেল বিল সেকশনের দিকে।

নিচের তলায় ক্যাশ—ওদিকে বিল সেকশন। ক্যাশের চারিদিকে একটা ঘেরা আছে, তবে বিল সেকশন থেকে ভিতরে যাওয়া যায় সহজেই। দুটো ডিপার্টমেন্টের কাজ একসঙ্গে চালাতে হয়।

শশীকান্ত এখানে বেশ কবছর কাজ করছে।

বিল সেকশনে কাজ করে অন্য ঠিকাদার সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে টু পাইস রোজগার করার সুবিধে আছে। আর তাই শশীকান্তের লোভটা বেড়ে গেছে। মদ্যপান করে আর শনিবার হলে রেসের মাঠেও যায়, যদি বরাতটা ফিরে যায়

দমকা এই আশায়। কিন্তু বরাত তার ফেরে নি—ফাঁক থেকে টাকাই গেছে। তাই অভাব তার কোনো দিনই মেটে নি।

এ হেন শশীকান্তও হঠাৎ যেন বদলে গেছে। সেও শুনেছে কদিন থেকে ওই হরিবাবুর কথাগুলো। আজ সেও এসেছিল উপরে গোলমাল শুনে। কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে কিছু বাড়তি লোন। আর তাই পণ্টু ঘোষের কাছে এসেছিল। পণ্টুই এখন কো-অপারেটিভ-এর সেক্রেটারী।

পণ্টু বলে—এসব লোন আর আপনাকে দেব না। দেবার আইন নেই।

শশীকান্ত বলে—এবার বাঁচাও ভাইটি। নাহলে মারা পড়বো। একটু বলো ওদের।

পণ্টুকে জপিয়ে নরম করে আনছে, এমন সময় হরিবাবুর ওই মন্তব্যগুলো শুনে পণ্টু ঘোষ চঠে ওঠে। শশীকান্তও শুনেছে কথাগুলো। শশীকান্ত বলে—তুমি এ নিয়ে ভেবো না পণ্টু।

পণ্টু ঘোষ অসহায় কণ্ঠে বলে—শুনলেন তো কথাগুলো। আমরা নাকি ফাঁকিবাজ। ওই বুড়োটাকে জব্দ করতেও পারে না কেউ।

শশীকান্ত ঠিক ভাবছে। আজ পণ্টু ঘোষের দলের মন যুগিয়ে চলতে হবে তাকে। কি ভাবছে শশীকান্ত। বলে সে পণ্টুকে—পরে আসছি ভায়া, আমার কেসটা একটু বিবেচনা করো, আর দেখো তোমাদের কাজেও লাগতে পারে এই শশীকান্ত।

বিল সেকশনে হরিবাবু ঢুকে চারিদিক দেখছে।

কেশববাবু হরিবাবুর খুব চেনা। কেশব বলে,—আবার কি ঝামেলা করেছেন হরিদা?

হরিবাবু একটা চেয়ারে বসে বলে—সত্যি কথা বলতে ডরাই না হে। কাজ করতে হবে তো? কি হে শশীকান্ত, তোমার খবর কি?

শশীকান্ত হরিবাবুর আমলের লোক। হরিবাবুই ওকে সেবার কেলার সাহেবের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। ক্যাশে সর্ট হয়েছিল সাতশো টাকা।

কেলার সাহেব অর্ডার দেন—ডিসমিস করো ওকে। শনিবার বৈকালে টাকাটা নিয়ে মাঠে গেছলো শশী, তুটো সিওর ট্রিপস-এর ঘরে ছিল, জকির কাছ থেকে নাকি জেনেছে সে। সিওর সাকসেস, পুরো টাকাটা তিনগুণ হয়ে ফিরে আসবে। সঙ্গে টাকা নেই—ক্যাশ থেকে নিয়ে গিয়ে লাগিয়েছিল। কিন্তু সে ঘোড়ার বাচ্চাই বেইমানি করলো। শশীকান্ত তাই ডুবেছে।

ক্যাশ সর্ট। ভেঙে পড়ে—বাঁচান হরিদা।

হরিবাবু সেইদিন তাদের কোনো সাপ্লায়ারের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে ক্যাশ গুছিয়ে দিয়ে বলে সাহেবকে।

—টাকার বাণ্ডিলটা স্রেফ বাইরে রেখে গেছল ভুলে সাহেব। ক্যাশ নাউ করেক্ট। ফরগিভ শশীকান্ত স্যার—

শশীকান্তের চাকরি বাঁচিয়েছিল হরিবাবুই সেদিন।

শশীকান্ত আজ সেটা ভোলেনি। বলে সে, আসুন হরিদা। ওরে চা দে; চলুন আমার সিটে—শশীকান্তই হরিবাবুকে খাতির করে তার সিটে এনে বসিয়ে চা পান খাইয়ে আউট স্ট্যাণ্ডিং বিলের ফাইলটা বের করে বলে চুপে চুপে,—হরিদা, একটু ঠেকে গেছি। মানে—অডিট এ সব বিলে কি অবজেকশন দিয়েছে। পাশ করছে না সাহেব। আপনি না চোখ দিলে মারা পড়বো। এসব কাজ আপনি ছাড়া কেউ বোঝে না যে পরামর্শ চাইব। আপনিই ভরসা।

অপিসের কাজে ঠেকে গেছে বেচারা। হরিবাবু মনে মনে খুশি হয়ে বলে—এত ভাবছো কেন? আমি তো আছি। তাই রোজ আসি অপিসে। কই দেখি। বিলের ফাইলটা দেখতে থাকে হরিবাবু।

বিকাল হয়ে আসছে। শশীকান্ত বলে, আজ সময় পাবেন না, তার চেয়ে ওগুলো থলিতে পুরে বাড়ি নিয়ে যান। রাতে দেখে রাখবেন। কাল এসে একটু ওসব উদ্ধার করে দেন। নাহলে মালহোত্রা সাহেব শেষ করে দেবেন আমাকে।

হরিবাবু বলে—না, না ভয় নেই। তাহলে ওগুলো ফাইল সমেত আমার থলিতে পুরে রাখো, বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় দেখে সব অবজেকশন ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। তাই বলি ওদের শশীকান্ত—আমার আর কদিন? যদ্দিন থাকি সব জেনে শুনে নে।

শশীকান্ত ফাইলটাকে কাগজে মুড়ে হরিবাবুর ঝুলির মধ্যে পুরে দিল।

বিকাল নামছে।

হরিবাবুকে বেরুতে হবে। শিয়ালদা অবধি হাঁটা পথে যেতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে হরিবাবু, আজ মনটা খুশি খুশি। বাড়িতেও দেখাতে পারবে যে অপিসের কাজ সে নাহলে চলে না।

আর পন্টু ঘোষ-সুশান্ত-বিজয়াদের ডাঁটও ভেঙেছে অপিসে। ওদের মুখের ওপর জবাব দিয়েছে। ঘোষণা করেছে যে তাদেরও কাজ করতে হবে। ওসব জল মেশানো স্টেটমেণ্ট পাঠিয়ে কোম্পানীর সর্বনাশ করতে সে দেবে না।

সেকথা আজ মিঃ আহুজাকেও বলে এসেছে। নীলু মিত্তিরও সেখানে ছিল।

এই কাজটা করে আবার ভুল করেছে হরিপদবাবু। নীলু মিত্তির ঘরে বসে বেশ চড়া মেজাজে বলে পন্টু ঘোষকে, কারণ মিঃ আহুজা নীলুকে আড়ালে বলে—ভ্যাট ওল্ড ফুল ইজ গোয়িং ফার। ট্রাই টু চেক হিম নীলু।

নীলুও তা জানে। তাদের কোম্পানী নিধন যজ্ঞে বাধা দিচ্ছে ওই হরিবাবু। কোম্পানী সুযোগ বুঝে লোকসানের অঙ্ক বাড়িয়ে ক্লোজার ঘোষণা করে বাকি কয়েক কোটি টাকার মূলধন ল্যাণ্ড প্রপার্টি সব হাতিয়ে নেবে। সেই শুভকাজে বাধা দিচ্ছে হরিবাবুর মত একটা আধপাগল চুনোপুঁটি।

তাই নীলুমিত্তিরও চটে ওঠে। বলে সে পন্টুকে,—কি করছো তোমরা?

হঠাৎ খবরটা আনে শশীকান্ত,—আসতে পারি স্যার?

শশীকান্ত ঘরে ঢুকে খুশি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, কাজ সেরেছি স্যার। বুড়ো মালপত্র নিয়ে বেশ খুশি মনে নামছে দু' নম্বর সিঁড়ি দিয়ে।

এবার হাতে পেয়েছে বুড়োকে। নীলু মিত্তির বলে, কি ব্যাপার হে?

পন্টু ঘোষ জানায়—হরিবাবু কোম্পানীর কয়েক লাখ টাকার আউট স্ট্যাণ্ডিং বিলের ফাইল নিয়ে সরে পড়ছে।

নীলু মিত্তির লাফিয়ে ওঠে, হোয়াট! বিল মানেই তো টাকা। অন্য কোম্পানীদের কাছে গিয়ে ও বিল সাবমিট করলে যদি টাকা পেমেণ্ট করে?

হাসে পন্টু, উনিই মারবেন সেটা। আগেও মেরেছে কিনা দেখুন গে? তাই ভাবি রিটায়ার করেও এখানে দিনভোর ঘুরঘুর করে কেন বুড়োটা? এবার বুঝুন মতলবটা।

নীলু মিত্তির গর্জে ওঠে,—শয়তান চোর। হ্যাণ্ড হিম টু পুলিশ। আজ ওকে ছাড়ছি না—সবাই ধেয়ে যায় এবার।

হরিপদ নামছে। সিঁড়ির মুখে হঠাৎ ওদিকের লিফট থেকে মিঃ আহুজা,

মিঃ মালহোত্রার সঙ্গে নীলু মিত্তির কোম্পানীর ওয়ারওয়ার্ডের দু-তিনজ সিপাই, কেয়ারটেকার দাসুবাবুর দিকে তাকাল।

মিঃ আহুজা বলেন—স্টপ। দাসুবাবু সার্চ হিজ ব্যাগ।

দাসুবাবু এক ঝটকায় হরিবাবুর হাতের ময়লা রেশন ব্যাগটা কেড়ে নিবে হরিপদ অবাক হয়।

—এ কি করছো দাসু। এ্যাঁ—

দাসু তাব আমলের লোক। দাসু বলে,—আপনার ব্যাগে কি আছে দেখতে হবে।

মানে! হরিপদবাবু হঠাৎ চমকে ওঠে। বলে,—কি বলছো দাসু? ছত্রিশবছর এখানে চাকরি করেছি, সকলের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়িয়েছি। তোমার চার্জসিট কবার কাটিয়েছি মনে নেই? আজ তুমি এসব কি বলছো? আমার ব্যাগ সার্চ করবে?

নীলু মিত্তির বলে,—অপিসের দামী রেকর্ড কিছুদিন থেকে পাচার হচ্ছে। তাই অর্ডার আছে চেক করার। দরোয়ান—ওকে আটকাও।

পুরোনো দরোয়ান গদাধর ছেত্রির পুত্র দুধবরণ ছেত্রিকে চাকরি করে দিয়েছিল এই হরিবাবুই। কিন্তু দুধবরণের করার কিছুই নেই। সে চাকরি করে। দুধবরণ দেখছে বৃদ্ধ প্রকম্প্য মানুষটাকে।

নীলু মিত্তির ব্যাগ থেকে টেনে বের করেছে সেই ফাইলটা। অসংখ্য বিল রয়েছে তাতে। লাখ লাখ টাকার বিল। আহুজা বলে,—স্ট্রেঞ্জ। এসব বিল কেন নিয়ে যাচ্ছিলেন এভাবে? এ্যানসার মি? কল দ্যাট বিলবাবু।

হরিবাবু কি জবাব দেবার চেষ্টা করে।

গোলমাল শুনে অনেকেই এসে পড়েছে। সুশান্ত-পন্টু-বিজয়া, ধীরা এ্যাডমিনের মহেশবাবু, রমেশবাবু, বিল সেকশনের বড়বাবু আর শশীকান্তও এসেছে।

হরিবাবু বলে তবুও,—ওই তো শশীই এসেছে। কি হে শশী—এসব বিলের অবজেকশনগুলোর জবাব দিতে হবে তাই বলোনি আমায়?

শশীকান্ত যেন আকাশ থেকে পড়ে। বলে সে, এ্যাঁ। সেকি কথা হরিবাবু?

আমি ওসব বিলের জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজছি সেকশনে। আপনাকে ওস' কথাতো কিছু বলিনি।

নীলু-পল্টু ঘোষও খুশী হয়।

নীলু মিত্তির গর্জে ওঠে—লায়ার। মিথ্যাবাদী শয়তান। চোর।

হরিবাবুর গলার স্বর রাগে অপমানে বুজে আসে।

আহুজা বলে—কল পুলিশ। সেণ্ড হিম টু জেল।

যেন পড়ে যাবে হরিবাবু। দাঁড়াবার সাধ্য তার নেই আর। কাঁপছে সে। গলা জিব সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। তবু বলার চেষ্টা করে—কি বলছো শশী?

ওই শশীকান্তকে সে কেলার সাহেবের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল আগে। আজ ও তাকে চেনে না। একটা হীন চক্রান্তের জালে জড়িয়ে তাকে আজ জেলে পাঠাতে চায়। তাকে ঘৃণ্য চোর প্রতিপন্ন করেছে ওরা।

—হরিবাবু।

কার ডাকে যেন চমক ভাঙে। একটা বেঞ্চে শুইয়ে তাকে মুখে চোখে জল দিয়ে সুস্থ করে তুলছে রমেশ-ধীরা আরও দু-একজন। তখনও দাঁড়িয়ে আছে নীলু মিত্তির, মিঃ আহুজা-পল্টু-সুশান্ত আরও অনেকে।

বড়বাবু মহেশ বলে—স্যার। মালপত্র যখন সব মিলেছে তখন আর ওসব হাঙ্গামা না করাই ভালো। পুলিশ আর ডাকবেন না।

হরিবাবুর কোটরাগত চোখের কোল চিক চিক করে ওঠে।

আহুজা বলে—আপনারা বলছেন ছেড়ে দিতে পারি ওকে। তবে ওকে কথা দিতে হবে আর কোনোদিন এখানে আসবেন না। এখান ওখানে ঢুকে কোনোরকম ডিসটার্ব করবেন না।

আজ দীর্ঘ ছত্রিশ বছর এখানে কাজ করেছে, সব কিছু দেখেছে, গড়েছে। আজ সেখানেই সে ঘৃণ্য চোর অপবাদ পেয়েছে। এখানে আজ সে ঘৃণ্য অপরাধী, অবাঞ্ছিত একটি জীব।

হরিবাবু তাকাল ওদের দিকে।

নীলু মিত্তির গর্জন করে—এবার এলে সিধে পুলিশে চালান করে দেব। যাও। ওই চুরি বিদ্যেটা আর এখানে ফলাবে না। তিনকাল গে এককালে ঠেকেছে এখনও চুরি!

আহুজা বলে—আগে এইসব করতো বোধহয়। অপিসের শত্রু ওরা।

পায়ে পায়ে বের হয়ে আসছে হরিবাবু।

ঠিক বছর খানিক আগে এমনি দিনে সারা অপিসের কর্মচারীরা এসে জমায়েত হয়েছিল মেন হলে—বড় টেবিলটায় রঙিন টেবিল ক্লথ দিয়ে মোড়া, তাতে ফুলদানিতে রজনীগন্ধার ষ্টিক বসানো, চেয়ারে বসেছিল বড়সাহেব মালহোত্রা, ওই মিঃ আহুজা আর মধ্যখানের চেয়ারে মালা গলায় দিয়ে বসেছিল হরিপদ ঘোষ।

দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পর সে অবসর নিচ্ছে। এসেছিল তার প্রিয় সহকর্মীরা তাকে বিদায় জানাতে।

ওই সুশান্ত সেদিন লেকচার দিয়েছিল, হরিবাবুর কর্মনিষ্ঠা, সহকর্মীদের প্রতি ভালোবাসা চিরকাল উদাহরণ হয়ে থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি···

করতালির শব্দ উঠেছিল।

হরিপদবাবুর মনে হয় এত প্রীতি—ভালোবাসা যে ছিল এদের সকলের অন্তরে তারমত একটি মানুষের জন্য তা জানা ছিল না। আজ সে তৃপ্ত, ধন্য।

কোনো মহিলা কর্মী সেদিন সভায় সমাপ্তি সঙ্গীতও গেয়েছিল—

আমার যাবার সময় হল দাও বিদায়।

একরাশ খাবারের প্যাকেট, বই একটা, দামী শাল—রুপো বাঁধানো লাঠি সব দিয়েছিল। অনেক জিনিসপত্র।

রমেশ বলে—সব ট্যাক্সিতে তুলে দিই হরিদা। মালাটা নিন। খোশবুদার মোটা রজনীগন্ধার মালা। হরিবাবুর চোখে জল নামে।

—হরিদা।

চমক ভাঙে হরিবাবুর। চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে আসে আজও। কিন্তু আনন্দের বিদায়ের অশ্রু নয়। চরম অপমান মিথ্যা অপবাদে ভেঙে পড়া মানুষের চোখের জল। এর স্বাদ বেশি নোনতা।

বিপিন বেয়ারা সবই দেখেছে। বলে সে,—একা যেতে পারবেন?

আজ নিঃসঙ্গ সে। অপিসের অন্য কেউ তার পিছনে আসে নি। ওদের এতবড় অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাধ্যও নেই। একাই বিতাড়িত একটি মানুষ বের হয়ে আসছে পথে। তার পিছনে ছত্রিশ বছরের পরমায়ু নিয়ে পড়ে রইল কিলমার, প্যাট্রিক এণ্ড পিয়ার্সন কোম্পানীর বড় বড় বাড়ির ফটকটা ওখানে তার প্রবেশাধিকার আর নেই।

হরিবাবু বলে—না। যেতে পারব হে।

বাড়ুজ্যে পানওয়ালার কাছেও এ খবর পৌঁচেছে কোনো খদ্দের মারফৎ। বুড়োকে দেখে সে বলে,—পান খেয়ে যান বড়বাবু?

চমকে ওঠে হরিপদ কেরানী। বড়বাবু। ওই নামে আর কেউ ডাকবে না কে। বলে, পান। দাও আজ তোমার হাতেই শেষ পান খেয়ে যাই বাঁড়ুজ্যে।

—সে কি বড়বাবু?

হরিবাবু বলে—আর আসবো না হে? বুঝলে বাঁড়ুজ্যে, দুনিয়াটা বেইমান হে।

বাঁড়ুজ্যে পানে চুন লাগাতে লাগাতে বলে, এতবড় সোজা কথাটা এতদিন পরে বুঝলেন বড়বাবু? নিন্—আর এক বাণ্ডিল লালসুতোর বিড়ি—

পয়সা খুঁজছে হরিপদ। পকেটে হয়তো এক পয়সাও নেই। মাস্থলির দিনও শেষ হয়ে আসছে। বাঁড়ুজ্যে বলে,—ওটা আজ থাক বড়বাবু। পয়সা লাগবে না।

হরিবাবু তাকাল ওর দিকে। মনে হয় বাঁড়ুজ্যে লোকটা বেইমান নয়। ওদের থেকে অনেক ভালো।

-যাই বাঁড়ুজ্যে। হরিবাবুর মনে হয় আজ সত্যি তার বিবাদী বাগে আসার দিন ফুরোলো এবার। বাঁড়ুজ্যে বলে,—আবার আসবেন বড়বাবু।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে ওদিকের আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। গুপীর গত রাত্রে প্রচণ্ড ভাবে মার খেয়েছে ভূষণদার দলের হাতে। তার দলের লরা গুপীদের দখলের এই স্টেশন বাজার এলাকাতেও এসে পড়েছিল।

সেই রাতে পালিয়েছিল গুপীনাথ তার দলবল নিয়ে। অনেক ক্ষতি হয়েছে তাদের। দুটো ছেলে চোট হয়েছে।

গুপীনাথ ভাবছে কথাটা।

ওই এলাকার দখল তাদের হাতে রাখতেই হবে। মাসে কয়েক হাজার টাকা আমদানী হয় ওখান থেকে। যথাস্থানে কিছু প্রণামী, বখরা দিয়ে থুয়েও ওদের যা থাকে কম নয়। তাই ওরাও মরিয়া হয়ে উঠেছে দখল বজায় রাখতেই হবে। খবর চাই তাদের ভূষণদার দলের এই অভিযানের নায়ক

কে? এর আগে ভূষণদার দলের নায়ক ছিল গদাধর। সে এখন পলাতক
ছুটো খুনের আসামী হয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। তাই নতুন কেউ এই কা
করেছে।

তাকে একহাত দেখে নেবে গুপী।

কিন্তু এখন সে এলাকাতে ঢুকতে পারেনি। বাইরে পালিয়ে এসে
অন্য সেণ্টারে।

লতিকাও জেনেছে খবরটা। তার টাকার দরকার। আর গুপীও তা
আশা দিয়েছে দুজনে বিয়ে করে ঘর বাঁধবে। গুপীর টাকার অভাব নেই
লতিকাকে টাকা দেয়। দুজনে বেড়াতে বের হয়ে টাক্সি হাঁকায়—দা
রেস্তোরাঁয় খায়। উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে লতিকা।

তাই আজ হঠাৎ তার স্বপ্ন ব্যর্থ হবার ভয়ে শিউরে উঠেছে লতিকা
গেছল গুপীনাথের পুরানো বাড়িতে, কিন্তু সেখানে কেউ নেই। গুপীনা
পলাতক। পালাতে হয়েছে তাকে।

আর তার এলাকা—রোজগারের পথও এখন অন্যদলের দখলে। দে
বাসুদেবই ঘুরছে সেখানে বীরের মত।

গুপীর পুরোনো বাড়ির উপর নজর রেখেছে তারাও পাশের চা
দোকান থেকে। দু-পাঁচটে চোয়াড়ে চেহাবার ছেলে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে
হঠাৎ তারা লতিকাকে দেখে বলে,—লাটকান গুপীর লয়তো বে?

অন্যজন লতিকার সুন্দর দেহটার দিকে চেয়ে বলে,—গুপীর লাট হলে এ
তো বেওয়ারিস। চল না—একটু হিড়িক দিয়ে আসি। যদি হাতে আসে

লতিকা চমকে ওঠে।

একটা ছেলে সামনে এসে সিটি বাজায়। কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করে।

অন্যজন বলে,—গুপীতো ফৌত, এসো না মাইরী আমার সঙ্গে।
দেব—ট্যাকা-শাড়ি...

হঠাৎ লতিকা কি বলতে যাবে, বাসুদেবকে বলল,—তুই!

বাসু দেখছে লতিকাকে। লতিকা ঘৃণাভরে বলে: এই ইতর জানোয়া
গুলো তোর সঙ্গী?

বাসুদেব বলে, আর গুপী শ্লা বুঝি জেণ্টেলম্যান? এ্যা—লষ্টামি ক
ওর সঙ্গে তা জানি না? ফের দেখলে শেষ করে দেব।

লতিকা বলে—ওই ইতরগুলো এইসব বলবে—তুই কিছু বলবি না?

একজন ছেলে এগিয়ে আসে। বলে সে,—কে রে বাপু, বলতো হাপিস করে নিয়ে যাই।

লতিকা দেখছে ওর ভাইকে। আজ বোন বলেও পরিচয় দিতে ভুলে গেছে। ওই জানোয়ারদের দলে মিশে যেন জানোয়ার হয়ে গেছে বাসুদেব।

লতিকা চলে যাচ্ছে।

বাসুদেব বলে—সিধে বাড়ি চলে যাবি। গুপীর সন্ধান করতে গেলে মজা টের পাইয়ে দেব। যা—

হাসছে ছেলেগুলো। লতিকা রাগে অপমানে জ্বলতে জ্বলতে বের হয়ে গেল। আজ সেও এর জবাব দেবে। আজ ভাই বোন-এর কোনো সম্পর্কও নেই। লতিকা চায় নিজের বাঁচার আশ্বাস, তাই গুপীকে তার দরকার। দরকার গুপীর প্রতিপত্তিকে কায়েম রাখা। আজ সেও তাই গুপীর দলেরই একজন। ওই বাসুদেব তার ভাই নয়। প্রতিপক্ষ, চরম শত্রু মাত্র।

এদের সব খবরই সে গুপীর কাছে পৌছে দেবে।

গুপীনাথের নতুন আস্তানাটাতে এসেছে লতিকা। সহরের বাইরে অন্যত্র একটা বাড়ি। এদের ছোট খাটো দুর্গই। বেশ কিছু ছেলে রয়েছে, ওদিকে যন্ত্রপাতিও কিছু আছে।

গুপী এসব খবর পাবে এত সহজে তা ভাবে নি।

লতিকা বলে—ওই বাসুদেবই এখন ওদের লীডার। পাইপগান—বোমা এসবও রাখে। বাজারে বসন্তের চায়ের দোকানের পিছনের ঘরে।

শুনছে গুপী। সব পরিকল্পনার কথা। গুপীও ভেবে নেয়, তখুনিই।

বলে গুপী—সাবধানে ফিরে যাবে লতু।

লতিকা বলে—এসেছিলাম তোমার কাছে জানতে পারলে ওরা আমাকে ছাড়বে না। একটু হলে ওদের দলের ছেলেরা যা তা অপমান করত আমায়।

গর্জে ওঠে গুপী,—যা তো তুই। কেউ কিছু বললে, তার লাশ গিরিয়ে দেব। গুপী এখনও মরে নি।

গুপীনাথ যে মরে নি সেটা এলাকার লোক জানতে পারে সন্ধ্যার পরই।

স্টেশনের বাইরের বাজার—পথঘাটের সব আলো নিভে গেছে অতর্কিতে হয়তো লোডশেডিং—এতো হামেশাই হয়।

কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙে ওদের।

পর পর কয়েকটা বোমা পড়ে বসন্তের চায়ের দোকানে, ধোঁয়া আর্তনাদ ওঠে। ওদিককার গলিপথ দিয়ে এসেছে অন্ধকারে আক্রমণকারীর দল।

ভাবতে পারে নি বাসুদেবরা যে এর পর এমনি অতর্কিতে আবার হানা দেবে গুপীনাথ তার দলবল নিয়ে। এরাও ঠিক তৈরি ছিল না। তেড়ে আসছে ওরা।

পাইপগানের কর্কশ শব্দ ওঠে।

প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটছে। ওরাও বাধা দেবার চেষ্টা করে। এ যেন যুদ্ধ চলেছে। নিমেষের মধ্যে এলাকার রূপ বদলে যায়। লোকজন দৌড়া-দৌড়ি করছে। পালাচ্ছে লোকজন।

উন্মাদের মত ছেলেগুলো মরিয়া হয়ে তাড়া করেছে বাসুদেবের দলকে আজ তাদের জীবন মরণ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। বাসুদেবও আজ বাঁচার জন্য লড়ছে।

স্টেশনে এসে থেমেছে ট্রেনটা। লোকজন পথে নামছে। কেউ কে এগিয়ে চলেছে বাড়ির দিকে। হঠাৎ এমনি সময় ওই উন্মাদের দল আদি হিংসা নিয়ে মেতে উঠেছে। লোকজন পালাচ্ছে প্রাণভয়ে।

ওদিকে পর পর দুটো বোমা ফাটল প্রচণ্ড শব্দে। গুলির শব্দ ওঠে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো হরিপদবাবু।

বুড়ো এসে পড়েছে পথের এদিকে। কারা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দৌড়চ্ছে ওঠার সাধ্য নেই। কোনোমতে হাতটায় ভর করে উঠতে যাবে—পথে লোক জন সব ফাঁকা—দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে—হঠাৎ সামনেই পড়েছে বোমা —এক ঝলক আলোর আভা লাগে চোখে, তারপরই কেঁপে ওঠে হরিপদবাবু সারা শরীর। বোমাটা গায়ের উপর পড়েই ফেটেছে, ছিটকে পড়ে জী দেহটা। দু-একবার নড়াচড়ার চেষ্টা করে স্থির হয়ে আসে। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে রক্তের ধারা।

…যুদ্ধ থেমেছে।

রণক্লান্ত বাসুদেব পরাজিত হয়ে পালিয়েছে এলাকা ছেড়ে গুপীর দ এখানেও হানা দিয়েছিল। তাকে পায় নি।

পাড়াতেই কয়েকটা বোমা ফাটিয়ে তাদের দখলদারির নিশানা রেখে গেছে।

কাঁদছে করুণাময়ী।

—আমার ছেলে কিছু করে নি বাবা।

মালতী চুপ করে থাকে। লতিকাও নেই। বিকাল থেকে সেও পালিয়ে গেছে এ বাড়ি থেকে। আর ফেরে নি।

রাত্রিতে খবরটা আসে।

মালতী ঘরবার করছে। তার বাবা এখনও ফেরেনি অপিস থেকে। কে জানে ট্রেনের গোলমাল কিনা। গোলমাল হয়েছে সন্ধ্যার পর স্টেশনের বাজারে। বাসুও নেই, লতিকাও ফেরে নি।

এ পাড়ার মাধব, সুধানন্দ—হেমবাবুরাই খবরটা আনে। সন্ধ্যার পর বাজারে গোলমাল হয়েছিল। সেখানেই বোমার ঘায়ে শেষ হয়ে গেছে হরিপদবাবু। অবশ্য কাদের বোমা লেগেছিল তার গায়ে, কোন দলের সে হিসাব কেউ রাখেনি।

মালতী চমকে ওঠে।

সেও ছুটেছে থানায়, করুণাময়ীও এসেছে।

বিধ্বস্ত—রক্তাক্ত দেহটাকে চেনবার উপায় নেই। শুধু মুখে তবু একটু শান্ত-নিশ্চিন্ত হাসির আভা লেগে আছে। সারাজীবন সংগ্রামের পর আজ সে মুক্তি পেয়েছে।

বিবাদী বাগের জীবনযাত্রা চলেছে নিজের ছন্দে। নটা থেকেই জনস্রোত শুরু হয়েছে। অপিসগুলোর গহ্বরে ঢুকছে কেরানীদের স্রোত।

কিলমার এ্যাণ্ড প্যাট্রিক কোম্পানীর গেটের পিতলের ফলকটা পরিষ্কার করছে দুধবরণ ছেত্রী। ওপাশের ফুটে বাঁড়ুজ্যের পানের দোকানে বাঁড়ুজ্যে পানের পশরা সাজিয়ে বসেছে, পরিচিত মুখগুলো আসছে অপিসে।

নটা তেইশ—বড় ঘড়িটার কাঁটার দিকে তাকাল বাঁড়ুজ্যে। শুধোয় তার সহকারী বদনকে, হরিপদবাবু এলো না রে আজ ?

দীর্ঘ এতগুলো বছর পর আজ প্রথম অনুপস্থিত হয়েছে বিবাদী বাগের চত্বর থেকে হরিপদ কেরানী।

বুড়োমত কে বলে—কই হে বাঁড়ুজ্যে, জর্দাপান আর লালসুতোর বিড়ি চার আনার—

চমকে ওঠে বাঁড়ুজ্যে। তাকাল সে। কিন্তু হতাশ হয়। নাঃ! সেই হরিপদ ঘোষ নয়—এ যদুলালবাবু, রেল অপিসের কেরানী।

বাঁড়ুজ্যে জানে না কিলমার এ্যাণ্ড প্যাট্রিক কোম্পানীর ভূতপূর্ব বড়বাবু হরিপদ ঘোষের ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

তবু বিবাদী বাগের জীবনে কোনো সাড়াই জাগে নি।

বনস্পতির কোনো শাখা থেকে একটা শুকনো পাতা নিঃশব্দে ঝরে পড়ার মত একজন হরিপদ কেরানীও ঝরে গেছে এখান থেকে। বিবাদী বাগ-এর ব্যস্ত জীবন তার কোনো খবরই রাখে না।

———

ছোট্ট সহরটা সেদিন বেশ সরগরম হয়ে ওঠে।

নামেই সহর, রেল লাইন থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে। সদরের সঙ্গে যাগাযোগের সূত্র কয়েকটা বাস। দিনান্তে বার কয়েক যাতায়াত করে। ামলা-মোকদ্দমা নিয়ে যারা যাতায়াত করে সদরে তারা ওই বাসের যাত্রী, ার যায় সহরের কিছু দোকানদার।

তারা দিনান্তে কাজ সেরে বুঁচকি-বোঁচকা নিয়ে বাসে করে স্টেশনে গিয়ে কাতা যায়, সপ্তাহের মত মালপত্র গস্ত করে আনতে।

কোর্ট-কাছারির ওখানে কিছু লোকজন মক্কেল-পত্র আসে, দূর-দূরান্তর থেকে গরুর গাড়িতে করে আসে অনেকেই সাক্ষীসাবুদ দিতে, না হয় জমি কেনা-বেচা করতে। তাদের নিয়েই যা ভিড়, তাও সীমিত। সন্ধ্যার আগেই তারা আবার ফিরে যায়, দু'একখানা বাস যা চলে তারাও থেমে যায়। মিটি মিটি দু'একটা আলো জ্বলে তখন দোকান-পশারে।

সহরের জীবনে তাই এখানে শান্তি আর স্তব্ধতা নামে। সবুজ ছায়াঘন পথ গিয়েছে। মাঝে মাঝে খোয়ার আস্তরণ, তাও ঠাঁই ঠাঁই উঠে খাল-াবায় পরিণত হয়েছে। গলি-ঘুজিগুলোয় তাও নেই। স্রেফ আদিম কালের মৃত্তিকা পায়ে পায়ে সর্বংসহা হয়ে উঠেছে।

বর্ষার জলে কাদায় তার বুক ভরে ওঠে, দু'পাশে জন্মায় গাছ। কালকাসিন্দে না হয় বন কচুর গাছ।

বাতাসে নারকেল গাছের পাতা কাঁপে থরথরিয়ে। কোথায় তেঁতুল হর ঘন পাতার আবরণ ভেদ করে কানে আসে ঘুঘুর উদাস করা ডাক।

এরই মধ্যে আবার কর্মব্যস্ত আর একটা অঞ্চল আছে।

সেখানের পরিবেশ আলাদা। পথের দুদিকে দোকান-পশার। মফঃস্বলের াম থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই ধান কলাই কুমড়ো নিয়ে আসে। বাজার বলতে এইটুকুই। ওপাশে রেস্তোরা—সেলুন তাও আছে। বর্তমান তার নমুনা সবই রয়েছে কিছু কিছু।

এই সব আমদানী বাজার আর ওই মুনসেফী কোর্ট সাব-রেজেষ্ট্রি অফিস অঞ্চলেই সহরের কিছুটা আমেজ আসে।

তাকে কেন্দ্র করে কিছু নয়া বসতও গড়ে উঠেছে। দু-দশজন উকিল-মুহুরী
বাস করে, ব্যাপারীদের আনাগোনার জন্য কিছু ভাতের হোটেল আছে, তাদে
অবস্থা অবশ্য জীর্ণ। খড়ের চালাগুলো মুইয়ে পড়েছে, জল-কাদায় এদিক
ওদিক ভরা। তবু সাইনবোর্ড ঠিক ঝুলছে চালের বাতা থেকে। "আন
আশ্রম হিন্দু হোটেল," "করুণাময়ী পবিত্র ভোজনালয়" ইত্যাদি। ছোটখাটো
দু'একটা অফিসও বসেছে। লোকজন তাই কিছু আছে বাইরের।

তবু এখানে এখনও আদিম জীবনযাত্রাই প্রচলিত। রাস্তায় ঘাটে বাজা
মেয়েদের দেখা কম মেলে। সিনেমাও নেই যে, সেজেগুজে মেয়েরা বিকেলে
বেরুবে। বছরান্তে এখানকার জাগ্রত দেবতা ত্রিকালনাথের মেলা বসে, ত
তাতে ভিড় জমে পল্লী অঞ্চলের লোকদের, মেয়ে ছেলে পুরুষ বৃদ্ধদের ভিড়।

সে ভিড়ের জৌলস নেই, সাবেকিয়ানা আছে। রূপের চটক নেই, আ
পূজা আর ভক্তির কিছু জড়তা এবং শুচিতা। তাই বাসুদেবপুর নিজের গ
বিচিত্র এক জীবনযাত্রার ধারায় সমাহিত।

বাসুদেবপুর না সহর না পাড়াগাঁ।

হঠাৎ এই শান্ত জীবনযাত্রায় সেদিন একটা সাড়া জাগে। কর্মব্যস্ত অঞ্চ
তারই মধ্য দিয়ে দেখা যায় একটি অতি আধুনিক মেয়ে চলেছে! হা
ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে হিলতোলা জুতো, চোখে চশমা, বেণী দুলিয়ে ছন্দব
গতিতে-সহরের রাস্তা দিয়ে চলেছে।

অনেকেরই চোখে পড়ে ব্যাপারটা। চোখে পড়বার মতই। এখা
সকলেই সকলের প্রায় চেনা।

ছোট্ট সহরে এমন বড় একটা কাউকে এরা দেখেনি। দোকানদার, পা
সেলুনওয়ালা, ফটিক পানওয়ালাও দেখে একটু অবাক হয়। ঠিক চিনতে পা
না মেয়েটিকে।

—কে রে?

পুঁটুর চায়ের দোকানের খদ্দেরদের মধ্যেও দৃষ্টি বিনিময় হয়। তা
অচেনা বোধহয়।

—নোতুন আমদানী নাকি রে? অ গুপীদা—

গুপী সহরের একমাত্র প্রাইভেট কাম্ ট্যাক্সির ড্রাইভার। সহরের,
মহলের প্রায় সকলেই ওই গুপীর খদ্দের। তাছাড়া মুনসেফবাবু, সা
অফিসাররাও গুপীর পরিচিত। সে অনেকের বাড়ির খবর জানে। আঠা

মাইল দূরে রেল স্টেশন থেকে কি নোতুন চমক নিয়ে কে আসে, কে কার সঙ্গে রাগ করে চলে গেল, ঐসব খবর গুপীর কাছে। সহরের উপরের তলার জীবনের সঙ্গে সে পরিচিত। তাই ওরা কেউ নোতুন এল কি না সেই খবরটা তার কাছে নিতে চায়।

গুপীর মনমেজাজ এমনিতেই ভালো নেই। ক'দিন ধরে তার মালিক বসন্তবাবুর সঙ্গে খটামটি চলেছে, বসন্তবাবু এমনিই লোক, তাই গুপীর আগে এখানে ছিল, মোহিত দত্ত।

মোহিতের মতো ভালো মিস্ত্রী দেখা যায় না। সেই মোহিতও ছেড়ে গেছে। শুধু তাই নয় মোহিত এখন কলকাতায় মস্ত বড় এক গ্যারেজের নাম করা মিস্ত্রী।

মোহিত তবু কলকাতায় গিয়েও এখানকার কথা ভুলতে পারে নি, মাঝে মাঝে প্রায়ই আসে।

তবে ওরা বলে,

—মোহিতের নাকি টিকি বাঁধা আছে এখানে।

সেই মোহিত এসেছে এখানে ক'দিনের জন্য। গুপী তাকে ধরেছে—এখানে আর কাজকর্ম পোষাবে না দাদা। তোমার তো মান খাতির আছে কলকাতায় নিয়ে চল কেন্নে। সেইখানে কাজকর্ম করবো।

মোহিতকে আপ্যায়ন করে আজ চায়ের দোকানে এনে বসিয়েছে, কথাটা আবার পাড়বে বলে।

ঠিক এমন সময় ওই মেয়েটিকে নিয়ে অযথা প্রশ্ন তুলতেই গুপী ধমকে ওঠে।

—যেতে দে দিকিনি, কোন মেয়ে গেল আর এলো, আমি কি তারই খবর রাখবো। আমি মরছি শ্লা নিজের জ্বালায়। ওদের এখন ফুর্তি চাপলো।

মোহিতের পোশাক-আশাক এদের থেকে আলাদা। এককালে সেও এখানে এদের সঙ্গে মিশেছে—বাস ড্রাইভারী করতো বসন্তবাবুর লাইনে, সেই সঙ্গে মেকানিকের কাজও করতো। কিইবা মাইনে পেয়েছে।

মোহিত এখন অন্য মানুষ। ভালো কাজ করে।

কলকাতায় একটা গ্যারেজের হেডমিস্ত্রী। মাইনেও মন্দ পায় না, তাছাড়া এদিক ওদিকেও কিছু টাকা রোজগার আছে। ভালোই করেছে সে চলে গিয়ে।

তবু এখানকার মায়া কাটাতে পারেনি সে। কোনখানে তার আকর্ষণ তা জানে মোহিত।

তাই আসে মাঝে মাঝে এখানে।

এতদিন ধরে এখানেই বাস করেছে, কাজকর্ম করেছে। এখানকার মানুষগুলোকে ভালো লেগে গেছে তার। তাছাড়া আর একজনের কথাই মনে পড়ে বার বার। তারই টানে বোধহয় না এসে থাকতে পারে না।

রোহিণী ড্রাইভার ওপাশে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। সেও দেখেছে ওই নবাগত মেয়েটিকে। সে ওই মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। মোহিতেরও চোখ পড়েছে তার দিকে। রঙ্গীন শাড়ির আঁচলটা তখনও দেখা যায়।

রোহিণী বলে,

—মোহিতদার কাছে এসব পুরোনো। ও এখন কলকাতায় কত আচ্ছা আচ্ছা মেয়ের আঁচলের বাতাস খেছে, সেখানে তো শুনেছি আমেল্লা সব ঘুরছে, লয় গো দাদা! এ্যাঁ বল দিকিন!

ওদিক থেকে নলিনী মিস্ত্রী বলে,

—তবু দাদার মন ভরল না, এইখানে ঠিক আসা চাই। যেন দাদার আমার আঁতের টান।

—তা অ মোহিতদা, বলি ভোজটা এইখানেই হবে তো না কলকাতায় নিয়ে গিয়েই লাগাবে। ফাঁকি দিও না দাদা।

মেয়েটিকে আর দেখা যায় না। তখনও এদের মনে সেই আলোড়ন চলেছে, মোহিত চুপ করে হাসছে, ওদের কথায় জবাব দেয়।

—দেখা যাক, বিয়ে বলে কথা! আগে হোক।

তবু ওই মেয়েটির কথা ভুলতে পারে না মোহিত। মনে হয় ওকে যেন কোথায় দেখেছে।

কোর্টের ওদিকে চলেছে সেই মেয়েটি।

সহরের একদিকে কোর্ট, স্কুল আর গার্লস স্কুল। এপাশে ওপাশে উকিল মোক্তারদের বাসা, সহরের মধ্যে ওই অঞ্চলটা একটু আধুনিক। তবু মামলা জন্য আসে দেহাতী চাষীর দল। দু'চারটে পাকা বাড়িও উঠেছে।

উকিল-মোক্তারবাবুরা এই পরিবেশে ওই মেয়েটিকে দেখে একটু অবাক হয়। কেমন বিচিত্র ঠেকে তাদের।

মতি উকিলের মুহুরী মধুস্থদন বলে,

—কোথায় যায় দেখবো ওকে বাবু? যদি মামলা-মোকদ্দমা কিছু থাকে?

উকিল মতিবাবু ধমকে ওঠে—ওর আবার কি মোকদ্দমা রে?

—আজ্ঞে আজকাল মেয়েরাও তো কোর্ট ঘর করছে। স্বামীর সঙ্গে ছোড় ছাড় যদি করে?

মতিবাবু মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। কে জানে কোর্টে কোন কাজ আছে কিনা ওর। মুহুরীর কথাটা শুনেছে, নিজেও দেখেছে সদরে এমন ধরনের মামলা ছ্'চারটে হচ্ছে। ছোড় ছাড়ের মামলা।

মেয়েটি অবশ্য দাঁড়ায় না।

এগিয়ে গিয়ে দোকানের পাশ দিয়ে মেয়েটি কোর্টের বারান্দায় উঠে সাবলীলভাবে এগিয়ে এখান-ওখান হয়ে ঘুরে নেমে গেল, তারপর আর দাঁড়াল না।

সোজা সহরের দিকে চলে গেল। উকিল-মোক্তাররা ভাবে কে জানে বোধহয় কোন আধুনিকা মজা দেখতে এসেছিল কোর্টে, এছাড়া আর কি হবে।

দুপুরের জড়তা নামছে সহরের পথে পথে।

রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। বাজার ফেরতা পশারীর দল চলেছে।

মোহিতও আনমনে আস্তানার দিকে চলেছে, চায়ের দোকান থেকে বের হয়ে।

বাজারের ওপাশের গলিটা চলে গেছে। এককালে সমৃদ্ধশালী কোন জমিদারের এলাকা ছিল। বাজারের আশপাশেই তার ছোট-বড় নানা বাড়ি, এরই মধ্যে বেশ কতকগুলো ভেঙ্গে গেছে, ওই ভাঙ্গাবাড়ির একপাশে কতকগুলো খুপরীর ছ্'খানা ঘরে মতি উকিলের স্বনামখ্যাত মুহুরী মধুস্থদন সপরিবারে থাকে।

বর্তমানে ওই চকের বাড়িগুলো কিনেছে বসন্তবাবু। সহরের মধ্যে বেশ

ধনী লোক। ধান চাল কলাই-এর মস্ত আড়ত আছে। তার থেকেই ক্রমশঃ এখন ব্যবসা বাড়িয়েছে অন্যদিকে।

সদর লাইনে নিজেরই খানচারেক বাস চলে, তাছাড়া ট্যাক্সিও আছে বিনা লাইসেন্সে। মোহিত আগে ওই বসন্তবাবুর গাড়ির ব্যাপারে ডানহাত ছিল।

মধু মুহুরীকে বাড়িটা সেইই ব্যবস্থা করে দেয়। শোনা যায় এখনও এবাড়ির ভাড়া বাবদ তিরিশ টাকা মাসিক ওই মোহিতই পাঠায় বসন্তবাবুকে। মোহিতের অবশ্য পাঠাবার সঙ্গত কারণ আছে।

দুপুরের রোদ জীর্ণ বাড়ির রকে এসে পড়েছে। মধু মোক্তারের মেয়ে লাবণ্য বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, বোধহয় কারও পথ চেয়েই দাঁড়িয়েছিল সে।

লাবণ্যকে নিয়ে মধু মুহুরী বিপদে পড়েছে। অবশ্য লাবণ্যের তা নিয়ে কোন ভাবনা নেই। তার মনে অন্য সুর জাগে মোহিতকে ঘিরে। কলকাতায় গেছে সে, তবুও তাকে ভোলেনি।

লোকটা এখানে এলে তবু পুরোনো বন্ধুদের সন্ধানেই যায়। ওকে দেরী করে ফিরতে দেখে বলে লাবণ্য—ধন্যি যা হোক! কলকাতাতেও সারাদিন কি এমনি টো টো কোম্পানী করো না কাজ কম্মো করো কিছু? সেই সকালে বেরিয়েছো—

মোহিত ওর দিকে চেয়ে থাকে। দুপুরের রোদে লাবণ্যের সুন্দর মুখটা ওর মনে একটা সুর তোলে।

কোথায় একটা পাখী ডাকছে। মোহিতের মনে হয় এই তার স্বপ্ন। সে আর লাবণ্য দু'জনে ঘর বাঁধবে।

এই ঘর বাঁধার নেশাতেই সে এতদিন এই ছোট সহরে পড়েছিল। নইলে তার মত কাজের লোক অনেক আগেই কলকাতায় গিয়ে তার ঠাঁই করে নিতে পারতো। এখানে বৃথাই দিন কাটিয়েছে সে।

তবু যায় নি, যেতে পারেনি মধু ঐ লাবণ্যের জন্যই। মধু মুহুরী কোর্টে কাজ করে করে ঘুণ হয়ে উঠেছে। সেখানে গরীব মক্কেলদের কি ভাবে বধ করতে হয় সেই শিক্ষাটা পেয়ে গেছে, লোককে দোহন করা এখন তার মজ্জাগত। এ কায়দাটা সে ভালোই জানে।

বাড়িওয়ালা বসন্তবাবুও টের পেয়েছেন হাড়ে হাড়ে, কি একখানি চিজ তিনি তার বাড়িতে রেখেছেন। তার মত চতুর লোককেও হিমসিম খাইয়ে দেয়। বেশী ধমকালে মধু বেশ মিষ্টি হাসি হেসে জবাব দেয়।

—তাহলে ভাড়াটা ঐ কোর্টেই নেবেন বসন্তবাবু। এত কথাবার্তায় দরকার কি বলুন ?

বসন্তবাবু জানে লোকটা কোর্টেই পড়ে থাকে। এসব তার নখদর্পণে, তাই আর ঘাঁটায় না তাকে।

তাছাড়া মোহিত মিস্ত্রীর জন্য তেমন কিছু বলে না। মধু তাবৎ লোককেই সেই কৃপার চোখেই দেখে, জানে এ সংসারে মানুষ মাত্র সকলকেই যেন তেন প্রকারে দোহন করার অধিকার তার আছে। এলেমও আছে তার।

সেই সুবাদে মোহিতকেও এতদিন দোহন করেছে সে। তাছাড়া মধু মুহুরীও জানে তার দুর্বলতার খবর। নিজেও দেখছে মাঝে মাঝে মোহিত আর তার মেয়ে লাবণ্যকে পথে-ঘাটে।

একই বাড়ির খুপরী একটা ঘরে মোহিত আস্তানা পেতেছিল। তখন সে এখানে নোতুন এসেছে বসন্তবাবুর বাড়ির ড্রাইভারী নিয়ে। মধু মুহুরীর সঙ্গে প্রথম আলাপ। অবশ্য আলাপ করে কি ভেবে মধু নিজেই। ছেলেটি কর্মক্ষম, রোজগেরে। তাছাড়া অন্য বাস ড্রাইভারদের মত উড়নচণ্ডী নয়। দেখতে শুনতে ভালো, ভদ্র ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়।

ছেলেটির বয়স হয়ে গেছে একটু, তবু বলিষ্ঠ পেটা গড়ন, রোজগারপাতি ভালোই করে।

মধু মুহুরীর গিন্নীও মোহিতকে দেখছে !

একই বাড়িতে বাস, সেই সুবাদেই পরিচয়। মাঝে মাঝে মধুর স্ত্রী কথা-বার্তাও বলে। খোঁজ-খবর নেয়।

মোহিত সদর থেকে এটা-ওটা নিয়ে আসে। কোনদিন আনে সুতলির দড়ি বাঁধা একটা টাট্কা গঙ্গার ইলিশ।—মাছটা সস্তায় পেলাম মাসীমা। মুহুরীগিন্নী মনে মনে খুশি হয়, তবু বলে,

—আবার এসব কেন ? ও লাবি, তোর মোহিতদা কতবড় ইলিশ মাছটা এনেছে দেখ। ও বাবা আজ আর রান্নাবান্নার ঝামেলা করো না, এইখানেই চাট্টি মাছ ভাত খাবে। লাবি আমার খাসা রাঁধে কিন্তু।

পরিচয়টা এমনি করে গড়ে ওঠে। মধু মুহুরী শুধু দেখে মাত্র। ঐ আমদানী-পর্বটা তার কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার। অবাক হয় কিছুদিন পর গিন্নীর কথা শুনে,

—ওগো কথাটা ভাবছিলাম, মোহিত তো আমাদের পালটি ঘর, তাছাড়া ছেলেও ভালো, রোজগারপাতিও করছে।

মধু মোক্তার স্ত্রীর দিকে চাইল, গম্ভীরভাবে বলে,—হুঁ। তা আমায় কি করতে হবে?

—লাবির কথা বলছিলাম, দু'জনে মানাবে ভালো।

মধু মুহুরী অবাক হয়, জীবনে সে নিয়েই এসেছে এতকাল, কাউকে দেয়নি কিছু। তাছাড়া লাবির মত মেয়েকে ওই মিস্ত্রী ড্রাইভারের হাতে দেবার স্বপ্ন তার নেই। তার জন্য সহরের অনেকেই মধু মুহুরীকে খাতির করে। লাবির বাবা বলেই তার এত খাতির।

বসন্তবাবুর ছেলে নরেনকেই দেখেছে। প্রচুর পয়সার মালিক, কারণে অকারণে সে মোহিতের খোঁজে এখানে এসে মধু মুহুরীর সঙ্গেই যেচে গল্প করে। জানে মধু মুহুরী, কোন চারে কি মাছ ঘুর ঘুর করে।

তাছাড়া তার আখের গুছিয়ে নিতে হবে। সামান্য মুহুরীগিরি করে দিন চলে না, তা সংসার চালানো তো দূরের কথা।

সহরের অনেক তাবড় লোকই মধু মুহুরীকে খাতির করে। মধুর মতলব অন্যরকম। সে এই টোপ দেখিয়ে কোন রুই কাতলা গাঁথবার চেষ্টা করছে। অনেক দেখেছে সে। তাই এটা শিখে নিয়েছে। ইদানীং মুনসেফ মহলেও তার পরিচয় হয়ে গেছে ওই কারণে।

তাই মধু মুহুরী ওই মেয়েকে সহজে হাতছাড়া করতে চায় না। আবার মোহিতকে চটানোও ঠিক নয়।

স্ত্রীকেও বিশ্বাস করে মনের কথাটা খুলে বলা যায় না, পেট আলগা লোক তারা। কথাটা অন্য কাউকে না বললে তার ভাত হজম হবে না। তাই আসল কথাটা ভাঙে না সে। স্ত্রীকে এড়িয়ে যায় মধু মুহুরী।

—ভেবে দেখি লাবুর মা। মোহিতের রোজগারপাতি বাড়ুক, কিছু পুঁজি হোক। তখন ভেবে দেখা যাবে।

মোহিতও তখন থেকেই রোজগারপাতি বাড়াবার কথা ভেবেছে। এমনিতে সৎ, কাজের লোক। তার যোগ্য দাম সে এখানে পায়নি। তাই

সুযোগ পেতেই ছোট্ট সহর ছেড়ে কলকাতায় যাবার জন্য মন স্থির করে ফেলে। লাবণ্যকেই জানায় সে।

সেদিন লাবণ্যই বলে ওর কথায়।

—এখানে মন টিকছে না?

মোহিত জবাব দেয়।

—তার জন্তে নয় লাবু। আরও রোজগার করতে হবে আমায়। কলকাতায় ভাল কাজ পাচ্ছি। মাইনে, উপরি রোজগার আছে। কিছু জমিয়ে একটা ট্যাক্সিও করতে হবে। চিরকাল কি এমনিই চলবে?

রাত্রি নামছে। সহরের নীচে দিয়ে ছোট্ট নদীটা বয়ে গেছে। তার বুকে একটুকু জলের রেখা।

দু'দিকে তার আম জাম বিষকরমচা গাছের ঘন কালো ছায়া নেমেছে। জলের বুকে দোল খায় তারার আলো।

নদীর উর্বর পলিচরে আখের খেতে রাতের বাতাস স্বর তোলে। নিঃস্বতার স্বর।

লাবণ্যের সারা মনে হাহাকার জাগে।

ওর হাতখানা মোহিতের হাতে। মোহিত বলে চলেছে,—বেশী রোজগার না হলে, একটা আশ্রয় না গড়ে তুলতে পারলে, তোমার বাবাই তোমায় আমার হাতে দিতে ভরসা পান কই?

লাবণ্য জানে বাবার স্বভাবের কথা।

ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, তার বাবার ওই নীচু স্বভাব। লোকটা পয়সা পয়সা করেই গেল। তাই নিয়ে বাবার সঙ্গেও কথা কাটাকাটি হয়। কত মক্কেলের সব লুটে নিয়েছে তবুও খুশি হয়নি। পয়সাই তার কাছে সব-চেয়ে বড়।

লাবণ্য মনে মনে তাই বাবাকে ঠিক সহ্য করতে পারে না। বাধ্য হয়েই চুপ করে থাকে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছে একটি লোক কেমন নির্লজ্জের মত তার সমর্থ মেয়েকে অন্য পুরুষের সঙ্গে হেসে কথা বলতে নীরব সমর্থন করে।

একা বসন্তবাবুর ছেলে নরেন নয়, আরও অনেকেই আসে। লাবণ্যের বিশ্রী ঠেকে।

বার লাইব্রেরীর ফাংশনে লাবণ্যকে নিয়ে যায় মধু মুহুরী। গান গাইতে

হয় তাকে, তাছাড়া ছোট খাটো উকিল নয়, খুদে অফিসারদের সঙ্গেও যেচে আলাপ করায়।

—আমার মেয়ে স্যার, লাবণ্য। এখানে আর কি গান গাইল স্যার। দয়া করে গরীবের বাড়িতে একদিন যদি পায়ের ধূলো দেন, সেদিন শুনবেন লাবু আমার কেমন চৌকস গাইয়ে। নমস্কার কর লাবু! মস্ত লোক।

বাবার এই নির্লজ্জ নীচতা লাবণ্যের চোখ এড়ায় নি, এর জন্য তাকে নানা ঝামেলাও পোয়াতে হয়।

তবু মনে মনে লাবণ্য একজনকে ঘিরে একটু শান্তির নীড় রচনার স্বপ্ন দেখে। তাই ক্রমশঃ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে লাবণ্য। তাই বলে মোহিতকে আজ—

—বাবার কথা আমার জানতে বাকী নেই। ক'দিন যে এমনিভাবে এসব সইতে হবে জানি না। তুমি চলে গেলে ওসব উৎপাত আবার বাড়বে।

মোহিত ওকে কাছে টেনে নেয়।

লাবণ্যের সারা মনে নীরব ব্যাকুলতা জাগে। মোহিত ওকে সান্ত্বনা দেয়—

—বেশী দেরী হবে না লাবণ্য। দিন বদলাবেই, সেদিন তুমি আর আমি নোতুন করে ঘর বাঁধবো আবার।

লাবণ্যের তবু মন মানে না। বলে,

—কলকাতায় গিয়ে আমার কথা একেবারে ভুলে যাবে?

মোহিত ব্যাকুল কণ্ঠে সান্ত্বনা দেয়,

—না, না। ওকথা বলো না লাবণ্য।

মোহিত তার কথা ভোলেনি। আজও সে তার লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলেছে, লাবণ্যকে ঘিরেই তার সব কামনা-স্বপ্ন।

কলকাতায় গিয়েও সে তার সেই ভবিষ্যতের জন্যই তৈরী হয়। কাজ করে পয়সা কিছু জমেছে। আরও জমাবে। রোজগারপাতি বাড়লে একটা ট্যাক্সি করবে।

অবসর পেলেই চলে আসে এখানে দু'এক দিনের জন্য, তার সেই পুরোনো ঘরখানায়। কি যেন শান্তি পায় সে। তাই আসে সে কলকাতা থেকে এই সহরে। মাসে মাসে নগদও কিছু পাঠায়। এবার সে এসেছে পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে যাবে বলে।

কিন্তু বেশ বুঝেছে মধু মুহুরী সহজে ধরা দিতে চায় না। লাবণ্যও মনে মনে এবার শক্ত হয়েছে। বাবার এই নীচতাকে সে আর প্রশ্রয় দেবে না।

তার মনে আজ ঘর বাঁধার স্বপ্ন। লাবণ্যের মনে তাই আনন্দের সুর জাগে।

মোহিত ফিরছে সহরের পুরোনো বন্ধুদের আড্ডা থেকে। লাবণ্যকে অপেক্ষা করতে দেখে বলে,

—এখানেও তাগাদা।

—তাগাদা নয়, শাসন ; মিষ্টি হাসিতে লাবণ্যের সুন্দর গালে টোল পড়ে। বলে চলেছে লাবণ্য,

—তোমাদের মত লাগাম ছেঁড়া লোককে এমনি কড়া শাসনেরই দরকার। চল না কলকাতায় দেখাবো সেখানে। মোহিতও হাসছে।

হঠাৎ একটি ভদ্রমহিলাকে এই দিকে আসতে দেখে অবাক হল। এই অন্ধ গলির জীর্ণ বাড়িতে এমনি কোন ভদ্রমহিলা থাকতে পারে তার ধারণা ছিল

মোহিত একটু অবাক হয়।

সুন্দর চেহারা, চোখে গগলস্। হাতে ব্যাগ। পরনের শাড়িখানায় একটি রুচির আভাস মেলে। খোঁপায় পরানো রজনীগন্ধা।

এ যেন অভিসারিকার সাজ।

মেয়েটি তাদের দু'জনের দিকে চেয়ে চোখ নামালো, ওদের কথাগুলো শুনেছে সে।

পাশ দিয়ে সহজভাবেই চলে গেল ভিতরের দিকে। মোহিত ওর দিকে চেয়ে থাকে। লাবণ্য কৃত্রিম কোপে বলে ওঠে মোহিতকে।

—এ্যাই! অসভ্য কোথাকার? কলকাতায় থেকে থেকে এই সভ্যতা শেখা হয়েছে?

হকচকিয়ে যায় মোহিত।—মানে!

—ভদ্রমহিলার দিকে এমনি হাঁ করে থাকে। খুবতো ইয়ে তুমি।

মোহিত অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দেয়,

—না, না, এমনি দেখছিলাম ওকে। এখানে আগে দেখিনি কিনা; নোতুন এসেছেন বুঝি উনি?

লাবণ্য রাগতকণ্ঠে বলে,

—তোমার সে খোঁজে দরকার কি? কে রইল কে এল মেয়েদের ওসব খবরে কি দরকার তোমার?

লাবণ্য ওকে দাবড়াতে থাকে। মোহিত জবাব দেয় চাপা স্বরে,

—এ্যাই লাবু! ছিঃ ছিঃ ভদ্রমহিলা কি ভাববেন বলো দিকি। জিবের আড় নেই তোমার!

লাবণ্য খিলখিল করে হাসছে। অবাক হয় মোহিত!

—কি হল তোমার?

লাবণ্য মোহিতের হাত ধরে টানতে থাকে।

—চল, এতই যখন নজরে লেগেছে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই গে! খুব ভালো মেয়ে, বুঝলে!

মোহিতের এসব অজানা।

মেয়েদের নাম শুনলেই সে ঘাবড়ে যায়। কলকাতায় থাকে, দিন-রাত কাজকর্ম নিয়েই থাকে। তার গ্যারেজের মালিকের বাড়িও যায়। সেখানে দেখেছে নাতনী না কারা সব আছে, মোহিত তাদের সঙ্গে কথাই বলে না। আজ লাবণ্যের এই ব্যাপারে সে ঘাবড়ে যায়। এড়াবার চেষ্টা করে।

—এ্যাই লাবু। কি ইয়ার্কি হচ্ছে? এ্যাই।

লাবণ্যও ছাড়বে না—চল, যেতে হবে তোমায়!

নেহাৎ দায়ে পড়েই যেন মোহিত চলেছে ভিতরের দিকে। লাবণ্য তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

একটা জীর্ণ ঘরের দরজা প্রায় খোলা, তার মধ্যে একটি তরুণ যুবক লুঙ্গি পরে মাথার চুলগুলো একটা এইটুকু চিরুনী দিয়ে আঁচড়াচ্ছে, মুখে একটা বিড়ি। ধোঁয়া বের হচ্ছে।

তখনও রংএর দাগ তার গালে-মুখে লেগে রয়েছে, লাবণ্য ঘরে ঢুকেই বলে,

—এই সেই মোহিতবাবু আর ইনিই সেই ভদ্রমহিলা! কি হল? এ্যাই!

মোহিত প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। তারপর ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে হৈ হৈ করে দরাজ গলায় হাসতে থাকে।

—তুমিই সেই ভদ্রমহিলা! এঁ্যা।

মোহিতের হাসি আর থামে না। ছেলেটা বিড়ি মুখ থেকে নামিয়ে তাকে দেখতে থাকে। আচমকা হাসিতে সেও বিব্রত বোধ করে, লাবণ্যও হাসছে। হঠাৎ ছেলেটি এগিয়ে এসে প্রণাম করে মোহিতকে।

মোহিত হাসি থামিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করে,

—ব্যাপার কি হে! এই মেয়ে, এখুনি আবার ছেলে বনে গেলে?

—আমি বহুরূপী দাদা; মনোহর দত্ত। মনোহর বহুরূপী।

মোহিত সামলে নিয়ে ওকে দেখছে,—তা মনোহরই বটে, বেশ তো চালু হে তুমি। চালু ছোকরা।

মনোহর হাসতে হাসতে বলে,

—আপনার কথা লাবুদির কাছে শুনেছি। এসেছেন শুনেছিলাম, যাক, পরিচয় হয়ে গেল। কি আর করবো দাদা, চাকরি-বাকরির অনেক চেষ্টাই করেছিলাম; হ'ল না। একটা কিছু তো করতে হবে।

মোহিত বলে,

—চাকরি তোমার পোষাবে না, তা দেখেই বুঝেছি। এমন চালু লোককে কেউ কাজ দেয়?

মনোহর অবাক হয়।

—ঠিক কথা বলেছেন। তাই স্বাধীন ব্যবসাই নিলাম। মানে জানেন দাদা, মানুষের কোনটা যে আসল রূপ তা মানুষ নিজেই জানে না। সব মানুষই অনেকগুলো রূপ মিলিয়ে তৈরি। আমিও তাই।

মোহিত ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে। দেখতে বেশ সুন্দরই। তাছাড়া কথাবার্তার ধারও আছে। ভালো লাগে ছেলেটাকে। বলে মোহিত,

—তাই বহুরূপীর বিদ্যাই ধরলে? এ্যা!

হাসতে থাকে মনোহর। শোনায় সে,

—মানে ধরুন, একটা পেট কোন রকমে চলে যায়। তাছাড়া পথের নেশা যাকে পেয়ে বসে, পথ ছেড়ে ঘর বাঁধা তার কাছে বড় কঠিন কাজ দাদা। এই বেশ আছি। কোন ভাবনা নেই।

মোহিত বলে—পাড়াগাঁয়ে এই আধা সহরে কি হবে; কলকাতায় যেতে পারো?

মনোহর অবাক হয়ে মোহিতের দিকে চেয়ে থাকে। ছোটবেলা থেকে সেই বিচিত্র সহরের নাম শুনেছে। বিরাট সহর, পয়সা সেখানে উড়ে বেড়ায়। তাছাড়া জ্ঞানী-গুণীদের ভিড় ও বাস সেইখানে। সেই সহরে একবার গিয়ে পড়লে মনোহর তার সবচেয়ে সেরা রূপবদলের খেলাগুলোই দেখাবে।

এখানে এসবের কি সমঝদার আছে, তাছাড়া খেলা দেখিয়ে কিইবা পায়?

রূপবদলই সার হয়। মাঝে মাঝে পল্লী অঞ্চলের মেলায় সে যায়। কিন্তু মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ানোর মত অশেষ যন্ত্রণার জীবন আর নেই। শস্য-রিক্ত প্রান্তের নামে শীতল কঠিন শাসন। ঠাণ্ডা বাতাসে হাড় অবধি কাঁপে একটা জীর্ণ তাঁবু, না হয় কোন দোকানের এক কোণে তার সাজের বাক্স নিয়ে পড়ে থাকে।

রোজগারও সামান্য। মেলার পর মেলায় ঘুরে বেড়ায়। না হয় কোন সহর গ্রামে ক'দিন আস্তানা পাতে। একটা ঘর জোটে তো সেইখানে থাকে, রোজ সেই এক এক বেশ বদলে ঘুরে বেড়ায়। কোনদিন সাজে শ্রীকৃষ্ণ, কোন-দিন বা মহাদেব, কোনদিন বা মা কালী। গ্রামে ঠাকুর-দেবতার সাজবেশেই তবু কিছু রোজগার হয়।

সহর বাজারে এলে তবু দু'একটা আধুনিক বেশ বদল করে। এতদিনের জীবন সেই মহানগরের স্বপ্নময় জীবনের তুলনায় অনেক ম্লান। সেটা তার কাছে স্বপ্নই রয়ে যাবে হয়তো। কলকাতায় যেতে পারবে না কখনও।

মোহিতের কথায় জবাব দেয় মনোহর,

—কলকাত্তা! সেখানে কি নিয়ে যাবে দাদা! সে তো অনেক খরচের কথা। কোথায় পাব এত টাকা?

মনোহর ইতিমধ্যে ছোট ষ্টোভটায় একটা এনামেলের বাটিতে ভাত চাপিয়ে দিয়েছে, তাতে ফেলে দিয়েছে দু'টো আলু আর একটা ডিম।

মোহিত ওর জীবনের মাঝে তবু একটা স্বাধীন ভাব দেখেছে। রোজগার যা করে তা অতি সামান্যই। ওর জিনিস-পত্র পোশাক-আশাক দেখেই তা মনে হয়। বিছানা বলতে একটা সতরঞ্চি আর চাদর জড়ানো বালিশের মত কি একটা, সঙ্গে এইটুকু একটা রংচটা টিনের সুটকেশ।

মনোহর বলে,

—একটু বসুন দাদা, একটা ডুব দিয়ে আসি। ভালো করে চান না করলে এগুলো উঠবে না। যা পিউড়ি আর রং লেগে আছে!

লাবণ্য ইতিমধ্যে একটা কলাই করা বাটিতে একটু ডাল আর প্লেটে এক টুকরো মাছ এনে দেয়।

মনোহর ততক্ষণে গামছাটা টেনে নিয়ে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেছে। লাবণ্যকে ওসব আনতে দেখে অপ্রস্তুত হয়।

—আবার ওসব কেন লাবুদি?

লাবণ্য হাসে—যাও, চান করে এসো। ভাত নামিয়ে রাখছি।

বের হয়ে গেল মনোহর।

ক'দিনেই যেন একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। লাবণ্য বলে,

—ছেলেটি কিন্তু বেশ। মা-বাবা কেউ নেই। পথে পথেই ঘুরে বেড়ায়। ক'দিন এখানে এসেছে।

বাটিগুলো নামিয়ে মোহিতকে বলে সে,

—তোমার কি চান খাওয়া হবে না? এত বেলা অবধি হেঁসেল আগলে বসে আছি দেখতে পাওনা সেটা?

মোহিতের ভাবতেও কেমন লাগে।

কলকাতায় সেও যেন এই মনোহরের মত অবস্থাতেই আছে। পয়সা কিছু রোজগার করে সত্যি, কিন্তু সে সেখানে একা।

তাই এবার বাড়িও একটা ভাড়া নিয়ে এসেছে। বাড়িওয়ালাও তেমন পাকা, সেখানে এমনি পথের মানুষকে কেউ সহজে বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। কে জানে আইবুড়ো কার্তিকের দল কোথায় কি গোলমাল বাধাবে।

তাই বাড়িওয়ালাকে কথা দিয়ে এসেছে একা নয়, সস্ত্রীকই আসছে সে। নগদ টাকা দিয়ে রসিদপত্র নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে তবে এসেছে এবার মোহিত।

লাবণ্য বলে,

—কি ভাবছো এতো?

—বাড়ি ভাড়া করে এলাম, কিন্তু ঘরণী না হলে ঘরই যে থাকবে না।

হাসছে লাবণ্য—চলো দিকি! খেয়ে নিয়ে ঘরের কথা ভাবা যাবে। তার চেয়ে এখানকার বসন্তবাবু অনেক ভালো বাড়িওয়ালা। না হলে মনোহরের মত চাল-চুলো নেই এমনি বহুরূপীকেও ঘর দেয় থাকতে!

মোহিত বলে,

—এখানে তবু প্রাণ আছে লাবু, মানুষগুলো সব অমানুষ হয়ে ওঠে নি। কলকাতা সহর, তাজ্জব সহর; মানুষকে রাতারাতি বদলে দেয়।

লাবণ্য অবাক হয়ে কলকাতার গল্প শোনে। ভয়ও করে তার মনে মনে। তবু সাহস জাগে, মোহিতের সঙ্গে সে সেখানে বেশ সুখেই থাকবে।

বলে লাবণ্য কি আশাভরা কণ্ঠে,

—সত্যি এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। তুমি চলে যাবার পর থেকে সব কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে।

এখান থেকে সে ওই একটি মানুষের সঙ্গে চলে যেতে চায়।

লাবণ্য তাই বলে মোহিতকে,

—কথাটা বাবাকে তুমিই বলো।

মোহিত কি ভাবছে। বলে চলেছে লাবণ্য,

—তুমি চলে গেলে কি বিশ্রী যে লাগে এখানে। বাবাকে তুমি শেষ কথা জানিয়ে দাও।

মোহিত বলে—তাই দোব। যদি তোমার বাবার মত না থাকে—পারবে তার কথার প্রতিবাদ করতে? আমরা দু'জনে বিয়ে করে সংসারী হতে চাই, পারবে সেই কথা বাবাকে জানাতে?

হাসে লাবণ্য, মোহিত ওকে কাছে টেনে নেয়।

সারা দেহ মনে কি নিবিড় উত্তেজনা জাগে তার। লাবণ্য বলে,—পারবো, তুমি যা করতে বলবে নিশ্চয়ই করবো।

মনোহর স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। লাবণ্য আর মোহিতের কথাগুলো কানে আসে। ওদের দু'জনের মধ্যে নিবিড় এই ভালোবাসার ছোঁয়াটুকু তার ভালো লাগে।

লাবণ্যদি সুখী হবে, ক'দিনেই এখানে এসে ওর অন্তরের প্রীতির স্পর্শ পেয়ে তৃপ্ত হয়েছে মনোহর।

দেখেছে ওর বাবা মধু মুহুরীর সেই প্যাঁচালো ভাবটা, মেয়েটাকে ওই যেন আটকে রাখতে চায়। মনোহর সেটা বুঝেছে।

তবু মোহিত আর লাবণ্য সুখী হোক! মনোহর বাইরে থেকে গলার সাড়া তুলে ঘরে ঢুকলো।

মোহিত ওর দিকে চেয়ে থাকে। ভিজে গামছা পরে স্নান সেরে ঢুকছে মনোহর, ওপাশে ডাল মাছ নামানো দেখে বলে ওঠে সে,

—লাবুদি, বড় বদ অভ্যাস করে দিচ্ছো। মাছ—ডাল। নাঃ! তুমি দেখছি আমার হবিষ্যির অব্যেসটাকে ঘুচিয়ে দেবে, তারপর যখন পথে পথে ঘুরবো—তখন?

মোহিত বলে,—ঘুরোনা! ঘর বাঁধবে।

মনোহর জবাব দেয়,

—আপনাদের ঘরবাঁধাটা আগে দেখি, তারপর ভাবা যাবে।

লাবণ্য ধমকে ওঠে,—এ্যাই! ফাজিল কোথাকার।

হাসতে থাকে ওরা।

চকিতের জন্য তিনটি মনের নীরব প্রীতি আর ভালোবাসার স্পর্শে প্রায়ান্ধকার ওই ঘরটা মধুময় স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। বেলা বেড়ে ওঠে। সামনের চালতা গাছের ঘন কালো পাতায় পড়েছে দিনের মিষ্টি রোদ। দু'একটা পাখী ডাকে। বেলা হয়ে গেছে অনেক।

লাবণ্য বলে মোহিতকে,—চলো। খেয়ে নেবে! তোমারও ভাত হয়ে গেছে মনোহর। ফ্যান গালবে না? মনোহর মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে জবাব দেয়,

—উহুঁ, সফেন ভাতই আমার খাদ্য। উপাদেয়। স্বাস্থ্যকর।

মধু মুহুরী একটু বিপদে পড়েছে। মোহিতের কাছ থেকে মাস-মাস কিছু টাকা আসে, তাছাড়া সহরের বিশিষ্ট একটা সমাজে সে ওই লাবণ্যকে দেখিয়ে অনেক রকমই সুবিধা-সুযোগ আদায় করে নেয়।

তার ছেলেগুলোও তেমন মানুষ হয়নি। এণ্ডি গেণ্ডির দলই রয়ে গেছে। মধু মুহুরী বেশ জানে এখনই বিয়ে দিলে মেয়েও পর হয়ে যাবে, মোহিতও আর আসবে না। সাহায্যও পাবে না টাকাও পাঠাবে না মাসে মাসে! তাছাড়া সহরের বিশিষ্ট সমাজে মেয়েকে দিয়ে আর ফাংশানও করানো যাবে না। অনেকে তবু ডেকে কথা বলে। খবর নেয়।

উল্টে তারা মনে মনে চটেই যাবে তার উপর। কোন সুযোগ-সুবিধাও আর পাবে না মধু। ও চলে গেলে একেবারে পথে বসে যাবে সে। গিন্নীও আজ কথাটা শোনায় মধু মুহুরীকে।

—মোহিতকে আজই পাকা কথা দিতে হবে। তাহলে এই মাঘ মাসের প্রথম লগ্নে বিয়ে হয়ে যাবে। আমরাও দায় খালাস হই।

মধু মুহুরী অবসর সময়ে বাড়িতে বসে দলিল কোর্টের কাগজপত্রের নকলনবিশী করে, এত খেটেও তার সংসার প্রায় অচলই থেকে যায়। স্ত্রীর কথায় ফোঁস করে ওঠে।

—ভ্যালা বল্লে যা হোক, মেয়ে তো ড্যাং ডেঙ্গিয়ে কলকাতা চলে যাবে। তারপর এই শুয়ারের পাল নিয়ে উপোস দিই। কি বলো? গিন্নী অবাক হয়।

—তবে ! মেয়ের বিয়ে থা দেবে না ?

—ওকেই বলে মেয়ের বুদ্ধি ! দোব না কে বল্লে ?

মধু মুহুরী স্ত্রীকে শোনায় গলা নামিয়ে।

—মোহিতকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, তার ও টাকাটা আসুক।

গিন্নী অবাক হয়।

—মেয়ে বড় হচ্ছে।

হাসে মধু। সহজভাবেই বলে,

—হোক। এদিকে দেখছি আশপাশে তেমন ভালো শাঁসালো পাত্র-টাত্র পাই সেইখানেই মেয়ের বিয়ে দোব। তবু হাতের কাছে থাকবে। আমার বুদ্ধি পরামর্শে চলবে জামাই।

গিন্নী অবাক হয়—সে কি গো ? মোহিতকে কি জবাব দেবে ?

ধমকে ওঠে মধু,

—বেশী ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করোনা, থামো দিকি। জবাব যা দেবার আমিই দোব। যত্তো—

হঠাৎ লাবণ্যকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মধু মুহুরীর মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েটা তাহলে তার মতলবের কথা সবই শুনেছে। ওর মুখ-চোখ তাই গম্ভীর থমথমে।

মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে মধু এই তো সেদিনই বার লাইব্রেরীর কোন হাকিমের ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে যেতেই চায়নি লাবণ্য কিছুতে।

ওদিকে মধু মুহুরী কথা দিয়ে ফেলেছে, তাছাড়া নোতুন আসছেন একটি ছোকরা হাকিম, তাঁর সামনে মেয়ের এলেম জাহির করে রাখা দরকার। কিন্তু বোকা মেয়ে কি তা বুঝবে। তার সেই এক কথা—

—আমি ওই সব ফাংশানে যাবো না।

একেবারে গোঁ ধরে রইল। ওর এত জোরের মূল ওই মোহিতই। সেদিন বলেছিল লাবণ্য।

—মোহিতদা ওসব পছন্দ করে না।

মোহিতদার কথা যেন ওর কাছে বেদবাক্য, বেচারা বাবার কথার কোন দাম নেই। অনেক করে বকে দিয়ে গিয়েছিল মেয়েকে। মধু সেকথা আজও তোলেনি।

লাবণ্য সরে গেল বাইরের দিকে। মধু চুপ করে থাকে।

বড় বড় ঘর—পুরোনো আমলের বাড়ি। তাও চুণবালি খসে একেবারে নোনা-ধরা ইটগুলো দাঁত বের করে আছে। বড় বড় ঘরগুলোর মাঝে একটা টিনের পার্টিশানের খুপরী দিন কয়েকের জন্য ভাড়া নিয়েছে ওই বহুরূপী মনোহর।

ক'দিনে সেও এই সংসারের মানুষ ক'টিকে চিনেছে। মধু মুহুরীকে দেখেছে সকালেই উকিলবাবুর বাড়িতে বের হয়ে যায়! ফেরে বেলাতে।

ওই মধু মুহুরীর চাল-চলন কিছুটা টের পেয়েছে মনোহর। তবু এ বাড়িতে গিন্নীমা, ওই লাবণ্যকে কেমন ভালো লেগেছে তার। মধু মুহুরীকে দেখেছে, সকালের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে চান-টান করে খেয়ে দেয়ে আধময়লা ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে পটি লাগানো ছাতা হাতে, দপ্তরটি নিয়ে কোর্টে গিয়ে ধর্ণা দেয়। শীর্ণ প্যাকাটির মত লোকটার পরিবারের কিন্তু অন্য রূপ।

লাবণ্য আর মোহিতের ব্যাপারটাও জেনেছে সে।

ভালো লেগেছে দু'টিকে, মোহিতের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বেশ জমে উঠেছে মনোহর।

মোহিতের মনের খবরও জানে সে।

মনোহর কিন্তু মধু মুহুরীর কথা শুনে অবাক হয়েছে। লোকটা সত্যিই একটা পাক্কা শয়তান। লাবণ্যের মত মেয়েকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে চায়।

ক'দিনেই সহরের বিচিত্র একটা সমাজের কথাও জেনেছে মনোহর। বহুরূপীর চোখ-কানও খাড়া। তাই লাবণ্যের সম্বন্ধে মধু মুহুরীকেও ওই সব কথা বলতে দেখে মনোহরের ভালো লাগে না।

অন্ধকার নেমেছে বাইরে। পুরোনো বাড়িটার দেওয়ালে উঠেছে ছোট বড় অশথ বটগাছের চারা, উঠোনের এদিক-ওদিক দু'একটা গাছ, ফাঁকা জায়গাটুকু বুজে গেছে ঘাসে।

বের হয়ে একটু ঘুরে আসবে মনোহর, হঠাৎ বাইরে নির্জন উঠোনে পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে কে কাঁদছে।

—লাবণ্যদি!

লাবণ্য মনোহরকে দেখে চমকে ওঠে, তারার আলোয় দেখা যায় তা'
ছ'চোখে জলধারা। মনোহর জানে ওর কান্নার কারণ। মনোহর বলে,

—লাবুদি!

লাবণ্য দাঁড়াল না। কাউকে জানাতে চায় না সে তার ছঃসহ পরাজয়
আর লজ্জার কথা। সরে গেল ভীরু একটি নারী, অন্ধকারে সে আত্মগোপন
করে শান্ত হতে চায়।

বাড়ি ঢোকবার মুখে মোহিতকে একটা বড় মাছ আর কপি নিয়ে ঢুকতে
দেখে দাঁড়াল মনোহর।

মোহিতের সম্বন্ধে মধু মুহুরীর সিদ্ধান্তের কথা সে শুনেছে, সেই প্রতিজ্ঞা
থেকে কেউ তাকে নড়াতে পারবে না। লাবণ্যকে দেখেছে মনোহর। লাবণ্য
তার বাবাকে চেনে। লোকটা তাকে এইখানে বন্দী করে রাখতে চায়,
মোহিত ওই মধু মুহুরীর মনের খবর এখনও জানে না, তাই খুশিতেই আছে।
ও সব কথা জানলে হয়তো রেগে উঠবে।

মনোহর চুপ করে থাকে। লাবণ্য সরে গেছে। তার কান্নাটা ও দেখুক
তা চায় না সে।

তবে লাবণ্যের ভালোবাসায় কোন ফাঁক আর ফাঁকি নেই। তাই
বোধহয় অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে একটি নারী। মনোহরকে দেখে মোহিত
বলে—

—কোথায় বের হচ্ছো হে এত রাত্রে?

মনোহর জবাব দেয়—এমনিই একটু বের হচ্ছিলাম।

মোহিত বলে,—চল, চল। রাতে-ভিতে আর এই পড়োবাড়ির রাজে
নাই বা বেরুলে অন্ধকারে। আদ্যিকালের ধ্বংসপুরী, মা মনসার বাহনদে
রাজ্যি এটা। চল, ভিতরে গিয়ে বসা যাক। ও লাবণ্য!

লাবণ্য এলো না, বের হয়ে এলো দাওয়ায় একটা কেরাসিনের লম্ফ হাতে
লাবণ্যের মা, আর ছ'টো ছোট ছোট ভাইবোন। মধু মুহুরীও তামাক খেতে
খেতে এসে দাঁড়িয়েছে। মাছটা দেখে তারিফ করে মধু।

—বাঃ? বেশ খাসা মাছ তো হে, কপিগুলো বুঝি সদর থেকে আমদানী
তাই বলি এখানের কপি তো এইটুকুন! মোহিতের নজর আছে।

মধু মুহুরীই গলা তুলে হাঁক দেয়।

—অ লাবু, মোহিতের জন্যে এককাপ চা কর বাপু। হাত পা ধুয়ে জিরো'

এইবার মোহিত। ওগো লাবুর মা, ওই মাছের বড় বড় পিস আর কপি দিয়ে বেশ কালিয়া বানাও, দেখো যেন আবার আঙুলকাটা 'খানি' করো না।

মোহিত এদিক ওদিকে দু'চোখ মেলে লাবণ্যকে খুঁজছে। কিন্তু তাকে দেখা যায় না। সে কোথায় তা অনুমান করে মনোহর। লাবণ্যের সেই অসহায় কান্না তখনও তার চোখের সামনে ভাসছে। মধু মুহুরীর এই বিচিত্র রূপ দেখে সে নিজেও আশ্চর্য হয়েছে। হাসছে, আপ্যায়ন করে কথা বলে চলেছে মোহিতের সঙ্গে, অথচ একটু আগেই শুনেছে তার মনের গোপন লোভ আর নীচতার কথা।

সে পেশাদার বহুরূপী, তবু মধু মুহুরীর রূপবদল তার কাছে বিচিত্র ঠেকে। তাকেও হার মানিয়েছে মধু মুহুরী।

মোহিত আজ কথাবার্তা পাকাপাকি করতে চায়।

ক'দিন ধরেই চেষ্টা করেছে কথাটা পাড়তে। কলকাতায় ফেরার দিন ঘনিয়ে আসছে। এখানের পাট চুকিয়ে লাবণ্যকে নিয়ে ফিরে যাবে মোহিত কলকাতায়।

মনোহর চুপ করে বসে আছে। এখানে তার খেলা ফুরিয়ে আসছে। চলে যেতে হবে। তবু ক'দিনেই সে এদের জীবনের সুখ-দুঃখের শরিকান হয়ে গেছে।

সহরে তার বহুরূপীর খেলা শেষ হয়ে যাবে।

এইবার সহর ছেড়ে যাবে গ্রামের কোন মেলার দিকে। যাযাবর জীবন। এখানে দু'দিন ওখানে দশদিন, কোথাও তার ঠিকানা নেই।

মোহিত জিজ্ঞাসা করে,

—পথে পথে—গ্রামে সহরে ওই বহুরূপীর বেশবদল দেখিয়ে কি এমন পাও মনোহর?

মনোহরও তা ভেবেছে। ক্লান্তি এসেছে এই জীবনে। অনেক আশা নিয়েই এই পথে এসেছিল। কিন্তু কোন পূর্ণতাই তার আসেনি।

জানে লোকে সে মনোহর বহুরূপী। এক কথায় বহুরূপী। ওই রূপবদলের বিচিত্র সাজে তার আসল নামটাই হারিয়ে গেছে। জবাব দেয় মনোহর,

—ওই পেটটা চলে যায় মাত্র।

বলে মোহিত—পথে পথে ঘুরে কুকুর-শ্যালেও পেট চালায় রে।

হাসে মনোহর—তাদের সঙ্গে বোধহয় আমার বেশী তফাৎ নেই মোহিত দা। আম্মো ওদের দলে।

কি ভাবছে মোহিত।

ছেলেটা এমনিতে কাজের, বেশ চটপটে। বলে মোহিত,

—দেখ, গাঁয়ে এই এঁদো সহরে ঘোরার চেয়ে কলকাতায় যেতে পারিস? বোধহয় বহুরূপী হয়ে সেখানে কিছু গুছিয়ে নিতে পারবি!

মনোহর চমকে ওঠে। কলকাতা! নাম শুনেছে সে। তাজ্জব সহর। বিচিত্র মানুষের ভিড় সেখানে, নাম অর্থ খ্যাতি প্রতিপত্তি পেতে গেলে তাকে সেইখানেই যেতে হবে। কিন্তু সেখানে যাবার সঙ্গতি তার নেই।

মনোহর জবাব দেয়,

—কলকাতা! সেখানে তো কাউকে চিনি না। তাছাড়া থাকবোই বা কোথায় সেখানে?

হাসে মোহিত। সেও নিজে দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, ঘর পাতবে। বলে মোহিত,

—আস্তানা একটা আছে। চলো না হয় দেখা যাক তোমার বহুরূপীগিরিতে সেখানে কিছু হয় কিনা? কই হে তোমার লাবুদিকে দেখছি না?

মনোহর মোহিতের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। উদার প্রাণখোলা একটি মানুষ। মনোহর চুপ করে থাকে।

মোহিত লক্ষ্য করে সারা বাড়িতে একটা থমথমে ভাব। মনোহর অবধি চুপ করে আছে। মোহিত অবাক।

—কি ব্যাপার হে? মুখ খোল।

মনোহর বলে ওঠে।

—ওর বাপটা সুবিধের নয় মোহিতদা; লাবুদিকে দেখছিলাম বাইরে অন্ধকারে কাঁদছিল। ওই মুহুরীর যেন এ বিয়েতে মত নেই। শুধু ঝুলিয়ে রাখবার তাল ওর। ফেরেববাজ লোক ওটা।

মোহিত চমকে ওঠে,—বলিস কি রে?

কথাটা সত্যি বলেই বোধহয়। মোহিত এতদিন ধরে চেষ্টা করেছে, ওর কাছ থেকে তবু কোন জবাব পায় নি। এমনিতেই গোঁয়ার সে। কাঠ গোঁয়ার। অনেক টাকায় ঢেলেছে ওর পেছনে। খবর করে এবার কলকাতায় বাসা ভাড়া নিয়ে এসেছে—সস্ত্রীক ফিরবে বলে। কলকাতার বাড়িওয়ালাও

তেমনি ত্যাঁদড়, সে পাকাপাকি সর্তের কথা জানিয়েছে, ফ্যামিলি না থাকলে ভাড়া দেবে না সে।

তাই জেনেশুনেই মোহিত পুরোনো মেস ছেড়ে বাসা পেতে এসেছে। আজ সবকিছুরই একটা মীমাংসা করতে চায় সে।

মধু মুহুরী কোর্টে মক্কেল চরায়। উকিলের কাছে থেকে থেকে জেরায় সেও পাকা হয়ে উঠেছে। পাটোয়ারী বুদ্ধিটা তার মাথায় খেলে ভালো।

এ হেন মধু মুহুরীও মোহিতের কথায় আজ ঘাবড়ে যায়। মোহিত বলে চলেছে,

—বিয়ে আপনাকে দিতে হবে, সামনের বুধবারই বিয়ের দিন আছে, ওই দিনই বিয়ে হবে।

আজ মধু মুহুরীকে সোজা কথাটা স্পষ্ট করেই জানিয়েছে মোহিত। মধু এড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। মনোহরই ডেকে এনেছে তাকে

মধু মুহুরী একটু বিপদে পড়েছে। কি জবাব দেবে তাই ভাবছে

গিন্নীও বলে,—বিয়ের দিন ঠিক করো বাপু, শুভকাজে দেরী করে লাভ নেই।

লাবণ্য আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে, তার সারা মনে সেই নোতুন ঘরের স্বপ্ন। মোহিত আর সে ঘর বাঁধবে।

মধু মুহুরীর শীর্ণ দেহটা শক্ত হয়ে ওঠে। মনের কাঠিন্য ভরা স্বরে সে জানায়,

—এখন বিয়ে হতে পারে না, মাঘ মাস মেয়ের জন্মমাস।

গর্জে ওঠে মোহিত,—মিথ্যে কথা। সেবার বলেছিলেন শ্রাবণ মাস। মুহুরীমশায় জবাব দেয়,

—ওই একই কথা। মেয়ের বিয়ে দেবার সামর্থ্য এখন আমার নেই বাবা। সামনের বছর মাঘ-ফাল্গুনে।

মোহিত অনেকবারই এমনি সব কথা শুনেছে। আজ সে কোন কথা শুনতে রাজী নয়। বলে,

—বাড়িভাড়া করে এসেছি। স্ত্রীকে না নিয়ে গেলে সে বাড়িতেও আমায়

থাকতে দেবে না। তাছাড়া আমি দিন বদলাতে রাজী নই। সামর্থ্য আপনার না থাকে—ভালো কথা। সব খরচ আমারই হোক।

হাসে মুহুরী,—সেকি কথা। মেয়ের বাপ আমি··· ।

মনোহরের কাছেও ব্যাপারটা বিশ্রী ঠেকে। ক'দিনেই সে লোকটিকে চিনেছে। সে অধৈর্য হয়ে বলে,

—বাপ না শত্রু মশাই আপনি ; নইলে অমন পাত্র কেউ হাতছাড়া করে ? আপনার মতলব আমি জানি।

—এ্যাঁও। মধু মুহুরী গর্জে ওঠে,—চোপ রও। সাজো বহুরূপী তাই সাজো গে—

মনোহর বলে,

—আমি তো বহুরূপী সাজি, আর আপনি ? দিব্যি তো এদিকে নিচ্ছেন, আবার মেয়েকে আসনে রেখে সহরে জাহির করছেন নিজেকে। বিয়ে দিলে যে তা হবে না। মেয়ে যে চলে যাবে।

মধু মুহুরী ধমক দেয়,

—তোমাকে মানহানির দায়ে কোর্টে সোপর্দ করতে পারি তা জানো ছোকরা ? এ্যাঁ।

মনোহর জবাব দেয়,

—যান, যে আমার মান তার আবার হানি ! কি বলেছেন ওই বসন্তবাবুর ছেলেকে ? তাকে তো প্রায়ই নেমতন্ন করে আনা হয় মশায়। উকিলপাড়ায় ওই করে তো দু'টো উকিলের মুহুরীগিরি করেন, মক্কেল ঠকান। কোর্টে তো দেখি নানানজনের সঙ্গে নানান কথা। যদু উকিলকে তো গান শোনার জন্য ডেকেছেন। ওই লোকটা কেন আপনার পিছনে ঘুরঘুর করে ? ওই মোহনলাল মাড়োয়ারী, তার গদিতে—

—এ্যাও ! খুন করেঙ্গা ! মধু মুহুরী রাগে ফুলছে।

বাধা দেয় মোহিত—থাম মনোহর। আপনি তাহলে বিয়ে দেবেন না ? সাফ কথাটা শুনি এইবার।

—না ! বললাম তো—শুনতে পাওনি ? মধু মুহুরী জবাব দেয়।

মনোহর বলে—তাহলে শুনুন, বিয়ে আমরা জোর করে দোব। মোহিতদা—

মধু কোট পায়। তড়পাতে থাকে বেশ সতেজ গলায়,

—মেয়ে আমার নাবালিকা, বিয়ে দিয়ে মজা দেখো না, ঘানি
নাবো।

মনোহর বলে, টানবো, সেও ভি আচ্ছা, মোহিতদা—

—থাম মনোহর। সব বুঝেছি আমি। চলে আয়।

মোহিতই মনোহরকে জোর করে তার ঘরে টেনে আনে। মোহিতের
চাখের সামনে আজ সব কিছু পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে, এতদিন ওই মধু মুহুরী
তাকে ধাপ্পাই দিয়েছিল।

নিজের বোকামির জন্য এইবার লজ্জাবোধ করে মোহিত। আজ মনে
হয় মধু মুহুরীর এই নিষ্ঠুর খেলায় লাবণ্যের দিক থেকেও সায় ছিল। সকলে
মিলে তাকে প্রতারণা করেছে। আজ মনে হয় লাবণ্যও ওর দলে।

বলে মোহিত,—আমিও ওদের চিনতে পারিনি মনোহর। ওই লাবণ্য
পর্যন্ত আমাকে ঠকালো?

মনোহর তা বিশ্বাস করে না। বলে সে,

—না, দাদা। মানুষ আমি চিনি। লাবুদি তোমায় ঠকায়নি। ঠকাবার
মত মেয়ে সে নয়।

মোহিতের চোখের সামনে আজ দুনিয়ার রূপ বদলে গেছে। এতদিনের
সব ভালোবাসা-প্রীতির কোন দাম নেই। বলে মোহিত,

—সব মিথ্যে কথা মনোহর, আজকের সংসারে মানুষের কোন্‌টা আসল
রূপ তা আর চেনার উপায় নেই। সবাই বহুরূপী সেজে বসে আছে, ধরা
পড়েছিস কেবল তুই। মেয়েরা! ওরা আবার আরও শয়তান।

মোহিতের মনে হয় ওর বাবার কথাতে লাবণ্যও সায় দিয়েছে, নইলে
এতদিন যে তার বাবার কথার প্রতিবাদ করেছে, সেই লাবণ্য কেন জোর করে
আজ প্রতিবাদ করতে পারল না। মনোহর চুপ করে থাকে। মোহিতের
মনের এই জ্বালাটা সে ঠিক বুঝতে পারে না। বাবার চেয়ে লাবণ্যই যেন
আঘাত দিয়েছে মোহিতকে অনেক বেশী।

লাবণ্য সব ব্যাপারটা দেখেছে। তার করার কিছুই নেই। অসহায়
দর্শকের মত সব কিছু দেখে চলেছে সে। তার ঘর বাঁধার স্বপ্ন, ভালোবাসার
স্পর্শ সব কিছু তার বাবাই কঠিন হাতে মুছে দিল।

অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে লাবণ্য, এ কান্নার শেষ নেই। বাবার উপর
রাগ হয়। সে বার বার ভেবে দেখেছে এখান থেকে চলেই যাবে সে।

মোহিত যদি একটু শক্ত হোতো লাবণ্য তখনই বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতো।

বাইরে কিসের শব্দ শুনে মনোহর এগিয়ে আসে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে লাবণ্য।

—লাবুদি!

লাবণ্যের সারা মনের সেই কথাগুলো নীরব অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে। মনোহর জানে এখানে কোন ফাঁকি নেই। লাবণ্য কান্না-ভরা স্বরে বলে,—

—শোন। একটা কথা—

মোহিত আজ ওসব ভুলতে চায়। নিদারুণ আঘাতে তার বুক ভেঙ্গে গেছে। বলে সে,—

ওকে যেতে বল মনোহর। সব কথা আমার শোনা হয়ে গেছে। অপমান সইতে এখানে আর আমি থাকবো না। ভোরের বাসেই স্টেশনে চলে যাবো।

মনোহর চুপ করে থাকে। চোখের সামনে দেখছে সে এই ভুল বোঝা-বুঝির পালা। মোহিত আজ কঠিন হয়ে উঠেছে। লাবণ্যের ভালোবাসাকেও সে আজ প্রত্যাখ্যান করে, অবিশ্বাস আর ঘৃণায়।

মনোহর তো পথের মানুষ, দু'দিন একটা সরাইখানায় এসে মিলেছিল চলতি পথে, তার পথ আবার হারিয়ে যাবে। হয়তো দেখাও হবে না এ জীবনে কারও সঙ্গে।

তবু চোখের সামনে একটা মেয়ে, নিরপরাধ মেয়ের উপর কঠিন এই শাস্তি নামতে দেখে দুঃখ পায় সে। বলে মনোহর,

—দাদা, একটা ভুল করছ তুমি। লাবুদি কি বলে শোনো—

লাবণ্য নিজের অসহায় অবস্থার কথাটা আজ সে জানাতে এসেছে। বাবার মত সে করাবেই, কয়েকটি দিন সময় নিতে চায় সে। কিন্তু মোহিত লাবণ্যের কথা শুনতে চায় না। তার মনে আগুন জ্বলে উঠেছে, অবিশ্বাসের আগুন।

—শুনে দরকার নেই। তোর জিনিসপত্র গুছো।

—আমার? কেন? অবাক হয় মনোহর।

মোহিত জবাব দেয়,—তুই কলকাতায় চল। এখানে তো বহুরূপী দেখলাম, সেখানে তোকে দেখবো। কথা কানে গেলো? ওসব কান্না-ফান্না ভালো লাগে না, ওকে চলে যেতে বল মনোহর।

লাবণ্য আঁধারে সরে গেল। কি নিদারুণ বেদনা বুকে নিয়ে রাত নেমেছে!

ওরা আজই ভোরে চলে যাবে। আঁধারেই এখান থেকে বিদায় নেবে মোহিত। ঘুম আসেনি মনোহরের। ব্যাপারটা তার কাছে বিশ্রী ঠেকে।

সামনের উঠানে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে—লাবণ্যকে দেখে এগিয়ে আসে মনোহর।

—লাবুদি!

লাবণ্য কেঁদেছে কেবল। এখনও তার চোখমুখ থমথমে। বলে লাবণ্য,

—বিয়ে না করুক, অন্ততঃ তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো মনোহর, আমি ওকে ঠকাতে চাইনি। ভগবানের দিব্যি। উনি যদি বলতেন আমি ওর সঙ্গেও চলে যেতাম। মানতাম না বাবাকে, আমাকে যেন ভুল না বোঝেন তিনি।

লাবণ্যের কান্না ভেজা কণ্ঠস্বর যেন জমাট স্তব্ধতায় ঢাকা পড়ে। কাঁদছে সে, মনোহর জানে মেয়েদের প্রেমের ক্ষেত্রে একথা মিথ্যা নয়। ভালো-বেসেছিল লাবণ্য, মোহিতকে সে ঠকায়নি।

মনোহর ওকে সান্ত্বনা দেয়,—সব ঠিক হয়ে যাবে লাবুদি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আজ অন্ধকারে সব হারিয়ে গেছে লাবণ্যের. তাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে দুঃসহ বেদনায়।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। ও এইবার হারিয়ে যাবে। নেহাৎ রাগের বশেই মোহিত তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। সারা মনে একটা চাপা রাগের আভাস ফুটে ওঠে তার।

ট্রেণখানা কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণ মোহিত অতীতের কথাই ভাবছিল। ছায়া ঘেরা সেই ছোট্ট সহরের সব স্বপ্ন তার ধুলোয় মিলিয়ে গেল। অনেক বেদনায় সে চলে এসেছে আজ। তবু এ না করে উপায় ছিল না। মধু মুহুরীকে আর সহ্য করতে পারে না সে। তবু বারবার একজনের কথা মনে পড়ে। দূরে চলে এল। তবু সব রাগ মুগ্ধ-মনের জ্বালা ছাপিয়ে ওর মাঝে মাঝে লাবণ্যের সেই কান্না ভিজে মুখটা মনে পড়ে। ওদের

চলে আসার সময় সে একপাশে ছলছল চোখে দাঁড়িয়েছিল। ওর দু'টো চোখ দেখে মনে হয়েছিল ভোর-রাতের জাগর শুকতারার কথা। কোন কথা বলতে পারেনি লাবণ্য।

ট্রেণটা চলেছে অজানা পথ দিয়ে।

মনোহর একটা জংশন স্টেশনে চায়ের ব্যবস্থা করে।

—হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাও মোহিতদা।

মনে পড়ে মোহিতের, সকাল থেকে চা খায়নি, গরম সিঙ্গাড়া আর চা খালি পেটে তবু খানিকটা ভর আনে। মনটা ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে।

এবার সে তার নিজের কথা ভাবে। মনোহরই বলে,

—ওসব কথা ভেবো না দাদা, ভেবে কোন লাভ নেই। যা হবার তাই-ই হবে, খামোকাই মন খারাপ করো না।

মোহিত ইতিমধ্যে মনোহরকে আরও নিবিড় করে চিনেছে। এতদিন এতবড় পৃথিবীতে সে ছিল একা, তবু লাবণ্যের কথা মনে হতো। সেই-ই ছিল তার নির্ভর।

তার শূন্য জীবনে সেই-ই ছিল একমাত্র ভাবনার পাত্র, আজ সেই বাঁধনও খুলে গেছে।

এমনি আঘাত পাবার দিনে মোহিত চিনেছে মনোহরকে, তারই ম নাম-গোত্রহীন একটি মানুষ। সমাজে তার মতই অনাহূত অপরিচিত সে।

তবু প্রাণের স্পর্শে ভরপুর। কথাটা মনে পড়ে মোহিতের। ভাবনার কথা। কলকাতার জীবনের সমস্যাগুলো এতদিন ভাবেনি, আজ ভাবে।

—যাচ্ছি তো দু'জনে, কিন্তু বাড়িওয়ালা মহা ত্যাঁদড়, গেলেই খবর নিতে আসবে। ফেমিলি নইলে সে বাড়ি ভাড়া দেয় না। বোধহয় ও বাড়িও ছাড়তে হবে। মহা ঝামেলায় পড়েছি রে মনোহর। সব গুলিয়ে গেল।

—বাড়িওয়ালা বুড়ো বোধহয়?

মনোহরের প্রশ্নে মোহিত ওর দিকে চাইল।

—তুই কি করে বুঝলি?

হাসে মনোহর,—বুড়ো, অথব্বো হলে তখন নীতি-জ্ঞান টনটনে হয় গো।

তখন ওরা ভাবে দুনিয়ায় আমিই একমাত্র সাধু ব্যক্তি, আর সব ব্যাটাই জন্তু, লম্পট, দুশ্চরিত্র। তাই তাদের এত ঝামেলা।

মোহিতের সামনে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয়।

—ব্যাটাকে চিনিস না। ঠিক খবর নিতে আসবে বৌ এসেছে কিনা। তখন? হাসে মনোহর। সে জীবনে ওই মোহিতের চেয়ে বেশী কষ্ট সয়েছে, তবু দুঃখ-কষ্টকে ডরায় নি। সহজভাবে জবাব দেয় মনোহর।

—চলো তো কলকাতায়, দেখা যাক ঠাঁই মেলে কিনা!

মনোহর তবু কলকাতার স্বপ্ন দেখে। এতদিনের পর সেখানে যাবার সুযোগ মিলেছে। যেভাবে হোক একটা ঠাঁই তার করে নিতেই হবে।

বহুরূপীর ব্যবসা সে নিতে বাধ্য হয়েছিল, এই তার জীবিকার একমাত্র পথ। মনোহর জিজ্ঞাসা করে,

—কলকাতার পথে তো মেলাই লোক, দু'দিকে দোকান পশার, না? মোহিত বলে,

—চলনা, দেখবি আর চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। একা একা পথে বেরোস নি, হারিয়ে যাবি।

মনোহর বিচিত্র একটি স্বপ্ন নিয়ে কলকাতার দিকে চলেছে। মনে মনে তার অনেক আশা, কলকাতাকে চিনবে, জয় করবে তাকে।

অবাক হয়ে যায় সে।

সত্যিই বিচিত্র সহর। হাওড়া স্টেশন থেকে বের হয়ে বিরাট ব্রিজটার দিকে চেয়ে থাকে। গাড়ি ট্রাম দোতলা বাস আর লোকের সমুদ্র দেখে মনোহর স্তব্ধ হয়ে গেছে। জীবনে এত লোক একত্রে এর আগে দেখেনি। সব কেমন যন্ত্রের মত চলেছে কলকাতার পথে।

বিচিত্র পোশাক পরা নানা দেশের লোক সেখানে ভিড় করেছে। এখানে বিচিত্র সব কিছু,—এ্যাই! মোহিতের ডাকে মনোহরের চমক ভাঙে। মনোহর মনে মনে জোর পাবার চেষ্টা করে, মহানগরীর এই বিচিত্র মায়াময়ী রূপ দেখে সে ঘাবড়ে যায়নি। সেই-ই রূপবদলের যাদুকর। তার নিজের মনের অতলে জোর খুঁজছে সে।

এখানের ভিড়ে সে হারিয়ে যাবে না। সে এই মাটিতে তার ঠাঁই করে নেবে।

সেই আশাতেই ঢুকেছে এখানে। মনোহর জবাব দেয়,

—চল গো দাদা। আমি ঠিক আছি, শুধু দেখছি গো।

বাড়িখানায় অনেকগুলো ছোট বড় ফ্ল্যাট মত। বাড়িওয়ালা গণেশবাবু নিজের চেষ্টায় বড়লোক হয়েছে। জীবনের প্রায় সব দিনগুলোই তার চলে গেছে ওই রোজগারের চেষ্টায়। ভোগ করবার কোন অবসর মেলেনি। এতদিন বিশ্রামও পায়নি, শুধু খেটেছে মাত্র।

এতদিনে কাজের চাপ একটু কমেছে। নিজে কালীভক্ত লোক, বদলোকে বলে গণেশবাবু নাকি কারণের লোভেই মা কালীর ভক্তের দলে নাম লিখিয়েছে। এমনিতেই মায়ের নাম করে প্রায়ই। অবশ্য সেটা বদহজমের উদ্‌গারের মত গম্ভীর দমকে একেবারে নাভিকুণ্ডল থেকে বের হয়ে আসে। মাথায় গলায়, মাফলার জড়ানো, চোখ দু'টো বেশ বড় সাইজের, সব সময়েই সে দু'টো রঙ্গীন হয়েই থাকে। মুখে তার মিষ্টি কথাবার্তা তেমন নেই, কেবল হাঁকাড়ি ছাড়ে। তবে এ বাড়ির অনেকে জানে গণেশবাবু অনেকের ভাড়াই মুকুব করে মাঝে মাঝে। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তাই শেষ জীবনে নজর দোষও ঘটে, এদিক-ওদিকে চায়। মাঝে মাঝে এক-আধটু মনকে রঙ্গীন করে তোলার চেষ্টা করে মাত্র। তাছাড়া আর সব দিকে খুব হিসেবী। বার বার ঠকে সে নিজে বাড়িভাড়ার আইন করেছে ফ্যামিলি নিয়ে থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে ক'দিনই খবর নিয়ে গেছে গণেশবাবু, মোহিত তখনও ফেরেনি। সকাল বেলাতেই সেদিন গণেশবাবু নিজে এসেছে। মোহিত বর্তমানে গণেশবাবুরই জানাশোনা একটা বড় গ্যারেজের হেডমিস্ত্রী। রোজগারপাতিও মন্দ করে না। তাই ভাড়া দিয়েছে তাকে। বেচারা নোতুন সংসার পাতবে তাই ঠাঁই দিয়েছে তাকে। তবু বাউণ্ডুলে লোকটাকে কেমন ভালো লাগে তার।

মোহিত কাল রাত্রে ফিরেছে। অনেক আশা নিয়েই সে এই বাসা বেঁধেছিল, কিন্তু ঘর তার শূন্যই রয়ে গেল। সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। লাবণ্য আসেনি।

মনোহর সকালে উঠে নিজেই ষ্টোভ ধরিয়ে চা টোষ্ট করে দিয়েছে

মাহিতের তবু খানিকটা সুসার হয়; মনোহর নিজের কাজ নিয়ে এইবার ্যান করছে।

সকালে উঠে বড় রাস্তাটা দেখে এসেছে, সাত সকালেই অভ্যাস মত এইবার বের হবার কথা ভাবছে। মোহিতের মনটা ভালো নেই। কাজে গলে মালিক সিদ্ধেশ্বরবাবু নিজে খবর নেবেন। বিয়ে করবে বলে কারখানা থকে আগাম কিছু টাকা নিয়েছে। কারখানার অনেকে জানে সেই খবর। তারাও একদিন এখানে বৌ দেখতে আসবে।

কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। কি জবাব দেবে তাদের তাও জানে না মাহিত। তবে মনে হয় খুশি হবে কেষ্টো। তার মনে মোহিতকে কেন্দ্র করে অন্য একটা আশা ছিল। শরীরটাও ভালো লাগছে না। বিছানায় পড়ে আছে মোহিত। কাজে যাবার ইচ্ছে আজ নেই।

বেলা হয়ে গেছে।

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে উঠল সে। দরজাটা খুলে দিয়েই বিবর্ণ মুখে দাঁড়াল মোহিত। ঢুকছে স্বয়ং গণেশবাবু।

—তাহলে শুভ কাজ ভালোয় ভালোয় চুকে গেল? তা আমার মিষ্টি কই? একেবারে বিয়ে করে বৌ-টৌ এনে যে থ' মেরে গেলে হে। তা বৌ বুঝি বেশ সুন্দরী এ্যাঁ, মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে? আরে ওসব ঠিক হয়ে যাবে বাবাজী, আমাদেরও অমন হয়েছিল। ক্রমশঃ চাপ পড়ুক, সব সখ তখন কর্পূর হয়ে উবে যাবে। গলা তুলে বলে গণেশবাবু,—কইগো, নতুন মা জননী কোথায়? এলাম দেখা করতে, একবার তোমার অধম সন্তানকে দেখা দাও।

মোহিত আমতা আমতা করে। কি জবাব দেবে জানে না। বেশ জানে আসল কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে এখুনি গণেশ দত্ত তাকে মালপত্র সমেত এ বাড়ি থেকে একেবারে রাস্তায় বের করে দেবে। মোহিত বলে,—মানে লজ্জা—

গণেশ দত্ত তখনও বলে চলেছে,

—আমাকে আবার এত লজ্জার কি আছে? এ্যাঁ!

মোহিতের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। গণেশ দত্ত বলে,

—কই হে মোহিতবাবু, একবার ভিতরে গিয়ে বলোগে বউকে; মানে তাকে একটু দেখা দরকার। পাঁচজনের বাড়ি। ফ্যামিলিম্যান সবাই, তা বৌমার এত লজ্জা হলে তো চলবে না।

মোহিতের মনে হয় সব কথাই খুলে বলবে বুড়োকে, তারপর যা হয় দেখা যাবে। বলবার চেষ্টা করে,

—মানে আমার ওই যে বললেন স্ত্রী, একটা ব্যাপার—

হঠাৎ শাড়ির একটা আঁচল ঘরের ভিতরে ওদিকের দরজার কাছে এসে থেমে গেল। মোহিত অবাক। চুড়ির শব্দ ওঠে।

দেখা যায় একটি মেয়ে প্লেটে করে দু'টো রসগোল্লা এনে গণেশবাবুর সামনে ধরে দেয়, ঘোমটায় মুখ ঢাকা; তবু ওর চলায় একটা সজীব ছন্দ ফুটে ওঠে।

গণেশ দত্ত খুশি হয় সামনে ওই রসগোল্লা দেখে।

—এই নাহলে মা জননী, দেখ মোহিতবাবু, মা আমার অন্নপূর্ণা।

মেয়েটি ঘটা করে প্রণাম করে ভিতরে চলে গেল। গণেশ দত্ত ফোকলা দাঁতে রসগোল্লা চুষতে চুষতে বলে,

—খাসা বৌ হয়েছে মোহিতবাবু, দেশগাঁয়ের মেয়েদের কেমন লজ্জা দেখেছো। তাই বলছিলাম মোহিত বাবাজী, কলকাতার মেয়েদের মত গায়ে পড়া বেলেল্লা ওরা নয়। চলি আজ! হ্যাঁ—রসিদটা রাখো। বাড়িভাড়ার রসিদ। খুব খুশি হলাম মাকে দেখে।

গণেশবাবু চলে যেতেই লাফ দিয়ে উঠেছে মোহিত। তার নিজের কাছেই বিস্ময় ঠেকে। তবে এই ঘরে ধেয়ে এল কে? এখুনি সব ব্যাপারটা নিয়ে একটা চরম কেলেঙ্কারী হয়ে যেতো, কিন্তু মেয়েটি কে তা জানে না। সব তার কাছে বিচিত্র ঠেকে। গণেশবাবু নয়, সে নিজেই চমকে উঠেছে।

ওপাশের ঘরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে চায়। মেয়েটিই বা কে জানেনা! কি ভেবে ইতস্ততঃ করে মোহিত ওদিককার ঘরের মধ্যে ঢুকে কাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। দেখা যায় মেয়েটি দিব্যি একটা বিড়ি ধরিয়ে ফুস্ ফুস করে টানছে।

—তুই। মোহিত অবাক হয়।

মনোহর মেয়ে সেজে ফেলেছে ইতিমধ্যে। সেই মেয়েরূপী মনোহর জবাব দেয় হাসতে হাসতে,

—বাব্বা! এক্ষুণি বৌ দেখতে না পেলে বাড়ি থেকেই দূর করে দিতো; কি করা যাবে, দিলাম বুড়োকে একটা ধাপ্পা। বৌ সেজে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিলাম। যাই বল—বুড়ো কিন্তু লোক খারাপ নয় দাদা।

মোহিত হাসতে থাকে,—তা ব্যাপারটা মন্দ হয়নি।

মনোহর গম্ভীরভাবে বলে,—ও বিদ্যাটা সাধনা করেছি দাদা। দেখা যাক রূপবদলের পালা কদ্দুর চলে।

কলকাতার পথে আজ বের হয়েছে মনোহর কি একটা আশা নিয়ে। এতদিন মফঃস্বলের সহর পল্লী অঞ্চলে তার বহুরূপীর এলেম দেখিয়েছে। এক একদিন এক এক বেশে পথে বের হতো সে।

ছোট জায়গা। সবাই সেখানের মুখ চেনা। তাদের মধ্যে বিচিত্র সাজের একটি মানুষকে সহজেই চোখে পড়ে। এক একদিন এক এক সাজে সে সদর াস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোনদিন বা নার্স, কোনদিন কলেজ ষ্টুডেণ্ট, কানদিন রক্ষাকালী, কোনদিন ময়ুর-বাহন কার্তিক, কোনদিন বা পাগল না য় কোন ফেরিওয়ালা, কোনদিন সাজতো পুতনা রাক্ষসী।

পিছনে পিছনে যেতো একপাল ছোট ছেলেমেয়ে। কয়েকদিন ধরে হুরূপীর সাজ দেখিয়ে শেষদিন দাড়িওয়ালা মুনি সেজে কমণ্ডলু হাতে করে ার মজুরী বাবদ কিছু কিছু অর্থ প্রার্থনা করতো সকলের কাছে। যে যা দিত তাই নিয়ে আবার রওনা হতো অন্যত্র।

কলকাতার রাস্তায় আজ অনেক খেটে রূপবদল করে বের হয়েছে মনোহর। ড় রাস্তা দিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পানের দোকানের আয়নায় দেখে নজেকে; আর যেন চেনাই যায় না। রাস্তায় সারা দেশের লোক যেন ভেঙ্গে পড়েছে!

তারই মাঝে চলেছে মনোহর। দু'দিকে সারবন্দী দোকান পশার। াচের ঝকঝকে শো-কেসে কতো কি সাজানো। তার দেখা ছোট সহরগুলো র তুলনায় অতি সামান্য। এখানে তবু মনে হয় ভালো পয়সাই দেবে ওরা শষ খেলার দিন। কিন্তু তবু হতাশ হয় মনোহর। তাই এই রূপবদলের দিকে কারও তেমন নজর নেই। এখানে যে যার কাজে ব্যস্ত। ট্রাম বাসের দিকে ছুটে চলেছে সবাই, লোকভর্তি গাড়িগুলো বেগে বের হয়ে যায়। দোকানদারটাও কোনদিকে দেখে না।

সবাই এখানে কেবল ছোটে, কারোও বোধহয় দাঁড়াবার সময় নেই। যৌবনবতী একটি নারীর এখানে কোন আকর্ষণ নেই, পথে অনেক এমন মেয়ে চলেছে। বরং রূপ আর লাস্যে এবং দেহের নির্লজ্জ প্রকাশে তার থেকে ওরা অনেক সেরা। তাদের দিকেও কেউ বড় একটা দেখে না, তার দিকে চাওয়া

তো দূরের কথা। মনোহরের সাজবেশ এখানে বিশেষ কোন সাড়া আনে না।

বড়জোর রাস্তার দু'একটা চ্যাংড়া ছেলে সিটি দেয়। পথ দিয়ে চলেছে সেই নারীবেশী মনোহর, কেমন যেন হতাশ হয়েছে সে।

তার রূপবদলের দিকে কোন কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে কেউই চেয়ে নেই। যে যার কাজে ব্যস্ত।

রাস্তার ধারে একটা পাগলকে দেখে দাঁড়াল মনোহর। পাগলও তার দিকে চেয়ে থাকে। মনোহরের কেমন যেন সাহস জাগে মনে। বোধহয় ও তারই সমগোত্রীয়। পাগল সেজে সেও পথে পথে বহুরূপীর সাজ দেখাতে বের হয়েছে. ওর দিকে এগিয়ে যায় মনোহর। তবু যেন তার পথের আর একজন পথিককে দেখছে সে।

—কদ্দিন এ পথে ঘুরছো ভাই?

পাগল বুদ্ধিমানের মত হাসতে থাকে, কি ভেবে জবাব দেয় মনোহরের কথায়।—অনেকদিন।

—বহুরূপীর বেশ বদল করে কেমন আদায় হয় দর্শনী! লোকে বক্‌শিস্ দেয়। অনেক তো লোক এখানে।

পাগল হাসতে থাকে, সেই হাসির ধারাটা অট্টহাসির প্লাবনে পরিণত হয়। মনোহর চমকে ওঠে। পাগল বলে ওঠে,—বহুরূপী!···আরে দুনিয়ায় বহুরূপী কে নয়? তুমি আমি ওই বাবুরা দিদিমণির দল সবাই! সবাই এখানে বহুরূপী।

ওর উদ্‌ভ্রান্ত হাসিতে লোকগুলোও হাসছে। কে সায় দেয়,—ঠিক বলেছিস পাগলা, তা দিদিমণি কি বলে রে?

পাগলা হাসি থামিয়ে চোখ পাকিয়ে লোকগুলোর দিকে তেড়ে যায়। গজরাতে থাকে।—আমি পাগল! যে বলে সেই শ্লা পাগল।

বেসুরো কণ্ঠে বিকট চীৎকার করে চলেছে সে। দু'চারজন পথচারীও জুটে যায়। পাগলের পাগলামির মাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। হাতের ময়লা পুঁটলিটা তুলে মিটিং-এ বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে সে তখন তারস্বরে চীৎকার করে চলেছে গলা সপ্তমে তুলে। লোকজন জুটে গেছে! মনোহর দেখে গতিক সুবিধার নয়, দূরে সরে এল। সত্য সত্যই এক পাগলকে ঘাঁটিয়েছে সে। তার চীৎকার শোনা যায় তখনও।

—পাগল ! One morn I met a lame man in a lane close to my farm—

চুপ করে সরে এল নারীবেশী মনোহর।

একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছিল সে। তাজ্জব সহরই বটে এই কলকাতা, এখানে আসল নকলে কোন তফাৎ নেই। আসল পাগলই এই লোকটা।

বহুরূপীর আসল রূপ তার।

কেমন হতাশ হয়েই বাসায় ফেরে মনোহর। মোহিত সারাদিন ধরে ভাবছে। কারখানায় কাল থেকেই যাবে। একটা লজ্জাই ছিল তার মনে।

লাবণ্যের কথা মনে পড়ে, কিন্তু সে সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় সে। সে কথা ভুলে যাবে মোহিত।

আবার নতুন করে সে শুরু করবে তার জীবন।

একটা কৈফিয়ৎ সে মনে মনে ঠিক করে নেয়।

মনের সেই হারানো জোর ফিরে আসে। বাড়িওয়ালাকে খুব ঠাণ্ডা করেছে মনোহর।

ছেলেটা কাজের আছে। ওর একটা গতি করে দিতে পারলে খুশিই হবে মোহিত। হঠাৎ একটি মেয়েকে তার ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয় মোহিত। পরক্ষণেই হাসিতে ভেঙে পড়ে।—তুই। তাই বল ! তা মানিয়েছে খাসা ! কোথা গিইছিলি র‍্যা ?

মনোহর হতাশ কণ্ঠে জবাব দেয়,—ভাবছি কলকাতা থেকে ফিরেই যাবো দাদা।

অবাক হয় মোহিত,—কেন ?

—পথে বের হলাম কত যত্ন করে সাজগোজ করে, কালীপুর হলে এতক্ষণে হাওয়ায় খবর ভেসে যেতো মনোহর বউরূপী এসেছে, তা এখেনে পথে পথে ঘুরলাম, কেউ খেয়ালই করলো না। এখানে বহুরূপী সেজে লাভ হবে না দাদা। ভাবছি ফিরেই যাবো। আমাদের সেই দেশ পাড়াগাঁই ভালো।

হাসতে থাকে মোহিত। তার মাথায় বিচিত্র বুদ্ধিগুলো গজিয়ে ওঠে। মনোহর অবাক হয়।

—হাসছো যে ! আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর তুমি হাসছো ?

মোহিত ওর মুখে হতাশার কালো ছায়াটা দেখেছে। নিজের দুঃখ-বঞ্চনার কথা ভুলে যায় সে। মনোহর কলকাতাকে এখনও চেনেনি। এখানের পথ

আলাদা, সেই কথাটাই জানতো না সে। মনোহর এতদিনকার রীতিতেই চলেছিল, এখানে তাই হেরে গেছে। কেউ ওকে চেয়েও দেখেনি।

মোহিত বলে,—তুই কলকাতার রাস্তায় বহুরূপী সেজে বেরিয়েছিলি? মনোহর বিস্মিতকণ্ঠে জবাব দেয়,

—হ্যাঁ! কেন?

মোহিত জবাব দেয়,—একটা আস্ত আহম্মক তুই! ওরে কলকাতার জীব মাত্রেই বহুরূপী। ওদের একটা রূপ নেই, অনেকগুলো বিচিত্র রূপ ওদের। সবাই এখানে বহুরূপী সেজে ঘুরে বেড়ায়। কে কাকে দেখবে বাবা?

মনোহরের কাছে কথাটা সত্যি বলে মনে হয়। এখানের রাস্তায় অনেক মেয়েদের দেখেছে রং পাউডার আর চশমায় সেজেছে তারা; মনে হয় আসলে ওরা যেন এক একটি জীব। পাগলগুলো সবাই সুস্থ মানুষ, পাগল সেজেছে মাত্র, আর সুস্থ মানুষগুলো মনে হয় আস্ত পাগল। তারাও বেশ ভদ্রলোক সেজে ঘুরছে।

মনোহরের কাছে সব কেমন উল্টোপাল্টা বলেই বোধ হয়।

—তবে! সবাই যদি বহুরূপী তবে আমি শালা বহুরূপী হয়ে এখানে কি করবো?

মোহিত হাসে।

—পথ আছে বৎস। তার সঙ্গে একটু বুদ্ধি আর হুঁস, দু'টো লাগালেই ব্যস! তোর অন্ন মারে কে? চড়চড়িয়ে উঠে যাবি মনোহর। আর সেই সূর্যের মত প্রতিভার পাশে ছায়া হয়ে যাবি।

লোক ঠকাতে হবে?

মনোহর কথাটা যেন বুঝতে পারে। মোহিত আবার হাসতে থাকে ওর কথায়।

—ঠিক ধরেছিস! তবে মাঝে সাঝে। এইতো এই গণেশ-বাড়িওয়ালা। আরে বাপু, তোর তো মাস মাস ভাড়া পেলেই হল, তা নয় বৌ চাই। তা বৌ না পেলে কি করি। ওই করতে হল! দ্যাখ কাজ হয়েছে তো?

ভালোভাবে থাকতে তোকে দেবে? ভালোর কাল নেই। কেবল ঠকতে হবে। আমাকেও তো মধু মুহুরীর ওই মেয়েটা ঠকালো। তবে? আমরাই বা ঠকাবো না কেন? বল?

মনোহর কথাগুলো শুনছে। কিন্তু এ বিদ্যা নিয়ে সে লোক ঠকাতে চায়

না। তার মনে কোথায় বাধে। মোহিতের কথাগুলো সত্যি বলে মনে হয়। এ দুনিয়ায় সবাই সবাইকে ঠকাচ্ছে। সেও এতদিন কেবল ঠকে এসেছে।

কথাটা ভাবছে মনোহর। একটা সমস্যার কথা। দেশ পাড়া-গাঁয়ে তবু বাঁচার পথটা সে জানতো, এখানে সবই অনিশ্চিত ব্যাপার। মোহিতই সান্ত্বনা দেয়, —সব ঠিক হয়ে যাবে। নিদেন মিস্ত্রীগিরি তো শিখতে পারবি; দোব গ্যারেজে জুতে। কাজকর্ম শিখলে পেটের ভাত মারে কে? কি রে, চুপ করে আছিস যে?

মনোহর এমনি করে বাঁচতে চায়নি। সে মনে মনে অন্য জগতের কল্পনা দেখে। মোহিত বলে,—কথাটা বাবুর মনে লাগল না? তা লাগবে কেন? বাবু যে হিরো হবেন। আরে বাবা আমরা কুলি-কাবারি মানুষ। ওই হাতুড়ি লেদই বুঝি।

হঠাৎ দরজার বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ কানে আসে, তারপরই শোনা যায় বিরাট একটা হুঙ্কার। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ উঠছে।

—মোহিত! অ মোহিত!

মোহিত চমকে ওঠে। তার মালিক সিদ্ধেশ্বরবাবু স্বয়ং খবর পেয়ে এসেছেন। তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়,—কইরে, বৌমা কোথায়? দেখি একবার! তোরও তো পাত্তা নেই! ফিরেছিস, একবার গেলি না পেন্নাম করতে।

কিছু ভাববার আগেই হুড়বড়িয়ে লোকটা দরজা খুলে ঘরে ঢুকে সামনেই মেয়েবেশী ওই মনোহরকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

আপাদমস্তক দেখছে তাকে, আইবুড়ো একটি সোমথ সুন্দর মেয়ে। বুড়ো সিধুবাবুর চোখে আবার কেমন ছানি জমছে, ভালো করে দেখতে পায় না। তবু বেশ বোঝে ওর সিঁথিতে সিন্দুর নেই।

মোহিত কি করবে, কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

ধমকে ওঠে মনোহরকে,—হাঁ করে দেখছিস কি, প্রণাম কর মনু। আমার মালিক, অন্নদাতা। মোহিত সিদ্ধেশ্বরবাবুর সামনে যেন ধরা পড়ে গেছে। বাড়িওয়ালাকে ঘোমটা পরে ফাঁকি দিয়েছিল মনোহর, এখানে সে পরিচয় দিলে চলবে না। তাই ভাবতে থাকে মোহিত কি বলবে।

সিদ্ধেশ্বরবাবুও একটু বিস্মিত হন এখানে এমনি একটি আধুনিকাকে দেখে। বুড়োর চোখে কেমন ধাঁধা লেগেছে। আইবুড়ো মেয়ে। মোহিতও ভেবে-চিন্তে ইতিমধ্যে একটা জবাব ঠিক করে। এতক্ষণে যেন একটা পথ পায়। বলে

চলেছে মোহিত,—আমার বোন মন্নু। ঘর করবো কি মল্লিকমশাই, গলায় কাঁটার মত ওই মা-বাপ মরা বোন ঝুলছে, আর একটা ভাইও আছে। তাদের গতি না করে নিজে বিয়ে করে ওদের তো ভাসিয়ে দিতে পারি না। তাই বলে এলাম কন্যেপক্ষকে, দু'টি বছর সবুর করতে হবে, তার আগে এ শর্মা বিয়ে করবে না।

সিধু মল্লিক সামনের একটা মোড়ায় চেপে বসে সায় দেয়,—ঠিক কথা! ওদের তো ভাসিয়ে দিতে পারিস না।

মোহিত এইবার কোট পায়, বলে চলে,—বলুন! তাই বল্লাম দেশে থেকে কিৎসু হবে না। কলকাতায় চল। মহাদেবের মত মালিক আমার। চরণের ধূলায় বোস, একটা হিল্লে হয়ে যাবে তোর।

এ্যাই মন্নু! শীগ্‌গীর একটু সরবত করে আন পাতিলেবুর রস দিয়ে, মল্লিকমশাই এর জন্যে।

মনোহর ভিতরে চলে গেল।

সিধু মল্লিকের এক নজরেই চোখ মন দুই-ই ভরে গেছে। সুন্দর মেয়েটির রূপ যৌবনের অভাব নেই। বুড়ো সিধু মল্লিকের বাড়ির খবর জানে মোহিত।

বুড়োরে অঢেল টাকা। তবু সংসারে এক নাতনী ছাড়া তার আপন কেউ নেই। পর পর তিনটি সংসার করেছিল।

কিন্তু কোন স্ত্রী-ই বর্তমান নেই। বুড়ো একা। সিধু মল্লিক বলে চলেছে ওর কথাগুলো শুনে,—তা বেশ করেছিস মোহিত, সংসারে কর্তব্য করে যা। ওই সবচেয়ে বড় ধর্ম। নিজের জন্য আমি কিছু করেছি? বল! সব পরের জন্যই।

মনোহর লজ্জাবতী লতার মত সুঠাম ভঙ্গীতে সরবত-এর গেলাস নিয়ে ঢুকেছে, সিধু মল্লিকই অভয় দেয়,—এসো, এসো। ভয় কি!

মোহিত মল্লিকমশাইকে ঠাণ্ডা করতে পেরেছে। নইলে যে কড়া ধাতের লোক, তাকে সামলানো দায়। বেশ ক'দিন কামাই করেছে মোহিত, তাই বুড়ো নিজেই এসেছিল ধমকাতে।

এদিকে সিদ্ধেশ্বরবাবু খুব কড়াধাতের মনিব। কর্মচারীদের মাইনে বোনাস সবই দেন, কিন্তু তাদের কাজে ফাঁকিও তিনি সইবেন না। আজ সেই নিয়েই কথা শোনাতে এসেছিলেন, কিন্তু ঢুকেই সামনে অমনি একটি মেয়েকে দেখে চুপ করে গেছেন। শুধু তাই নয়, তার দুঃখের কথা শুনে যেন নিজেও দুঃখ

বোধ করেন, সমবেদনা জানান। মোহিত মনিবকে আজ নোতুন চোখে দেখে।

মোহিত বলে চলেছে,—বোন আমার খুব ভালো মেয়ে মল্লিক মশাই। গান যা গায় চমৎকার! .

—তাই নাকি! সিধু মল্লিক খুশিতে উপছে পড়ে। তার কুঞ্চিত মুখে খুশির বিকৃতি জাগে। বলে,—বাঃ! তাহলে একদিন তোমার গান শুনতে হবে, কি বল মোহিত?—নিশ্চয়ই। মোহিত জবাব দেয়।

সিধু মল্লিক বলে,—ভালো গান জানলে আজকাল ট্যুইশনিও করে অনেকে। একজন গানের ভালো মাষ্টারনী খুঁজছিলাম, সে কথা পরে হবে। আজ চলি।

বোনরূপী মনোহর প্রণাম করে ভিতরে চলে গেছে। মল্লিকমশাই ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে। পরক্ষণেই মোহিতকে বলে,—তাহলে কাল থেকেই কাজে যাচ্ছিস তো? ওদিকে যে ডুবে যাবে গ্যারেজ-কারখানা?

হাসে মোহিত,—না, না। কালই যাবো। মনটা বিশেষ ভালো ছিল না, বিয়ে পিছিয়ে গেল, এদিকে এই দায় দায়িত্ব বাড়লো, নানা অশান্তিতে আছি।

মল্লিকমশাই জবাব দেয়,—কাজ-কর্ম দেখ, ওসব কথা পরে ভাবা যাবে।

গলা তুলে মল্লিকমশাই শোনায় মোহিতের বোনের উদ্দেশ্যে—তাহলে পরে একদিন এসে তোমার গানটান শুনবো কিন্তু। ঠাকুর দেবতার গানটান জানো তো? কেত্তন!

মাথা নাড়ে মনোহর, সিধু মল্লিক খুশি হয়,—বেশ। বেশ। ভক্তিমূলক গান গাওয়া ভালো।

মোহিত মনোহরকে বের হয়ে আসতে দেখে ধমক দেয়,—পেন্নাম কর। গুরুজন!

প্রণাম করে মনোহর। মল্লিকমশাই খুশি মনে বের হয়ে যায়।

ও চলে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে হাসতে থাকে মোহিত। মনোহর বলে ওঠে,—বাড়িওয়ালা জানে বৌ, তোমার অন্নদাতা জানলো বোন।

মোহিত হাসতে হাসতে জবাব দেয়,—তুই তো বহুরূপী রে, এতেই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? দেখনা কোথাকার জল কোথায় গিয়ে ঠেকে। তুই বহু-রূপী, আম্মোও। কে নয়? ওই সিধু মল্লিকও। ব্যাটা এমনিতে একেবারে সাধু পুরুষ বুঝলি। গুরুদেব আছে, কি ভক্তি ওর! ম্যা ম্যা করে আর পাওনাদারকে ঠকায়, খদ্দেরকে ঠকায়। মুখের বুলিতো দেখলি—মধুমাখা।

সব বুজরুকি, ওটা ওর সাজ।

এদিকে লোভ আছে ষোলআনা। তোকে ওই সাজে দেখেই থ' মেরে গেছে। চাউনি দেখলি না? ব্যাটা যেন চোখ দিয়ে গিলছিল, দেখিসনি? মুখে বলে ঠাকুর দেবতার নাম—যত্তোসব।

মনোহর বসে নেই। কিছুদিন কলকাতায় এসেছে, মাঠে ঘাটে পথে পথে ঘুরছে এতদিন, চেহারাতেও একটা কাঠিন্য এসেছিল সেই রুক্ষতার জন্য।

কিছুদিন কলকাতার পাইপের জল পেটে পড়েছে, আর খোলা মাঠে রৌদ্রে ঘোরাঘুরির ধকলটাও বেঁচেছে, তাই তার চেহারাতে একটা শ্রী আর জেল্লা ফিরে এসেছে। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে চেয়ে নিজেই অবাক হয়। সাজলে তো চেনাই যায় না তাকে।

মাঝে মাঝে দু'একটা সখের থিয়েটারের দলে মেয়ের পার্ট করছে, দু'দশ টাকা নিজেও হাতে পায়।

দেখেছে জীবনে অনেক কিছু। মানুষের অন্তরের দুর্বলতাটাকে সে চিনেছে ক্রমশঃ।

পথে ঘাটে অনেক কিছুই দেখছে সে।

একদিন কোন থিয়েটারের পার্ট করে ফিরছে সে। মেকআপও তোলেনি। ট্রামে উঠে কি ভেবে লেডিজ সিটেই বসেছে মনোহর সিটটা খালি দেখে।

তার পাশেই একটি মহিলাকে বসতে দেখে সরে বসল। মহিলাটি ওর দিকে চেয়ে থাকে।

কেমন অস্বস্তি বোধ করে মনোহর। তার ষ্টপেজ এসে গেছে। দেখে মহিলাটিও এগিয়ে যায়। সেও বোধহয় নামবে।

মনোহর মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে।

তার পোশাক-আশাক্ একেবারে কেতা দুরস্ত। মাথার বেণীটা বেঁধেছে পরচুল দিয়ে। মুখে রং এর প্রলেপ। যৌবন কমনীয়তা তেমন কিছু নেই।

তবু একটা কৃত্রিম ভাব আছে। চটক আছে। সাজবেশ করতে জানে। মনোহরের রূপ-শিল্পী মন একটা কল্পনা করে নেয়। মেয়েটি প্রশ্ন করে ওকে, —আপনি কি থিয়েটারে গেছলেন?

মনোহর ঘাড় নাড়ে।

ট্রামটা থামতেই নেমে পড়ে মনোহর। মহিলাও নেমেছে সেইখানেই ট্রাম থেকে। মনোহরের কাছে ওদিকটা তেমন জানা নয়, পথও চেনে না,

ওই মহিলাকে এড়াবার জন্যই সে নেমে পড়েছিল মাঝপথে, কিন্তু তবুও এড়াতে পারেনি ওকে।

সামনের দিকে চলেছে মনোহর, একটু জোরে জোরেই যেতে হবে তাকে, গলির মোড়ে ঢুকে যাবে।

মনোহর এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। যেন ধরা পড়ে গেছে সে ওই মহিলার কাছে।

আবছা অন্ধকার পথ।

জায়গাটা নির্জন। এখনো দু'চারটে পুরানো গাছ ছায়া অন্ধকারে ভরে রেখেছে ঠাঁইটা।

—শুনুন!

মহিলাটি এগিয়ে আসে। যেচে কথা কয় সে,...আপনি এইদিকেই থাকেন বুঝি!

ঘাড় নাড়ে মনোহর। মেয়েটি আমন্ত্রণ জানায়,—চলুন না, আমাদের বাড়ি। আলাপ পরিচয় হবে, পাড়াতেই থাকেন। কাছেই তো বাড়ি আমাদের।

ভদ্রমহিলা বলে চলেছে,—থিয়েটারে দেখলাম আপনি তো গানটান ভালোই জানেন, আমার একটা গানের স্কুল আছে। একজন ভালো গাইয়ে খুঁজছিলাম। ভদ্রঘরের মেয়েরা আসে। গান শেখে।

হঠাৎ পাশেই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামে একটি তরুণ, পোশাক-আশাক তার দামীই। মনোহর একটু অবাক হয়, ভদ্রলোকের মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হচ্ছে। আবছা আলোয় থিয়েটার ফেরতা মনোহর দেখে ওর চোখে কিসের লালসা।

—এই যে রাণীদি! ইনি?

ভদ্রমহিলাই রাণীদি। রাণীদি বলে,—খুব ভালো গাইতে পারেন উনি, বুঝলে। ভদ্রলোক জড়িত কণ্ঠে বলে,—রিয়েলি? চলুন আজই শোনা যাক ওঁর গান।

—তার আগে একটা বারে কিছু খেয়ে নোব প্লিজ!

মনোহর অবাক হয়ে যায়। রাণীদি বলে চলেছে। ওই নবাগতের সম্বন্ধে, —শুভু বড় ভালো ছেলে! খুব দরদী ছেলে। চল না রাত তো তেমন হয় নি। তোমায় আবার পৌঁছে দেবে ও।

শুভুর কাব্য জেগে ওঠে মনে,—কি নাইস্ রাত! গঙ্গার ধারে চাঁদের আলোয় বসে তোমার গান শুনবো মাই ডিয়ার!

মনোহর বিপদে পড়েছে। এমনি করে একটা উট্‌কো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে তার এই রূপবদল করে বেরুবার জন্য তা জানতো না। মনে মনে আবার হাসিও আসে এদের হ্যাংলামিপনা দেখে। কলকাতার পথে পথে বিচিত্র জীবই ঘুরছে। সবাইএর মুখোস এক একটা আছে। তারই আড়ালে নিজের স্বরূপটাকে ঢেকে ফেরে ওরা। কিন্তু, মনোহর ওদের আড়ালের রূপটাকে চিনে ফেলেছে। এমনি সব বিচিত্র জীব ঘুরে বেড়ায় তা শুনেছিল সে। চোখে ওদের শ্বাপদ-লালসা। বলে ওঠে মনোহর,—আমার কাজ আছে।

কোনরকমে গিয়ে একটা ট্রামে উঠে পড়ল ওদের এড়িয়ে।

হাসিও আসে, দুঃখও হয় মনে মনে।

রাতের অন্ধকারে দিনের সেই মানুষগুলো এখানে জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। ওদের চোখে শ্বাপদ-লালসা আর নির্লজ্জতা।

পিছনে ওই মাতালটার গর্জন শুনেছিল সে।

—নন্‌সেন্স! ছিনেলীপনা।

মোহিত কারখানার কাজে ডুবে যায়।

মনের অতলের আঘাতটাকে সে ভুলতে চেষ্টা করে, তাই বোধহয় সারাদিন রাত্রি অবধি এই গ্যারেজেই থাকে। কাজের নেশায় মেতে উঠে সবকিছু ভুলতে চায় সে।

এদিক-ওদিক কতকগুলো গাড়ির ইঞ্জিন খোলা হয়েছে, কোনটার ইঞ্জিন বের করতে হবে। কোথায় ডাইনমোগুলো খুলে মেরামত করা হচ্ছে। নানা-রকম কাজ চলছে।

ওপাশে স্প্রে পেন্টিং এর একটানা শব্দ ওঠে।

আকাশে বাতাসে এখানে হাতুড়ি না হয় বোরিং এর শব্দ। বাতাসেও ওঠে রং এর তীব্র গন্ধ।

কেষ্টোও ক'দিন মোহিতের সন্ধান করছিল।

তার নিজেরই স্বার্থ আছে। নিজের সামান্য রোজগার। স্ত্রী-ছেলে-

মেয়েদের ছাড়া ওর এই রোজগারের ওপর পুষতে হয় একটি বোনকে। লক্ষ্মীর' বোঝা-ই তাকে কাবু করেছে। এই কারখানার চাকরিই তার নির্ভর।

চেষ্টা করেছিল কেষ্টো যদি কোনমতে মোহিতকে রাজী করানো যায়! দু'একবার কেষ্টো মোহিতকে তার বাড়িতেও নিয়ে গেছল, কিন্তু কিছু হয় নি।

কেষ্টোও শুনেছিল মোহিতের অন্য কোথাও বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু মোহিত সেখান থেকে বিয়ে না করেই ফিরে এসেছে, তারপর দু'চার দিন দেখেছে কেষ্টো মোহিত কেমন বদলে গেছে, সেই হাসিখুশি ভাবও আর নেই।

মোহিত টিফিন করছে। কাজের চাপে আজ বাড়ি ফিরতে পারেনি; তাছাড়া মনোহরও মাঝে মাঝে কাজের সন্ধানে—না হয় রিহার্সেলে বের হয়। সেও এখানে-ওখানে খেয়ে নেয়। তাই দুপুরের খাওয়াটা মোহিত কারখানাতে বসেই সেরে নেয়। সময়ও বাঁচে তাতে। পাশেই গোবিন্দের চা-খাবারের দোকান। মোহিত কোনরকমে হাত-মুখে সাবান দিয়ে রং-কালি উঠিয়ে ক্যানটিন হলের দিকে যায়। বাইরের দোকান থেকে আনিয়েছে মামলেট আর একটা ছোট রুটি; কেষ্টোকে ঢুকতে দেখে মোহিত জিজ্ঞাসা করে, —খেয়েছিস রে? নে।

ওর দিকে খানিকটা রুটি আর মামলেট এগিয়ে দেয়। জানে মোহিত দুপুরে খাবারও সবদিন জোটে না কেষ্টোর।

কেষ্টো আমতা আমতা করে,—আবার খাবো!

চাও এসে যায়। দু'জনে খাচ্ছে। কেষ্টোই কথাটা পাড়ে,—ক'দিন ধরে তোমার মনটন ভালো নেই দেখছি বড়দা! শরীরটরীর খারাপ নাকি?

মোহিত ওর দিকে চাইল। ওর কাছে যেন ধরা পড়ে গেছে তার মনের সেই চরম পরাজয়ের খবর। কেষ্টোকে ভালোবাসে মোহিত। কেষ্টোও ওকে শ্রদ্ধা করে। ও-ই কেষ্টোকে এখানে কাজ দিয়েছে। মোহিত জবাব দেয়,—এমনিই!

কেষ্টো কথাটা বলতে পারে না। কি করেই বা পাড়ে কথাটা। তাই একটু সুযোগের অপেক্ষায় থাকে; মোহিত বলে চলে,—হোটেলে খেয়েদেয়ে শরীর আর টিঁকছে না।

কেষ্টো বলে,—ওটা তোমার সখ দাদা! নাহলে ভগবানের দয়ায় রোজগার মন্দ করছ না, চাই কি দু'একটা ট্যাক্সির পারমিটও হাতিয়ে নিতে পারো মনে

করলে। মালিক তো তোমার কথায় ওঠে বসে, তুমি যদি ইচ্ছে করে কষ্ট পাও, কে কি করবে বলো ?

আমার বোন বলে বলছি না, মেয়ের অভাব! শুধু বিয়েতে মত করো দিকি! ভালো মেয়ে কত জুটবে তোমার!

হাসে মোহিত,—তোমার ওই এক কথা।

ওপাশ থেকে মালিক সিধু মল্লিকমশায়ের চীৎকার ভেসে আসে। হাঁক-ডাক ছাড়ছেন তিনি,—সব এমনি করে বসে থেকে মারবি আমাকে? সে লাটসাহেব, তোদের পালের গোদা—তিনি কোথায়?

মোহিত উঠে পড়ে, কেষ্টো এক ফাঁকে সরে গিয়ে কাজে মন দেয়। সিদ্ধেশ্বরবাবুকে আসতে দেখে মোহিত বলে,—আপনি আবার গোলমাল করছেন কেন? যাকে যা কাজ দেবার সব পুরো দিইছি, দেখছি কে কি করছে সব ঠিক আছে। ওদের একটু খেতে জিরোতে দিন, তারপর দিনের শেষে এসে আমার কাছে কাজ বুঝে নেবেন। ওরা যা করে করুক, আপনার কাজ হলেই তো হল।

সিধু মল্লিক থেমে গেল। তবু গজ গজ করে।

—এতগুলো গাড়ি খোলা হয়েছে, ওদিকে মাইনর রিপেয়ার আছে। আর আমাদের সব ট্যাক্সি বাস রুটে গেছে?

সিধু মল্লিকের নিজেরই খানদশেক ট্যাক্সি আছে বিভিন্ন নামে। তাছাড়া বাস রুটও আছে। মোহিত জবাব দেয়,—সে সবই বের হয়ে গেছে। কেউ বসে নেই।

সিধু মল্লিক নিশ্চিন্ত হয়।

—যাক, বুঝলে মোহিত টাকা মা লক্ষ্মী, রাস্তায় বের হলেই যদি মা লক্ষ্মী আসে, ঘরে বসে থাকা কি শোভা পায়? বলো, তুমিই বলো? যাক্‌গে, ওই খোলা ইঞ্জিনগুলোর ব্যবস্থা দেখো। বুঝলে, ফোনের উপর ফোন, আমারটা হোল, উনি বলেন আর কদ্দিন মশায়, কেউ বলে গাড়ির কি পার্টস বেচেন মশায়; ঝকমারি! এসব গিরিধারী পার্টির কাজ নেবে না। স্রেফ গাড়ি দেবার সময় ডেট দেবে—তার আগে হবে না। পরেও নয়। সেই ডেটেই ডেলিভারী, টার্মস ক্যাশ।

মোহিত হাসে,—ঠিক আছে। একেবারে সঠিক ডেটেই গাড়ি ডেলিভারি দিই।

—তাইতে পেয়ে বসেছে হে? বেশি রেট করো, দিতে না পারে গাড়ি নাব না। ওসব উট্‌কো কথা কেন শুনবো?

মোহিতের কাজ সবই বেশ গোছানো। এসব দিক থেকে সিধু মল্লিকের গ্যারেজে সুনাম আছে। তাই কাজেরও কমতি নেই। রম রম চলতি ব্যবসা।

সিধু মল্লিক মুখে অবশ্য ওইরকম কথা বলে।

মনে মনে সে জানে মোহিতই তার এই কারখানার প্রাণ। তাকে কথা দিয়ে বিশ্বাস করা যায়।

ওর কথাটাই ভেবেছে ক'দিন থেকে। মাসকাবারে এবার তাই তার পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়াতে দেখে মোহিত একটু অবাক হয়।

—এটা কেমন হল! মানে, মাইনে যা পেতাম, তার থেকে পঁচিশ টাকা বেশী হয়ে গেছে যে মল্লিকমশাই!

সিধু মল্লিক নিজে বসে থেকে মাইনে দেয় ষ্টাফকে। তার মতে এতে নাকি মালিক কর্মচারী সম্বন্ধ ভালো থাকে। মোহিতকে একটু অবাক হতে দেখে বলে সিধু মল্লিক হাসতে হাসতে,—তোর বাড়িভাড়াটা পুরোই দোব পরের মাস থেকে, এমাসে ওইটাই বাড়তি থাক।

মোহিত ক'দিন থেকে কেষ্টোর মাইনে বাড়ার কথাটা বলবো বলবো করছিল। আজ বলে,—কেষ্টো, ওই পেন্টিং সেকসনের কেষ্টোর বরং কিছু বাড়িয়ে দিলে ভাল হত। একার রোজগার, ঘরে এতগুলো পুষ্যি। তাহাড়া ও কাজের লোক।

কি ভেবে মল্লিকমশাই অবাক হয়,—যা বাব্বা, ওরে মোহিত তুই-ই বরং এইবার নিজে একটা বিয়ে কর, নইলে তোর পয়সা পাঁচ ভূতেই লুটে-পুটে খাবে। ওকে দিই কোত্থেকে?

মোহিত বলে—আমার টাকাই ওকে দিন।

মল্লিকমশাই ওকে চটাতে চায় না। বলে,—তুই নে, ওকেও দিচ্ছি পনেরো টাকা। তুই বলছিস যখন। বুঝলি, ও ব্যাটা কাজের লোকই নয়। ফাঁকিবাজ।

কেষ্টো শোনে ব্যাপারটা। মনে মনে খুশিই হয়। মোহিতকে যদি মত করাতে পারে তারই সব দিক থেকে সুরাহা হবে। সেই স্বপ্ন দেখে কেষ্টো।

মনোহর কলকাতার তাজ্জব রূপ দেখে ক্রমশঃ মুগ্ধ হয়েছে। জীবনে এসব অভিজ্ঞতা তার ছিল না।

সেই রাত্রের ঘটনাটা তার মনে রেখাপাত করেছে। বেশ বুঝেছিল সেই

মহিলার মতলব ! আসলে ও আড়কাঠি। অর্থাৎ মেয়েদের নিয়ে ব্যবসাও চলে এখানে রাতের অন্ধকারে।

মনে মাঝে মাঝে দুষ্টবুদ্ধিও জোটে : যদি সুযোগ মেলে সেই-ই বা কেন রোজগার করে নেবে না, সে—যেভাবেই হোক।

কতদিন আর গলগ্রহ হয়ে থাকবে মোহিতের।

থিয়েটারের গান দু'একটা তুলছে সেদিন বাড়িতে। একটু পরেই থিয়েটা যাবে, কোন সখের দলের নাটক হচ্ছে। বাড়ি থেকেই সে মেকআপ কা যায়, বাজারে রটে গেছে কোন ভদ্রঘরের মেয়েই নামে নাটকে। অভিন করে অপূর্ব, গানও ভাল গাইতে পারে। এ নিয়ে অনেক আলোচনাও হয়েছে কিন্তু মনোহর তবু নিজের পরিচয় বিশেষ কাউকে দেয় নি। নিজেকে কেম অপরিচিতের মধ্যে সরিয়ে রেখেছে। সখের দলে অভিনয় করতে যায় সেখানেও দু'দশজন বাবু আছেন, তারা পরিচয় করতে চায়, ঘনিষ্ঠ হতে চা তার সঙ্গে; কিন্তু নারীবেশী মনোহর তাদের এড়িয়ে যায়, তবে তার না পরিচয় সে কাউকে জানাতে চায় না। সেই কারণেই বোধহয় তাকে নি আলোচনাও হয় বেশী।

তাই মেকআপ করে তৈরী থাকে, একেবারে গাড়ি আনে ওরা। সে ে করে আবার চলে আসে।

মেকআপেই সময় চলে যায়, ইদানীং মনোহর একেবারে আধুনি মেয়েদের মতই মেকআপ করে। তেমনি খরচা করে চুলও তৈরী করিয়েছে।

গানটা তুলছে, হঠাৎ কড়া নড়ে ওঠে।

দরজা খুলতেই দেখে মনোহর স্বয়ং সিধু মল্লিক, ওর দিকে গদগদ চো চেয়ে আছে। নারীবেশী মনোহর অভ্যাসবশতঃ গায়ের কাপড়টা টেনে নি বলে একটু অপ্রতিভ কণ্ঠে,—দাদাতো বাড়ি নেই এখন।

মল্লিকমশাই এখন অন্য লোক। দিল-দরদী মানুষ। নিজেই একটা চেয়া টেনে ওকথা কানে না তুলেই এদিক-ওদিক দেখে বলে ওঠে,—মোহিতটা রুচিজ্ঞান নেই বুঝলে, সোফা সেট একটা নাহলে চলে ? কালই একটা ছো সেট পাঠিয়ে দেবো। তা গান বন্ধ করলে কেন ? গাও। গান আমার খু ভালো লাগে বুঝলে মনু। তাই বলছিলাম, শুভা, আমার নাতনীকে, শুন গান কাকে বলে ! একেবারে খাসা গান—

মনোহর বুড়োর দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে হাসে সে। গান গে

চলেছে। গলাটা তার ভালোই, আর ওই নিখুঁত মেকআপে মানিয়েছেও চমৎকার।

বুড়ো তন্ময় হয়ে মাথা নাড়ে ওর গানে।

মোহিত বাড়ি ঢুকছে। দরজাটা খুলে থমকে দাঁড়াল। দেখে মল্লিকমশাই মাথা নাড়ছে। ওকে দেখে মনোহরের গান থামে। মল্লিকমশাই গদগদ কণ্ঠে বলে,—এ গান অনেকদিন শুনিনি! আহা—

মোহিতকে দেখে একটু সামলে নেয় মল্লিকমশাই। বলে একটু বিচিত্র স্বরে,—তাই বলছিলাম মোহিত, তুই আর অমত করিস না। কথাটা তোকে ক'দিন ধরেই বলবো ভাবছিলাম। তা আজ স্বকর্ণে ওই গান শুনে দেখলাম হিসেবে ভুল সিধু মল্লিক করে না। বল তুই?

মোহিতও তা জানে, তাই মাথা নাড়ে সে।

মল্লিকমশাই এইবার কথাটা পাড়ে।—তাই ঠিক করেছি, তুইও বলে দে, তোর বোন আমার ওই নাতনীকে গান শেখানোর ভার নিক। আমি নিশ্চিন্ত হই। ওই সব পুরুষ মানুষ গানের ব্যাপারে রাখতে আমি চাই না। তাতে ফল খারাপই হয়।

মোহিত আমতা আমতা করে। মনোহর বলে,—আমার সময় কই?

সিধু মল্লিক বলেন,—সপ্তাহে দু'দিন যাবে মনু। মাসে ধর পঞ্চাশ টাকাই দোব। আমার গাড়ি এসে নিয়ে যাবে, আবার পৌঁছে দিয়ে যাবে।

আর বেশীক্ষণ থাকলে যদি মেয়েটা আবার কোন বায়নাক্কা তোলে তাই যেন মল্লিকমশাই উঠে পড়ল। যাবার সময়েও বলে যায়,—ওই কথাই রইল। চলি মোহিত! দু'টো পার্টির সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে। চলি মনু। ওই সন্দেশগুলো রইল, খেয়ো কিন্তু! থাস্‌রে মোহিত।

মল্লিকমশাই দু'বাক্স সন্দেশ আর কিছু ফুলও এনেছিল মনুর জন্যে। ও বের হয়ে যেতেই মোহিত হাসতে থাকে। মনোহর বলে,—তুমি তো হাসছো, এইবার আমার অবস্থা বোঝ।

—বেশ তো জমেছে। ঝুলে পড়।

—যদি ধরা পড়ি? মেয়েছেলের চোখ তো জানো না? এসব ঝামেলায় আমি নেই।

মোহিতই বাধা দেয়,—কেন ধরা পড়বি! অবশ্য যদি ধরা না দিস। আর বুড়োর অনেক টাকা। চিরকাল চুরি ব্ল্যাকমার্কেট করেছে, কিছু ভার তবু

কমুক। বহুরূপী সেজে পথে পথে না ঘুরে তবু একটা হিল্লে করে নে না। হাসে মনোহর,—ওতে আমার দরকার নেই দাদা, পারো তবে তুমিই একটা ট্যাক্সি করে নাও। লাবণ্যদিকেও চিঠি দিই। দেখ ভেবে-চিন্তে। গাড়িখানা এই ধমকে করে নাও বুড়োর মাথায় হাত বুলিয়ে।

লাবণ্যের নাম শুনে চটে ওঠে মোহিত। জবাব দেয় সে,—ওসব নাম মুখে আনিস না। যত্তোসব ঠক্‌বাজ! যেমন বাবা তেমন মা।

মনোহর চুপ করে থাকে। মোহিত লাবণ্যকে ভুল বুঝেছে। সে বলবার চেষ্টা করে,—লাবুদির কোন দোষ নেই। সে তোমাকে ঠিক কথাই বলতে চেয়েছিল। শোননি তুমিই। হাজার হোক মেয়েছেলে! তাকে তো সব দিক দেখে ভেবে চলতে হয়। হুট করে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে তার বাধা ছিল, তাই প্রতিবাদ করতে পারেনি। কিন্তু তোমাকে সে ভালোবাসে—

মোহিতের রাগ তবু যায় না। তার কাছে ওসব যুক্তির কোন দাম নেই। বলে মোহিত,—ভালোবাসা! সবাই সাধু, দোষী কেবল আমি। নয়? বাজে বকিস না মনোহর! দুনিয়ার উপরই ধিক্‌কার এসে গেছে। যে যাকে পারিস ঠকা। মুখ বুজে খেটে পয়সা তুলছি ওই মল্লিকের ঘরে, তিনকুলে যার খাবার কেউ নেই, আমরা কি পাই? কতটুকু পাই?

গাড়ির শব্দ শোনা যায়। মনোহর বলে ওঠে,—আমি আসি দাদা। ভালো হয়েছে যাহোক, চিরকালই কি এই সেজে সেজেই দিন কাটবে? সাজতে সাজতে আমি যে একটা মানুষ তা ভুলেই যাবো একদিন। কি ঝকমারির জীবন তা তুমি বুঝবে না।

মনোহর বের হয়ে যায়।

চুপ করে কি ভাবছে। লাবণ্যের কথাটা মনে পড়তে মনের ভেতর জ্বালা করে ওঠে মোহিতের। একটা আঘাতকে সে ভুলতে চায়।

সময়টা বিশ্রী কাটে। কাজে যতক্ষণ ডুবে থাকে ভালোই থাকে। তার অবসর সময় আর কাটতে চায় না। নানা চিন্তা-ভাবনা মনে ভিড় করে।

কেষ্টোকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইল। কেষ্টো আজ মোহিতকে নিতে এসেছে। তার হঠাৎ মাইনে বাড়াটাই একটা উপলক্ষ্য। মোহিতের কথাতে বেড়েছে। কেষ্টো তাই বলতে এসেছে,—আজ বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজো আছে। তোমার বৌমা বারবার করে বললে দাদাকে নিয়ে এসো। আজ যেতেই হবে দাদা। আর তোমার বোন—কই তাকে দেখছি না?

—সে নেই, মানে ইস্কুলে গেছে। কলেজে।

—তুমিই চল তা'লে। বেশী দেরী হবে না।

মোহিতের সন্ধ্যাটা বিশ্রী কাটে। তাই যেন যেতে রাজী হয় সে।

উল্টোডাঙ্গার খাল ধারে ছোট একটা বাড়ি; না বস্তি না কোঠা। মাট-কোঠা গোছের, সেইখানেই বাসা বেঁধেছে কেষ্টো। এই তার আশ্রয়।

খালের দিকটা নির্জন, দু'চারটে শিরীষ গাছ কালোছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে। কেষ্টো আজ ঘটা করেই সত্যনারায়ণ পূজো করাচ্ছে বাড়িতে।

রাস্তায় ঠেলা, খড় বোঝাই কাঠ বোঝাই লরীর ভিড়। খালের বুকে সামান্য একটু জল, তাতে দাঁড়িয়ে আছে দু'চারখানা ছোট বড় নৌকা। কলকাতার মধ্যে, অথচ ধুলো আর ধোঁয়ায় ভরা বদ্ধ এই পরিবেশ।

এক একটা লরী যায়, রাতের সামান্য আলোটুকুও এই ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে। ওরা দু'জনে এগিয়ে যায়। মোহিত আর কেষ্টো।

ওকে অভ্যর্থনা করে ওর বোন লক্ষ্মী। অভিমানভরা স্বরে বলে সে,—তবু এলে যা হোক, মস্ত লোকের পায়ের ধুলো কি গরীবের বাড়িতে পড়ে? মহা ভাগ্যি যাহোক!

মোহিত লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে থাকে। সারা দেহে ওর যৌবনের উদ্দাম লাস্য। নিটোল স্বাস্থ্য। হাসিটুকুও সুন্দর।

দু'চোখে সেই লাস্যের ঝিলিক। আব্ছা আলোয় ওকে আজ বিচিত্র দেখায়। মোহিতের জ্বালা-ধরা মন ক্ষণিকের জন্য উছলে ওঠে। জবাব দেয় সে,—না, না! আসতে সময়ই পাই না।

লক্ষ্মীর কণ্ঠে পরিহাসের সুর।

—বৌদি বোধহয় নিষেধ করে?

হাসতে থাকে মোহিত। লক্ষ্মী ওর বিয়ের কথাটা আব্ছা শুনেছিল মাত্র। মোহিত শোনায়,—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। বিয়ে আর হল কই? কেই-ই বা এমন একটা হতচ্ছাড়াকে বিয়ে করবে বলো?

—মানে! লক্ষ্মী অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। এতদিন একটা ভুল ধারণাই তার মনে বাসা বেঁধেছিল। মোহিতের কণ্ঠস্বরে বেদনাটা তার মনে লাগে। চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে লক্ষ্মী। মোহিত যেন বদলায় নি!

তার মনে নীরব সুরের রেশ লাগে। হারানো সুর। অসহায় লোকটার জন্য মায়াই হয়। মমতা জাগে লক্ষ্মীর মনে।

রাত্রি হয়ে আসে, লক্ষ্মীই তাকে নিজে আসন করে প্রসাদ, লুচি এনে দেয়। মোহিত অবাক হয়। এতো সব কি হবে? তোলো, এসব ওঠাও তো!

লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বরে সমবেদনার সুর,—রাতে কোথায় আবার হাঙ্গামা করবে—খেয়ে নাও। বেশী আর কি দিইছি? ওতো সামান্যই।

কেষ্টোও সায় দেয়। লক্ষ্মী নিজেই ওসব করেছে দাদা। আর একটু কপির ডালনা দিক?

বাধা দেয় মোহিত, না, না আর লাগবে না।

লক্ষ্মী নিজে বসে থেকে এটা সেটা এগিয়ে দেয় পাতের দিকে,—পায়সটা খাও।

মোহিত ক্ষণিকের জন্য অনুভব করে কোথায় যেন এতটুকু শান্তি আছে। লাবণ্যের কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে যেন একটা বেদনা, সেই বেদনাকে ভোলবার চেষ্টা করেছে সে এতদিন। পারেনি। লক্ষ্মী ওর দিকে চেয়ে বলে,—কি ভাবছ? খাও।

—কিছুনা। এইতো খাচ্ছি।

মোহিত আবার এই পরিবেশে ফিরে আসে। লক্ষ্মীর কাছে ওর মনের এই ভাবনাটা লুকোতে পারে নি।

রাত্রির আঁধার নেমেছে খালের বুকে শিরীষ গাছের মাথায়। ছু'একটা নৌকা খালের জলে ভাসছে। তার থেকে কোন মাঝির দেহাতী গানের টুকরো ভেসে আসে।

লক্ষ্মী তাকে এগিয়ে দিতে এসেছে রাস্তার এদিকে। তারা-জ্বলা আকাশে একটা কেমন স্বপ্ন জাগে। মোহিতের জ্বালা-ভরা মন আজ শান্তির স্পর্শ পায়।

—চলি! রাত হয়ে গেছে।

লক্ষ্মী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মোহিত এগিয়ে আসে। পথে তখন স্তব্ধতা নেমেছে। ছু'একটা আলো জ্বলছে দূরে দূরে।

মোহিত বার বারই একটা স্বপ্ন দেখছিল। একটি নীড় বাঁধবে সে। রোজগার ভালোই করে, আরও কিছু রোজগার করতে হবে তাকে। এভাবে একা থাকা যায় না।

একটা ট্যাক্সি করতে পারলে নিজে ও চালাবে। কারখানায় অনেক মালিক ট্যাক্সি নিয়ে আসে, তাদের সঙ্গেও পরিচয় আছে মোহিতের। দেখেছে

একখানা থেকে অনেকেই দু'তিনখানা গাড়ি কিনেছে কিস্তিতে দু'চার বছরের মধ্যে।

বেশ ফলাও কারবার সুরু করেছে তারা ধীরে ধীরে।

হাজার হোক পরের চাকরি, তার থেকে অনেক বেশী রোজগার করবে সে একখানা ট্যাক্সি করতে পারলে।

লাবণ্যও আসতো তার ঘরে, আসে নি এই জন্যই। লোকে তাকে জানে মোহিত-মিস্ত্রী বলে। গাড়িওয়ালা সে নয়। তাই মধু মুহুরী প্রকারান্তরে তাকে এড়িয়ে গেছে।

একটা ছোট বাড়ি হবে কলকাতার কাছেই কোথাও। গাড়ি চালাতে পারলে সবই হবে, ঘর-ঘরণী।

মনটা আজ মোহিতের কেমন সতেজ হয়ে ওঠে। বারবার মনে পড়ে লক্ষ্মীর সেই ডাগর দু'চোখের চাহনি। নিটোল স্বাস্থ্যসুন্দর সেই হাসিটুকু মনে পড়ে।

আবার নোতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে সে।

রাত হয়ে গেছে। মনোহর থিয়েটার সেরে ফিরে কাপড়-চোপড় বদলে ওপাশের একটা পাঞ্জাবীর হোটেল থেকে রুটি আর তড়কা এনেছে। কোন কোনদিন আনে মাংস না হয় সব্জী।

একবেলা নিজেই রান্না করে মনোহর। সন্ধ্যাবেলা কাজ থাকলে রান্না করা হয়ে ওঠে না। মোহিত ফিরলে কোন কোনদিন সে করে, না হয় দোকান থেকে রুটি তরকারী কিনে এনে চালিয়ে নেয়।

আজ মনোহর বাড়ি ফিরে মোহিতকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয়। রান্নাও হয়নি। কে জানে কোন কাজে বের হয়েছে। না হয় কারখানায় ওভারটাইম করছে।

এত রাত করে সাধারণতঃ ফেরে না সে। ঘরে ঢুকে মোহিতই জিজ্ঞাসা করে,—খাস্‌নি!

—তোমার জন্যে বসেছিলাম। যাও হাত পা ধুয়ে এসো।

মনোহর ওকে নির্দেশ দেয়।

মোহিত পান চিবুতে চিবুতে বলে,—আজ আর খাবো না। বুঝলি, খুব খাওয়ালে ওই কেষ্টো, আমাদের কারখানার রং মিস্ত্রী। ওর বোনটা বেশ রাঁধে বুঝলি, তোর মত এমন আলুনো পানসে রান্না নয়, ফাস্‌ক্লাস্।

একটু অবাক হয় মনোহর, জবাব দেয় ওর কথায়,—তা ভালো তো রাঁধবেই। আমার রান্না না খেলেই পারো। কে বলেছে বাপু খেতে।

হাসে মোহিত,—অমনি রাগ হল বাবুর। নে তুই খেয়ে নে। বুঝলি, রাঁধতো আমার মা।

মনোহর খাচ্ছে আর মোহিতের দিকে চেয়ে থাকে। মোহিতের চোখের সামনে অতীতের সেই হারানো দিনগুলোর ছবি ভেসে ওঠে। ও যেন বদলে গেছে।

—বুঝলি, আমার মা পরতো লাল পাড় শাড়ি। বাবাও তো খুব গরীব ছিল। সামান্য রোজগার করতো। মা রাঁধতো থোড় মোচা না হয় লাউয়ের তরকারি আর লাল চালের ভাত। তাই যেন অমৃত লাগতো। খুব ভালোবাসতো আমাকে। নবান্নের দিনে, নোতুন চালের ভাত, পরমান্ন, ভাজাভুজি—

মনোহর বলে উঠে,—থেমোনা দাদা, বলে যাও, তোমার কথাতেই আমার এই চিমসে রুটি আর ডাল যেন সেই নবান্নের পরমান্নের মত মিষ্টি ঠেকেছে। আমার ওসব বালাই ছিল না, বুঝলে ?

মাকে চোখেই দেখি নি। ছেলেবেলায় জ্ঞান হলো, দেখলাম বিকট একটা দশাসই লাশ, আমার পিতৃদেব।

সাকিন তার যত্রতত্র, পেশা এই বহুরূপীগিরি, আজ রাজা কাল ফকির, পরশু মা কালী, কোনদিন পুতনা রাক্ষসী, কোনদিন বা ছিন্নমস্তা, আবার নাহয় ফিরিওয়ালা। সাজবদল করতে জানতো লোকটা, মাকে তো মনেই পড়ে না। আর ছেলেবেলায় দেখেছি বাবাকে এই নানা সাজে। তাই একটা বিশেষ রূপে তাকে বেশীদিন দেখিনি, দেখতে পাই নি। ও ছাড়াও সে ছিল পাক্কা মাতাল, সে আরও বিচিত্র রূপ। সেই বহুরূপের ভিড়ে কোনটা আমার বাবার প্রকৃত রূপ তা খুঁজে পাইনি। সব স্মৃতিতেই ঝাপসা !

—তুমি তো দাদা তবু মাকে দেখেছিলে, চিনেছো। আর আমি? মাকে দেখিনি—বাবাকেও চিনতে পারিনি। একেবারে লায়েক হয়ে সেই রূপ ফিরি করেই পেট চালাচ্ছি এখন এই কলকাতারই পথে পথে।

হাসে মোহিত। প্রাণখোলা হাসি।—বেশ তো নীতিকথার তত্ত্ব আওড়াচ্ছিস রে। দেখ, জীবন সম্বন্ধে নিজের সম্বন্ধে মানুষ যেদিন বুঝতে পারে, সেই সব কথা ভাবে, সেদিন সে বেটার সমূহ বিপদ হয়।

—কেন ? মনোহর প্রশ্ন করে।

—ঘাবড়ে-টাবড়ে গিয়ে একটা যা হোক কিছু করে বসে। নিদেন প্রেম-করে।

হাসতে থাকে মনোহর।—খেপেছো দাদা! কোথায় থাকবো কি খাবো ঠিক নেই। হোটেলমে খানা, মস্‌জিদমে শোনা, তার আবার এসব। চেয়ে তুমিই বরং দাদা একটা হিল্লে ধরো আমি না হয় সব ব্যবস্থা করে।

মোহিতের মনে সেই স্বপ্নটা জেগে ওঠে। একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে দিকে ব্যাকুল চাহনি মেলে চেয়ে আছে।

মনোহরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাবণ্যের সেই কান্নাভরা দু'চোখ। মোহিত আর লাবণ্য সুখী হবে।

একদিন হয়তো তার মুখে আবার হাসি ফুটবে।

আজ ওবেলায় সেই চটে ওঠার পর আর তার কথা বলে না মনোহর। লাবণ্যের খবরাখবর সে নেয় এখনও। অনেক কষ্টেই আছে লাবণ্য সেখানে, বাবার সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বাঁধে। অনেক কথাই জানিয়েছে সে চিঠিতে।

এক একসময় মনে হয় নিজের হাতেই প্রাণ হত্যা করবে সে। কিন্তু পারে না মায়ের জন্য আর একজনের জন্য। সে ওই মোহিত। লাবণ্য তার পথ চেয়েই বসে আছে।

এখনও লাবণ্যের মনের কোণে আশা জাগে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। সে আর মোহিত ঘর বাঁধবে। সেইদিনের আশাতেই বুক বেঁধে আছে সে। সেই কথাটাই জানায় লাবণ্য মনোহরকে তার চিঠিতে। মনোহর সেই সব চিঠির কথা বলেনি কোনদিন। ভেবেছে মোহিতের কাছেই আছে, ওর রোজগার-পাতি বাড়ুক, নিজেও স্বাবলম্বী হোক। সেদিন মোহিতকে চাপ দিতে পারবে, লাবণ্যদিকে সে নিজে নিয়ে আসবে মোহিতের ঘরে। মোহিত-দাকে ঘর বাঁধতে বাধ্য করবে সে। তারই চেষ্টা করে চলেছে মনোহর।

—কি ভাবছিস রে ? মোহিত প্রশ্ন করে।

মনোহর রুটি চিবুতে থাকে।

কিছু টাকার দরকার। লাবুদিকে কিছু টাকা দিতে পারলে খুশী হতো। তার হাতে যা আসে তার থেকেই কিছু পাঠায় মাসে মাসে।

তা সামান্যই। মোহিতকেও জানাতে চায়নি কথাটা।

এক একসময় ভাবে যদি ওই সিধু মল্লিকের ট্যুইশানিটা নেয় ভালোই হবে তবু থোক টাকা কিছু আসবে মনোহরের হাতে।

মনে মনে ভরসা পায়, যেভাবে হোক একটা পথ তাকে বের করতেই হবে। মোহিতের কথায় বলে,—তোমার ঘটকালির কথা ভাবছি। নানা সাজেতো সাজলাম, ওটাই বা বাদ থাকে কেন? ওটাই সাজি এবার।

মোহিত হাসতে থাকে।—যে আমার বিয়ে তার আবার হু'পায়ে আলতা! নে উঠে পড়। ওই যে বলছিলাম সুখ-শান্তি সব আমাদের হারিয়ে গেছে রে। নইলে বাপ্ মা আপনজন সব হারিয়ে ত্রিসংসারে স্বয়ম্ভু হয়ে বসে আছি!

মনোহর জবাব দেয়,—তাই ভাবনা নেই দাদা। নো পিছু টান। জুটলো খেলাম, না পেলাম ব্যস কলের জলই সই। ফুটপাথ শয্যা আর আকাশ চাঁদোয়া, অমন সুখ ভগবানও কেড়ে নিতে পারবে না দাদা। খারাপটা কি আছি?

মোহিত আজ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।—এভাবে চলে না রে। দিন বদলাতেই হবে। চিরকালই কি মিস্ত্রীগিরি করবো?

হাসে মনোহর।—নিশ্চয়ই না? বহুরূপীগিরি বন্ধ হবে কেন? রূপবদল হবেই। তোমারও। আজ মিস্ত্রী কাল গাড়ির মালিক, আজ ভাড়াটে কাল বাড়িওয়ালা, আজ ফকির কাল আমীর।

—আর তুই?

—আমি সেই বহুরূপীই থেকে যাবো দাদা। মানুষ একটা চীজ, তুমি যদি এদের দলের বাইরে থাকো বহুৎ মজা দেখতে পাবে। সবাই কেবল রকমারি ভঙ্গীতে নাচছে, কসরৎ করছে, এ ওকে ঠকাবার চেষ্টা করছে, এ ওর বুকে ছুরি তুলছে। নানা মজা চোখে পড়বে। তুমি এদের থেকে ফারাকে থেকে সেই মজা দেখবে আর রূপবদলের ভেক নিয়ে দুনিয়ার পথে পথে ঘুরবে। দলে ভিড়বে না। ব্যস! ব্যোম হয়ে থাকবে দুনিয়ার এই বত্রিশ মজার হাটে। নো ভাবনা চিন্তে। শুধু মজাই দেখে যাবে। আর যদি একবার দলে ভিড়ে যাও, তুমিও তখন ওদের সঙ্গে মিশে একেবারে বখাটে হয়ে যাবে, বুঝলে? এসব মজা তখন তুমিই করবে। নাক দম হয়ে আসবে। দেখে আর মজা পাবে না তখন।

—তুই কি তাই দেখছিস?

মোহিতের কথায় মনোহর হাসতে হাসতে জবাব দেয়,—দেখবো না?

একটা বিড়ি দাও দিকি দাদা। ওরে বাব্বাঃ এ যে বিভ্রাট! ক্যাপিস্‌টেন! নাম্বার টেন নয় ক্যাপস্‌টেন! ব্যাপার কি দাদা?

মনোহর ওর দিকে চেয়ে থাকে। এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। দেখে আজ মোহিত পরেছে আদ্দির পাঞ্জাবী, তাতে সেণ্টের গন্ধ, পকেটে দামী সিগারেট। কৌতুহলী কণ্ঠে জেরা করে,—কোথায় গিইছিলে দাদা! কেমন কেমন ঠেকছে ব্যাপারটা। কি গো হেঁচে কেশে বল দিকিন!

মোহিত শুয়ে পড়েছে। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জবাব দেয় মনোহরের রসিকতায়,—ঘুমো দিকি! আর জ্বালাস নে।

সিধু মল্লিকের পয়সা অঢেল, কিন্তু মনে শান্তি নেই। একমাত্র নাতনী শুভাই তার ভরসা। কিন্তু তার উপরও কোন ভরসা করতে পারে না মল্লিকমশাই। কেমন আলাদা ধাতের ওই শুভা।

বেজায় খেয়ালী মেয়ে। মেয়ে তো নয় যেন ছেলেই। যেমনি ডাকাবুকো আর তেমনি বেপরোয়া। কোন বিধি-নিষেধ মানার মেয়ে সে নয়।

বিরাট বাড়ির একটা মহলে শুভা থাকে। ঝি-চাকরের সংসার। সিধু মল্লিক কিছুদিন থেকে শুভাকে দেখছে, কেমন যেন বিচিত্র হয়ে উঠছে সে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

বিয়ের কথাবার্তাও এসেছে দু'এক জায়গা থেকে, কিন্তু বিয়ের নাম শুনলেই চটে ওঠে শুভা।

সেদিন সিধু মল্লিক দত্তবাগানের শীলদের ওখানে একটি পাত্র দেখে এসেছে। তারাও বনেদী ঘর। তবে মেয়ে একটু আধুনিক হওয়া দরকার। আধুনিক বটে শুভা, তবে নাচ গান জানা চাই!

শীলদের বাড়িতে এখন আধুনিকতার ঢেউ ঢুকেছে। ফলাও ব্যবসা, কারখানা—অফিসও রয়েছে। এবাড়িকে ঘিরে এখন একালের সভ্যতার ঢেউ। এবাড়ির বড় বৌ লেখাপড়া জানা, গান জানা মেয়ে। মেজ ছেলেরও সখ তার স্ত্রীও তেমনি হবে, এমনকি রূপে-গুণে এবাড়ির বড়বৌকেও টেক্কা দেবে। মল্লিকমশাইয়ের ছেলেটিকে পছন্দ হয়েছে। ওদের মেয়ে পছন্দ করার জন্য গানটান একটু শেখানোর দরকার। তাহলে শুভ কাজ হয়ে যাবে। মল্লিকমশাই তার ব্যবস্থাও করেছে।

এ সেই খবরটাই বাড়ি এসে শুভাকে দিতে শুভা চটে ওঠে। চটলে ওকে আরও সুন্দর দেখায়।

ফর্সা টকটকে রং, বয়সও তেমন কিছু নয়। শুভা বাড়িতে প্রায়ই স্ল্যাক আর সার্ট পরে। আদরেই মানুষ করেছে তাকে মল্লিকমশাই। শুভা জানায়,—তুমি যদি স্রেফ বিয়ে বিয়ে করো তাহলে কিন্তু ভালো হবে না দাদু!

মল্লিকমশাই বলেন,—তবে কি করবি? তুই বিয়ে থা করবি না?

—গান বাজনা শিখবো, পড়াশোনা করবো। মেয়ে হলেই বিয়ে করতে হবে নাকি?

মল্লিকমশাই হাসতে থাকে,—আজকাল ওসব নাকি উঠে গেছে? গুরুদেবও ওকথা বলেন। বুঝলি, মানে আধুনিক যুগ—

গুরুদেবের নামে চটে ওঠে শুভা।

মল্লিকমশাইয়ের কুলগুরু তারকানন্দ স্বামী কালীভক্ত লোক। কালীসাধক। বিরাট চেহারা, ইয়া মুখখানা, কানের লোমগুলো পেঁয়াজ কলির মত কানের ছিদ্রটুকু বুজিয়ে দিয়েছে। বিকট দর্শন একটা লোক। শুভার মোটেই ভালো লাগে না তাকে।

তারকানন্দও মল্লিকমশাইয়ের কাছে অনেক কিছু আশা করে, অঢেল সম্পত্তি ওর, তার কিছুটা হাতাবে নিজে। তাই বোধহয় দলবল সমেত মাঝে মাঝে এবাড়ির একটা মহলে এসে আস্তানা গাড়ে। বিকট স্বরে পাখোয়াজ আর খঞ্জনী বাজিয়ে কালী-কীর্তন গায় আর মদ গাঁজার শ্রাদ্ধ করে ওই তারকানন্দ স্বামী।

শুভার বিশ্রী লাগে। শুভা ওই ভয়ানক জীবটাকে সহ্য করতে পারে না। দু'চোখ ভাঁটার মত জ্বলছে। লোকটার কথা শুনে শুভার রাগ হয়।

ওর কথা শুনে জবাব দেয় শুভা বেশ কঠিন স্বরে,—তোমার গুরুদেব তাহলে গোটাকতক জুটিয়েছেন কেন? তাঁর তো শুনেছি অনেক ক'টি বিয়ে! ভণ্ড!

—এ্যাও! সিধু মল্লিক গুরুনিন্দা শুনে কানে আঙুল দেয়। এসব শোনাও তার মহাপাপ। গুরুদেবকে সে দেবতার মত ভক্তি করে। তার ইহকাল পরকালের দেবতা। তার সম্বন্ধে এসব কথা সে ওই শুভার কাছে শুনবে এটা আশা করেনি। তাই গর্জে ওঠেন মল্লিকমশাই,—মুখ সামলে কথা কইবি শুভা। তিনি সাক্ষাৎ দেবতা। মহাপুরুষ। তার নামে যা তা বলা পাপ। ওরে, করুণাময় তিনি।

শুভা বলে হালকা স্বরে,—তাহলে তোমার গুরুদেবকেই না হয় মালা দিই! কি বল? তিনি খুশী হবেন।

—ছ্যাঃ ছ্যাঃ। তারা ব্রহ্মাময়ী মা মাগো!

সিধু মল্লিক ম্যা ম্যা করতে থাকে রামছাগলের মত, আর মিষ্টি হাসিতে শুভা খিলখিলিয়ে ফেটে পড়ে।

সিধু মল্লিক নাতনীকে উপদেশ দেন,—যাক্‌গে, ওসব কথা বলিস না—শোনাও পাপ!

শুভা বলে,—তোমার গুরুদেবের কিন্তু ষোল আনা লোভ তোমার বিষয়ের ওপর, যেন তেন প্রকারেণ আমাকে এবাড়ি থেকে সে হটাতে চায়। তাই বিয়ে বিয়ে করে ক্ষেপে উঠেছো তুমি। বলো, চেনা নেই, জানা নেই একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে করি কি করে?

—এ্যাঁ! তরে কি লভ টব করবি নাকি?

হাসছে শুভা। সিধু মল্লিকের মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। গর্জন করে সে ওসব কথা ভেবে,—খবরদার! ওসব যদি কোনদিন শুনেছি, ওই লভ টভের ব্যাপার, টাইট করে দোব আমি। সমাজের বুকে বসে এসব অসঙ্গত অশোভন ব্যাপার—ছিঃ, ছিঃ! এই করেই বাঙালী জাতটা রসাতলে গেল!

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল মল্লিকমশাইয়ের, বলেন,—শোন, গানের দিদিমণি আসবে ওবেলায়!

হাসে শুভা, দাদুকে শোনায়,—দিদিমণি! নাঃ গান শেখা আর হল না!

—কেন? মল্লিকমশাই কঠিন কণ্ঠে জেরা করে।

শুভা বলে,—একজন বেশ আধুনিক সুন্দর তরুণ হবে। গান গাইবে মিষ্টি গলায়, তা নয় সেই হুমদোমুখো দিদিমণি আসবে। ভাল লাগে না বাপু ওসব বিটকেলী।

সিধু মল্লিক গজবাতে থাকে নাতনীর কথায়। এসব তার ভালো লাগে না। শুভার কথাবার্তাও যেমনি বাঁকা, ওর স্বভাবটাও। জবাব দেয় মল্লিক-মশাই,—তা কেন ভালো লাগবে! সব ব্যাড্ সাইন, খুব খারাপ লক্ষণ কিন্তু! ছাখ গুরুদেব বলেন মানুষের চরিত্রই সব থেকে বড় সম্পদ। সোনার চেয়েও দামী। ওইটিই মানুষের মেরুদণ্ড। আজ বাঙালী জাতের এই অধঃপতনের কারণ কি?

শুভা কথাটা শুনছে। জিজ্ঞাসা করে,—তোমার গুরুদেব এ বিষয়ে কি বলেন?

মুরুব্বীআনার চালে বলেন মল্লিকমশাই,—তিনি ত্রিকালদর্শী পুরুষ। তিনি বলেন ওই নৈতিক চরিত্রে ধর্মভাব আর কর্তব্যনিষ্ঠার অভাবই এই দুঃখের মূল। সবার উপরে চাই চরিত্র, সংযম। ওই দু'টোর প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

জবাব দেয় শুভা,—তোমার গুরুদেবের ওইটিই নেই, তাইতো তিনি সন্ন্যাসী! মহাপুরুষ-মুক্তপুরুষ। বুঝলে?

—এ্যাও! সাট্ আপ। সাফ কথা বলে দিচ্ছি শুভা, ও নিয়ে কোন কথা তুই বলবি না। আমি লোক চিনি। আমার গুরুদেব এবাড়িতে যখন ইচ্ছা আসবেন—যদ্দিন ইচ্ছা থাকবেন—

শুভা যোগান দেয় ওর কথার পৃষ্ঠে,—যা ইচ্ছে করবেন, যা মুখে আসে বলবেন—যা তা খাবেন—আমি কিচ্ছু বলতে পারবো না, এই তো!

—হ্যাঁ। তাই!

শুভা চটে বলে,—এইবার তুমি একটা বিয়ে করো দাদু।

বারুদের স্তূপে আগুন লাগে।

—ইয়াকি হচ্ছে! তোরই বিয়ে দিয়ে এইবার এখান থেকে দূর করে··· আমি গুরুদেবের সঙ্গে হিমালয়ে চলে যাবো। বিষয় বিষ! মা তারা, ব্রহ্মময়ী মা! মাগো! সব টাইট করে দে মা, শুভার বিয়ে একটা দিয়ে দে। তারপর দেখছি।

শুভা হাসতে থাকে। এ প্রস্তাব চাপা দেবার জন্য বলে,—দাদু তোমার স্নানের সময় হয়ে গেছে, আজ নোতুন তরকারী যা একটা রেঁধেছি, চমৎকার। খেয়ে বলতে হবে কিসের তরকারী!

সিধু মল্লিক এবার অন্য মানুষ। হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে। মাঝে মাঝে সে বদলে যায়।

শুভা বলে চলেছে,—চল, ছাদে রোদে তোমাকে তেল মাখিয়ে দিই! তাই বলছিলাম জানো?

—কি!

—আমি আর কদ্দিন সামলাবো তোমাকে, তুমি এইবার একটা দিদিমা আনো, নইলে আমি বিয়ে করে চলে গেলে তোমার কি হবে বলো?

—পাগলী!

বুড়ো সিধু মল্লিক স্নেহভরে নাতনীকে কাছে টেনে নেয়। মাঝে মাঝে বুড়োর মনে হয় এত টাকা-পয়সার মাঝেও কোথায় একটা অসীম শূন্যতাই রয়ে গেছে। তবুও শুভার ওই যত্নটুকু তার শূন্যতাকে খানিক পূর্ণ করেছে। কিন্তু সেও বড় হয়েছে, তাকে এইবার বিয়ে-থা' দিয়ে পরের ঘরে পাঠাতে হবে। তখন এত বড় বাড়ি সবই শূন্য হয়ে উঠবে। একা এই জীবনের মাঝে একটি লোক কি নির্জনতার কল্পনাতে হাঁপিয়ে উঠেছে। ভয়ও পেয়েছে যেন।

সিধু মল্লিকও যে কথাটা ভাবেনি তা নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, সে এতবড় পৃথিবীতে নিতান্তই একা। এত টাকা অর্থ বিষয়-আশয় তার আছে, কিন্তু শান্তি নেই।

দেখবারও কেউ নেই, নাতনী ওই খেয়ালী একটি মেয়ে। তাছাড়া বিয়ে হলে সেও তার সংসারে চলে যাবে। তখন দেখবার কেউ-ই থাকবে না। ঝি-চাকরগুলো তো এমনিতেই ডাকাত। তখন তো তারা পেয়ে বসবে। বাড়িতেই দিন-দুপুরে ডাকাতি করবে তারা।

...ভাবনায় পড়েছে সিধু মল্লিক। আয়নায় নিজের দিকে চেয়ে থাকে। সাজবেশও করেছে সে। গিলে করা দামী আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতের আঙুলে কয়েকটা হীরে চুনী পান্নার আংটি ঝকঝক করছে। এখনও শক্ত সমর্থ সৌখীন মানুষ।

মনের অতলের সেই কামনাটা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শুভাকে ঢুকতে দেখে মল্লিকমশাই ওর দিকে চাইল। গালে তখনও স্নো মাখছে মল্লিকমশাই। পাঞ্জাবীতে হীরার বোতামগুলো খুশিতে ঝকঝক করছে। শুভা কি ভেবে তার নিজের ঘর থেকে সেণ্ট স্প্রেটা এনে দাদুকে একটু স্প্রে করে দেয়। মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে ওঠে।

কোঁচানো দামী ধুতিটা শুভাই ওর হাতে বেশ পদ্মফুলের মত তুলে দেয়।

—ধরো!

সিধু মল্লিক অবাক হয়,—এ কি রে?

শুভা বলে,—বরযাত্রী যাবো কিনা ভাবছি দাদু। তা কোথায় চলেছ?

মল্লিকমশাই হাসে,—তোর এই সব কথাগুলো বন্ধ কর শুভা! হ্যাঁ বাড়িতে থাকিস, সেই দিদিমণি আসবেন সন্ধ্যায়। গান শেখাবার দিদিমণি।

শুভার দু'চোখে কৌতুকের হাসি। দাদুকে বড় একটা সাজ-গোজ করতে দেখেনি। আজ ঘটা করে বুড়োকে এত তোড়জোড় করে সাজতে দেখে

অবাক হয় সে। শুভাই জিজ্ঞাসা করে,—চলেছো কোথায়? সেই দিদিমণিকে আনতে?

সিধু মল্লিক জবাব দেয়,—হ্যাঁ। গ্রাম থেকে আসছে, বাড়ি চেনে না, এনে তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। বেশ ভালো মেয়ে। গানও গায় চমৎকার।

শুভা বলে,—ভাবলাম, অভিসারে বের হচ্ছো! তা এসব সাইন কিন্তু ভেরি ব্যাড্ দাদু! একে দিদিমণি—তায় তোমার এই সাজ-গোজ! ও ছড়িটা নিও না। বুড়ো বুড়ো লাগে তোমাকে।

—সাট্ আপ্! বড্ড ফাজিল হয়েছিস্ শুভা। টেক কেয়ার। সিধু মল্লিক দৃঢ় চরিত্রের লোক। ওসব ফালতু ব্যাপারে নেই;—মা—তারা ব্রহ্মময়ী মা, মাগো!

···বের হয়ে গেল সিধু মল্লিক, দেওয়ালের এদিক-ওদিক টাঙ্গানো কালী-মূর্তিগুলোর পায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে। গায়ে সেণ্টের গন্ধ ভুর ভুর করছে।

কথাটা সিধু মল্লিকের অবচেতন মনে সাড়া জাগায়, একটা সুর আনে। কারখানা হয়ে একবার ঘুরে মোহিতকে সব কাজের নির্দেশ দিয়ে বের হল মল্লিকমশাই। সেই মেয়েটিকে আনতে হবে।

মোহিত সিধু মল্লিকের বেশভূষার দিকে আজ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এতদিন লোকটা অতি সাধারণ পোষাকই পরতো।

মাঝামাঝি একটা ধুতি আর থ্রি কোয়াটার পাঞ্জাবী, পায়ে একটা জুতো—তাতেও পালিশ থাকতো না।

আজ তার পোষাকের বাহার সহজেই চোখে পড়ে। সারা গায়ে সেণ্টের ভুরভুরে সুবাস। মোহিত মনে মনে হাসে। সিধু মল্লিক নিজেই কথাটা বলে মোহিতকে,—আমিই তাহলে নিয়ে যাব তোর বোনকে, গানটান শেখার কাজ যত তাড়াতাড়ি সুরু করা যায় ততই ভালো। আমিও শুভাকে বলেছি গান শুনবি একখানা!

এত ফাঁকেও কাজের কথা ভোলেনি সিধু মল্লিক।

—তা'লে এই গাড়ি দু'খানা আজ ডেলিভারি দিবি, আর কেট্‌ল কোম্পানীর তিনখানা কার আসবে, দামী গাড়ি। নিজে দেখে মেরামত করবি। যাকে তাকে হাত দিতে দিবি না, বুঝলি?

মাথা নাড়ে মোহিত। বের হয়ে গেল সিধু মল্লিক।

কেষ্টো এসে দাঁড়িয়েছিল। সিধু মল্লিক ওর রং-কালিমাখা এপ্রন পরা

মূর্তিটা সামনে দেখে বিরক্ত হয়ে ওঠে। বেশ চড়া গলায় বলে ওঠে,—কাজ-কম্মো করছিস তো, না স্রেফ ফাঁকিই দিচ্ছিস? এদিকে এক কথায় মাইনে তো বেড়ে গেল।

কেষ্টো জবাব দেয়,—কাজ করছি আজ্ঞে।

—তা'ই করগে। দুগ্‌গা দুগ্‌গা। বের হয়ে গেলেন মল্লিকমশাই। কেষ্টো ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে।

—কর্তা কোথায় বেরুলো দাদা?

মোহিত জবাব দেয়,—আমি জানবো কি করে?

কেষ্টো আমতা আমতা করে,—ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না দাদা, বুড়োর মাঝে মাঝে ভীমরতি ধরে। সাজবেশ দেখেছো?

মোহিত ধমকায় তাকে,—তোর নিজের কাজে যা দেখি। লোহাচুর খেলেই শাবল বাহ্যি করবে—আগুন খাও আংরা। তোর তাতে কি? যা, কাজে যা। বড়লোকের দিকে নজর দিস্ না।

কেষ্টো সরে গেল।

মনে মনে হাসছে মোহিত। তবু একবার হাতের ঢিল ছুঁড়ে দেখা যাক সে ঢিল কোথায় গিয়ে লাগে।

মনোহর অনেক ভেবেছে। এমনি একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। তবু মনে হয়েছে মোহিতদার একটা গতি হয়ে যাবে, যদি দু'একটা ট্যাক্সি করতে পারে বুড়োকে ধরে তাহলে লাবুদির সঙ্গে বিয়েটাও হয়ে যেতে পারে। মনোহরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

মনোহরই লাবণ্যকে চিঠি দিয়েছে, সব ব্যবস্থা সে যেমন করে হোক করবেই। কিছু টাকাও পাঠিয়েছে।

মনোহর আজ মন দিয়ে সাজগোজ করেছে। চোখের কোলে টেনেছে হাল্কা কাজলের রেখা, তবু ভয় ভয় করে। বুক কাঁপে তার, নেহাৎ গুরুর নাম স্মরণ করেই আজ এ পথে এগিয়েছে সে। দেখাবে তার বহুরূপীর এলেম।

কড়াটা নড়ে ওঠে।

খুলবে কিনা ভাবছে মনোহর। বাইরে থেকে মিষ্টি কণ্ঠে ডাকছেন সিধু মল্লিক,—মনু! অ মনু! দরজা খোল।

মনোহর দরজাটা খুলে দিতেই সিধু মল্লিক ঘরে ঢুকে ওর দিকে মুগ্ধ বিস্মিত চাহনি মেলে চেয়ে থাকে। দেখছে ওকে। দেখছে নয় ছ'চোখ দিয়ে ওকে গিলছে। সেই চাহনির সামনে আজ মনোহরও বিব্রত বোধ করে। সিধু মল্লিক এমনিই যেন আশা করেছিল, ছোট ঘরখানা কি মাধুর্যে ভরে ওঠে। সিধু মল্লিকের বয়সটাও কমে গেছে অনেক।

মনের অজানা বার্ধক্যের কঠিন পাথরটাকে তার প্রবল স্রোতে যেন দূর করে দিয়েছে। সিধু মল্লিক নীরব উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। কোনরকমে নিজেকে সংযত করে বলে,—চলো! মোহিতকে বলে এসেছি। কোন ভয় নেই। তাছাড়া মোহিত ওসব জানে! মানে···হেঃ-হেঃ-হেঃ!

···সিধু মল্লিক হাসছে। মনোহর গম্ভীর হবার চেষ্টা করে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

গাড়িটা চলেছে আবছা আলো আঁধারির বুক চিরে। সিধু মল্লিকের হাতটা ওর হাতে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢুকেছে গাড়িতে। সিধু মল্লিক দরদী কণ্ঠে প্রশ্ন করে,—ঠাণ্ডা লাগছে?

মনোহর জবাব দেবার চেষ্টা করে,—হুম্।

সিধু মল্লিক নিজেই একটা বড় দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে গিয়ে একটা দামী স্কার্ফ কিনে আনে। মনোহর লেডিজ শাল দেখে বলে,—এটা কি হবে? এত দামী জিনিস!

—ঠাণ্ডা লাগবে। জড়িয়ে নাও।

সিধু মল্লিক নিজেই ওর সর্বাঙ্গে ওটা জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, সরে বসল মনোহর গাড়ির এক কোণে। এই লজ্জাটুকু ভালো লাগে মল্লিকমশাইয়ের।

শুভা বিপদে পড়েছে।

দাদু বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবার পরই এসে জুটেছে গুরুদেব তারকানন্দ, সঙ্গে কয়েকটি বিকট-দর্শন চেলাও রয়েছে। তার জন্য একটা মহল নির্দিষ্টই থাকে এখানে।

এ যেন তারই নিজের বাড়ি। তার হুঙ্কার আর গালবাদ্যিতে বাড়ি ভরে ওঠে, গাঁজার চিমসে গন্ধ অসহ্য ঠেকে। শুভা তবু চাকরদের বলে সেই মহলের চাবি খুলে দেয়।

শুভাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারকানন্দ বলে,—এইবার তোর গতি করছি বেটি। একেবারে স্বয়ং মহাদেবের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনিই আদেশ করলেন : তুই যা, গিয়ে সিধু মল্লিককে সংবাদ দে, তার নাতনীর জন্য আমি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছি। বেতোড়ের মস্ত বড় ধনী ভূদেব দত্তের বাড়িতে—অবতীর্ণ হয়েছি আমি। তার ছেলে রূপে। আহা—মহাভাগ্যবান ভূদেব। বাবাকে সন্তান রূপে পেয়েছে। ধন্য ভূদেব! চেলারাও চোখবুজে সমস্বরে বলে ওঠে,—ওহো! মহৎ ভাগ্যম্!

শুভা এসময়ে সদলবলে ওই তারকানন্দকে আসতে দেখে চটে ওঠে মনে মনে। দাদু যে কেন এই দানবটাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে তাও জানে না। ও একটা ভণ্ড। শুভার মুখে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। তবু কোনরকমে মাথা নুইল। তারকানন্দ খুশি মনে আশীর্বাদ করে,—সাবিত্রীসমানা ভবো। তা কই আমার সিধুকে দেখছি না?

শুভা উত্তর দেয়,—আপনি বিশ্রাম করুন, উনি এখুনিই ফিরবেন।

বাধ্য হয়েই শুভা ওর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে থাকে।

হুঙ্কার ছাড়ে তারকানন্দ দু'চোখ কপালে তুলে,—তারা! দেখা দিয়ে কোথায় লুকালি মা! সামনে আয়! আহা! তোর রূপের আলোয় মন ভরে দে মা।

শুভার সারা গা জ্বলে ওঠে।

তারকানন্দ প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রশ্ন করে,—আমার সিধুবাবাকেই খবরটা দেবার জন্য ছুটে এসেছি। শুভ খবর!

শুভা মনে মনে জবাব দেয়;—তিনিও ধান্দায় বের হয়েছেন। মুখে কিছু বললো না। তারকানন্দ বলে চলেছে,—কত কাজ পড়ে রয়েছে, তবুও আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। কি নির্দেশ মা! বল পাগলী?

আকাশের দিকে চেয়ে মা কালীর নির্দেশ নিচ্ছে যেন। পরক্ষণেই বলে ওঠে,—থাকবো তা'লে? বলছিস তুই! থাকতে হবে বেটি। সিধু ফিরলেই পাঠিয়ে দিবি! ব্যস্।

চেলা ততক্ষণে গালাচের উপর কম্বলের আসন পাততে থাকে,—তারকা-

নন্দ ধমকে ওঠে স্নেহভরা কণ্ঠে,—নীচে তোষক দে। ওরে দেহটা দেব-মন্দির। দেবতা থাকেন যে, তাঁকে শাস্তি দিতে হবে না। পাত বাবা—তোষক পেতে একটু গদি কর। তাঁর মনস্তুষ্টি কর, তাঁকে তৃপ্তি দে। এ্যা: দে, বাঘছাল পেতে দে।

অন্য চেলা ততক্ষণে বেশ সাইজ মত একটা কল্কে এনে হাতে দিয়েছে। গুরুদেব এক ভরি গাঁজা এক টানে ধোঁয়ায় পরিণত করার কাজে মন দেন।

বিরক্ত হয়ে সরে এল শুভা। বাতাসে চিমসিনি গন্ধ উঠছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

শুভা তার ঘরে বসে আছে; হঠাৎ দাদুকে একটি মেয়ের সঙ্গে ঢুকতে দেখে ওদের দিকে চাইল।

ডিস্‌টেমপার করা ঘরে নীলাভ মৃদু আলোটা জ্বলছে। সিধু মল্লিকই পরিচয় করিয়ে দেয়,—আমার নাতনী শুভা, আর শুভা, এই তোমার গানের দিদিমণি।

শুভা মনোহরকে দেখছে, হাত তুলে নমস্কার করে শুভা। নোতুন দিদি-মণিকে সে দেখছে। ওই সন্ধানী দৃষ্টির সামনে নিজেকে এইবার অপ্রস্তুত বোধ করে নারীবেশী মনোহর। তাকে এমনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তা ভাবেনি কখনও। সব চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়, ফাঁকি দেওয়া যায় না মেয়েদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে। তাতে মনের অতলের সব খবর ফুটে ওঠে। মনোহরের মনে হয় এইবার ধরা পড়ে যাবে সে ওই মেয়েটির কাছে, তারপর; এত শীতেও গা ঘামছে তার।

দাদু বলে চলেছে শুভাকে,—মন দিয়ে গান শেখো, খুব ভালো গাইতে পারেন উনি। কি, দিদিমণি পছন্দ হয়েছে তো? তখন তো মেয়ের দিদি-মণির নাম শুনে মুখ ভার। বলে কিনা হুমদো বুলডগের মত মুখ হবে একেবারে নীরস কাঠখোট্টা প্রাণী; আরে বাবা, সিধু মল্লিকের নজর আছে বল।

হঠাৎ সিধু মল্লিক বাতাসে কিসের গন্ধ পায়; কোথায় দূর থেকে পাখোয়াজ আর খঞ্জনীর উদ্দাম শব্দ আর হেঁড়ে গলায় কালী-তারা গানের বেপর্দা শব্দ ভেসে আসে,—ধুম লেগেছে মায়ের রূপের—

সিধু মল্লিক জিজ্ঞাসা করে,—গুরুদেব এসেছেন, না? গলা পাচ্ছি!

শুভা বিরক্তি ভরে জবাব দেয়,—হ্যাঁ, তোমার সেই তারকানন্দন এসেছেন বললেন, কোথায় নাকি মহাদেব গাঁজার কলকে হাতে নিয়েই ধরাধাম

রতীর্ণ হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, সেই খবর দিতে এসেছেন।
ও।

—জয়গুরু! জয়গুরু! শশব্যস্ত হয়ে ওঠে সিধু মল্লিক।

—তাহলে শুভা, দিদিমণির গান শেখানো হয়ে গেলে ড্রাইভারকে বলে
স্ ওকে পৌছে দিয়ে আসবে। আমি বোধহয় ওখানেই আটকে পড়বো।
রে দেখা হবে মনু!

মনোহর ঘাড় নাড়ে। কথা বলার ক্ষমতা তখন যেন নেই।

শুভার কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে,—ওই ভণ্ড গাঁজাখোরটাকে যদি তুমি প্রশ্রয়
ও, শেষ কথা বলে রাখছি এবাড়িতে আর আমাকে পাবে না। যেদিকে
চোখ যায় চলে যাবো।

সিধু মল্লিক হাসে।—সবই মায়ের ইচ্ছা। ঘাবড়াস না দিদি। তারা,
রা মা! গুরুদেব আমার অধমতারণ।

সিধু মল্লিক দৌড়ল।

মনোহর চুপ করে জড়সড় মেরে বসে আছে। শুভাকে মাঝে মাঝে দেখছে।
তক্ষণ তবু বুড়ো ছিল, যা হয় অন্য কথায় না হয় তক্কাতক্কিতে মেয়েটি ভুলে-
ল। ঠিক নজর দিতে পারেনি শুভা ওর দিকে। সিধু মল্লিক চলে গেছে।
ভার মনে তখনও দাদুর উপর রাগটা গুমরে ওঠে। মুখচোখ টকটকে হয়ে
ঠেছে। এইবার ও মনোহরের দিকে চাইল। মনোহর জড়সড় হয়ে বসে-
লে, সহজ হবার চেষ্টা করে। মনে হয় শুভা কঠিন ধাতের মেয়ে। ওকে
। দেখছে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। শুভা ওর কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে।...
লে রাগতস্বরে,—দাদু কোত্থেকে ওই ভণ্ডটাকে জুটিয়েছেন; জানেন একে-
রে শয়তান। কেউ একজন নেই যে আমাকে একটু সাহায্য করে। তাহলে
ই আপদকে দূর করে দিতাম এ বাড়ি থেকে। গুরুদেব! ভণ্ড কোথাকা'র!

মেয়ে হওয়ার অনেক জ্বালা।

হাসে মনোহর, মনে হয় কথাটা সত্যিই, মেয়ে সেজেই যে জ্বালায় পড়েছে
াই দিয়েই মনে হয় আসল মেয়ে হলে কি জ্বালায় জ্বলতো সে।

শুভা বলে,—একটু চা খাবার বলে দিয়ে আসি।

ইতস্ততঃ করে মনোহর,—আবার চা!

শুভার রাগটা পড়ে আসছে। বলে,—তাতে কি। চা খান। অসহায়
াগে শুভা বের হয়ে গেল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে।

মনোহর বিপদে পড়েছে। কোন মেয়ের এত কাছে আসেনি। এক
সুন্দরী ধনী খেয়ালী মেয়ের শোবার ঘরে এসে পড়েছে সে। ওর সন্ধা
দৃষ্টির সামনে এই মেকি সাজবেশ তার ধরা পড়বেই। তাছাড়া কণ্ঠস্বর
বুঝতেই পারবে। এ যেন কি মস্ত একটা ভুল করেছে সে। এমন জান
এ জালে পা দিত না।

জীবনে বহুরূপী সাজতে গিয়ে অনেকবার অনেক দুর্ভোগই সয়েছে। গ্রা
গ্রামান্তরের পথে কোথায় কুকুরে তাড়া করেছে ওর বিচিত্র সাজে, না গৃ
গৃহস্থ তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। পরে অবশ্য ভুল বুঝে মাপ চে
ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নিয়েছে। কোন মদ্যপ ধেনো জমিদার তো সেবার তা
নার্স-এর পোশাক দেখে মন দিয়ে ফেলে। সে এক কেলেঙ্কারি। তাই নি
থানা-পুলিশ অবধি গড়ায়।

শেষকালে ব্যাপারটা পরিস্কার হয় জমিদারবাবুর নেশা কাটলে। তখ
দিলদরিয়া জমিদারবাবু খুশী মনে তাকে নগদ দশ টাকা বকশিশ দিয়ে বলে,-
তা বড় সেজেছিলে হে! এ্যাঁ।

সে সব সয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এমন বৈচিত্র্য ভালোও লাগে। কি
এখানে একটি মেয়ের সামনে তাকে এমনি করে আসতে হবে ভাবেনি; এস
জালে জড়াতো না। ধরা পড়লে এক্ষুনি প্রলয় কাণ্ড বেঁধে যাবে। বুড়ো সি
মল্লিক নিজে তাকে লাঠি পেটা করবে, মোহিতদার উপরও দারুণ চটে যাবে
সব আশা নির্মূল হয়ে যাবে মনোহরের। মনে হয় পালানোই নিরাপদ।

দরজাটা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে এল মনোহর। সামনে টানা বারান্দা
এত বড় বাড়ি, লোকজন কেউ কোথাও নেই। কোন পথ দিয়ে এসেছিল ঠি
ঠাওর করতে পারে না।

বারান্দা থেকে সামনের দিকে চাইল, একসারি বাড়ি তার ওদিকে এ
বাগানের মত। নিশ্চয়ই সিঁড়িটা ওই পাশেই রয়েছে, এগিয়ে গিয়ে থামলো
কাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। উদ্দাম চীৎকার করে চলেছে তারা। বো
হয় গান গাইছে।

ওদিকে পথটা নয়, এই দিকে বোধহয়। চলে যাবে কাউকে না জানিয়ে
কোথায় বিচিত্র জগতে সে যেন হারিয়ে গেছে।

মনে হয় বিরাট বাড়িটা যেন একটা গোলকধাঁধা। কোনদিকে পথ পা
না। চারিদিকে শুধু খাঁ খাঁ করছে ঘর আর বারান্দা।

ওদিকে সেই পাখোয়াজ আর খঞ্জনীর শব্দ বেড়ে ওঠে। প্রচণ্ড হুঙ্কার দিচ্ছে কে উদ্দাত্ত কণ্ঠে।

কে যেন আসছে! মনে হয় একজন চাকরই।

আড়ালে সরে গেল মনোহর। ওরা চলে যেতেই বের হয়ে আসে। সে জীবনে এমন বিপদে কখনও পড়ে নি। ইয়াকি মারতে গিয়ে, এমনি হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবে কল্পনাও করেনি সে।

পালাতে গিয়েও পথ পায় না মনোহর।

কেউ কোথাও নেই। ভয়ে ভয়ে মরিয়া হয়ে এসে শুভার ঘরেই ঢুকলো আবার। বাইরে বেরিয়ে ধরা পড়ে যাবার চেয়ে যা হয় এইখানেই হোক। তবু একজনই জানবে। মেয়েটা মনে হয় তবু ভালো। ধরা পড়লে ওর কাছেই মাপ চেয়ে নেবে, কোনরকমে বের হয়ে আসতে পারবে তবু। কিন্তু বাইরে ধরা পড়লে চাকর-বাকরেরা পিটিয়ে তক্তা করে দেবে। তারা ছেড়ে কথা কইবে না। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। তাই ঈশ্বরের নাম নিয়ে যা হয় কর্তব্য স্থির করে নেয়।

শুভা নিজেই চা আর খাবার নিয়ে এসেছে। তখন ওদিকে প্রচণ্ড স্বরে পাখোয়াজ আর খঞ্জনী বাজছে, সেই সঙ্গে মিশেছে তারকানন্দের সেই সিংহগর্জন।

দরজাটা বিরক্তি ভরে বন্ধ করে দিয়ে খাবার চা টিপয়ে নামিয়ে রেখে শুভা দিদিমণিকে খুঁজছে। কোথাও নেই দিদিমণি! অবাক হয় সে। কোথায় যাবে মেয়েটি। বাইরের বারান্দাতেও ঘুরে এল একবার।

—দিদিমণি!

হঠাৎ ওপাশেই একটি সুন্দর তরুণকে ভীত ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে শুভা। এ যেন ম্যাজিক্ দেখছে সে। ভয়ও পায়, তবু সামলে নিয়ে শুভা প্রশ্ন করে,—আপনি! আপনি কে?

মনোহর পথ না পেয়ে আজ তার বহুরূপীর সাজ খুলে আসল মূর্তি প্রকাশ করেছে। ভীতকণ্ঠে জানায় মনোহর,—আমি! আমি দিদিমণি! সেই দিদিমণি! দোহাই আপনার, বাঁচান আমাকে। আমি নিরুপায় হয়েই এই পথ নিয়েছিলাম, বিশ্বাস করুন। স্রেফ পেটের দায়ে।

শুভা প্রথমটা হকচকিয়ে গেছল। ভয়ও পেয়েছিল রীতিমত তার ঘরে ওই সুন্দর তরুণকে দেখে।

কিন্তু ওই ছেলেটিকেই উল্টে ভয় পেতে দেখে মজা পেয়েছে শুভা। ক্রমশঃ ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

এ তার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তবু কৃত্রিম রাগতস্বরে বলে শুভা,—ইয়ার্কির জায়গা পাননি? ডাকব দাদুকে? চাকর-বাকরদের?

মনোহর এমন বিপদে জীবনে পড়ে নি। তার পায়ের জুতোটা দেখিয়ে বলে ওঠে মনোহর,—মারতে হয় আপনিই মারুন, জুতাপেটা করুন। ওদের ডাকবেন না। দোহাই আপনার। মেরে লম্বা করে দেবে। আপনার দাদুই তো আমাকে এই ফ্যাসাদে ফেললেন। থিয়েটারে ফিমেল রোল করি, বহুরূপী আমি। আপনার দাদুই তো আমাকে মেয়ে-ছেলে ঠাউরে কত কি বল্লেন। দেখুন না এই চুড়ি, ওই যে নোতুন লেডিস শাল সব দিয়েছেন উনি আমাকেই। নানান কথা বলেন। মানে সব বাজে বাজে কথা। উনিই তো ধরলেন আপনাকে গান শেখানোর জন্য। আমি কিন্তু রাজী হইনি—ধরা পড়ে যাবো তাই আসতে চাইনি। বিশ্বাস করুন আপনি। আপনাকে ঠকাতে চাইনি তাই সব কথাই খুলে বললাম। এখন আপনিই দয়া করে বাঁচান। কোনদিনই আর এখানে আসবো না।

শুভা দাদুর মনের এই পরিচয়টা সঠিক জানতো না, অনুমান করেছিল মাত্র। আজ সেটা চোখে দেখে মজাও পায়।

শুভা হাসিতে ফেটে পড়ে আর কি! সাজবেশের কারণটা এইবার বুঝতে পারে। তবু সেই রাগতস্বরে বলে শুভা,—আপনি নিলেন কেন? দাদু বললেন আর আপনি—

—উনি কত করে বললেন! বলেন ভালোবাসি—টালোবাসি।

শুভা হাসিতে ফেটে পড়ে।

মনোহর ওর দিকে চেয়ে থাকে। তার ভয় তখনও কাটেনি। কে জানে মেয়েটা আর কাউকে ডেকে প্রহারের ব্যবস্থা করবে কি না, বলে,—বিশ্বাস করুন; আমি বহুরূপী মাত্র। গাইতে জানি—পেটের দায়ে এইসব সাজি মাত্র।

শুভা বলে,—এটাও আপনার বহুরূপীর অন্য রূপ নয়তো? আসল রূপ কোনটা?

—সেইটাতো আমিও জানি না। তবে বহুরূপী, তার পরখ তো করেছেনই। আর কোন মতলব আমার ছিল না।

—গান জানেন? শুভা প্রশ্ন করে।

মনোহর আমতা আমতা করে,—তা এক-আধটু জানি। তবে আপনাকে গান শেখাতে আর আমি আসবো না। দোহাই আপনার!

শুভার দু'চোখে দুষ্টুমির হাসি খেলে যায়। মনোহর ঢোক গেলে। শুভা বলে,—আপনাকে গান শেখাতে আসতে হবে। বুঝলেন? নইলে দাদু মনে খু-ব দুঃখ পাবেন।

—যদি ধরে ফেলেন তিনি!

—যতদিন নেশার ঘোর থাকবে চোখে ধরতে পারবেন না। বুড়োকে একটু—

—মানে! ওর কথাটা খানিক বুঝেছে মনোহর।

শুভাও কথাটা বলতে গিয়ে পারে না। তারও লজ্জা আসে। এ নিয়ে বেশী কথা বলতে পারে না।

মনোহর ভরসা পেয়েছে; বলে,—আপনি যখন বলছেন, আসবো। তাহলে আপনি একটু ওদিকে যান দয়া করে।

—কেন? অবাক হয় শুভা। কি করবেন আবার।

মনোহর বলে,—দিদিমণি সেজে নিই। এমনি করে বসে থাকতে দেখলে কেউ যদি এসে পড়ে। চাকর-বাকররা কি ভাববে!

—তা সত্যি! শুভা হাসতে হাসতে সরে গেল ওদিকে।

ছেলেটিকে তার বিচিত্র ঠেকে, শুভার রাগও হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু তার কথাবার্তায় আর ওই অসহায় কণ্ঠস্বরে তার মায়াই হয়েছিল বেশী। ওকে কড়া কথা বলতে পারেনি। ওদিকে গুরুদেবের হুঙ্কার কানে আসে। শুভা এবাড়িতে নিজেকে একা অসহায় মনে করে। কোন জোর যেন নেই।

মনোহরের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। একটা মহা ফাঁড়া কেটে গেছে তার। এত সহজে যে পার পাবে ভাবেনি।

বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে গানের সুর ওঠে।

শুভা ওর গান শুনছে, ছোকরা গায় মন্দ নয়। তবু গান শেখার চেয়ে শুভার কাছে ওর সাহস আর বিচিত্র রূপে আবির্ভাবটা ভালো লাগে। মনে মনে এইবার ঠিক করেছে শুভা।

দাদুকে একটু খেলানোর দরকার, একটু হাতে রাখতে হবে বুড়োকে ওরই নেশা লাগিয়ে। নইলে বুড়ো তারকানন্দের খপ্পরেই চলে গিয়ে বিষয়-আশয় নষ্ট করবে। কে জানে ওই মাতাল গেঁজেল বদমাইস তারকানন্দ ওকে অন্য

কোন পথেই নিয়ে যাবে কিনা। না হয় ঠকিয়ে সব বিষয়-সম্পদ পরহাত করে দেবে।

শুভা তবু একটা পথ পেয়েছে। ক্রমশঃ এইবার তারকানন্দকে তাড়াবে সে। বুদ্ধিটা খেলে মাথায়।

তবু সিধু মল্লিক এই ফাঁকে একবার খবর নিতে এসেছে। কে জানে শুভার কেমন লাগলো নোতুন দিদিমণিকে।

মনোহরের তখন আবার সেই মনোমোহিনী বেশ। তাকে বরং ওই শুভাই আরও লাস্যময়ী করে তুলেছে। তার মেকআপে একটু রিটাচ্ করে।

বুড়ো সিধু মল্লিক ওর দিকে চেয়ে থাকে, শুভারও দৃষ্টি এড়ালো না এটা। সিধু মল্লিক বলে,—আজ তাহলে যাচ্ছো ?…কিরে শুভা, দিদিমণি কেমন গান গাইলেন ?

—খুব ভালো দাদু ! শুভাও গাঢ়স্বরে জবাব দেয়। দাদুর দিকে চেয়ে দেখছে সে।

সিধু মল্লিক উপদেশ দেয় শুভাকে,—ভালো করে শেখ দিদি। চল মন্তু, তোমায় গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

বুড়ো নিজেই তাকে নিয়ে বাইরের মহলের দিকে এগিয়ে যায়। শুভা চেয়ে থাকে ওদের দিকে।

ওর পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ধারালো ঝিলিক দেখা যায়। মনোহরের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়।

ওদিকে তখনও সেই তারকানন্দের হুঙ্কার ভেসে আসে। কালীসাধক তান্ত্রিক মহারাজ তিনি। জীবনে তার ধ্যান-জ্ঞান ওই কালী মা। তারই প্রসাদে তারকানন্দ বেশ জমিয়ে নিয়েছে। চেলা-চামুণ্ডাও জুটেছে অনেক, বেশ কিছু রসাল কামধেনুও আছে এই সিধু মল্লিকের মত; তাদের জন্যই আরামেই আছে সে। তারকানন্দ তাই মাঝে মাঝে সদলবলে আশ্রম হতে মুখ বদলাতে আর মোটা দক্ষিণার জন্য আসে।

ওদের কালী-কীর্তন তখনও থামেনি। চাকর-ঠাকুরের দল থালা-থালা লুচি সন্দেশ তরকারী নিয়ে চলেছে সেই মহলের দিকে।

গুরুদেবের ভোগ !

শুভা মনে মনে এইবার কঠিন হয়ে ওঠে।

এইসব অপচয় তো আছেই, তাছাড়া তাকেও এবাড়ি থেকে তাড়াতে চায়

তারকানন্দ। তাই শুভার বিয়ের কথাটা নিয়ে সেই-ই ওই দাদুকে তাগাদা দিচ্ছে। একটা যেমন তেমন পাত্র খুঁজে দিয়ে হটাতে চাইছে তাকে এখান থেকে।

শুভাও এর জবাব দেবে।

মোহিত ক'দিন ধরেই কথাটা ভেবেছে।

চোখের সামনে দেখেছে তারই চেনা-জানা কত লোকের ভাগ্য বদলে গেল। বড়লোক হয়ে গেল তারা।

অনেকেই দু' একটা ট্যাক্সি করে বেশ বহাল তবিয়তে আছে। আরও পুরানো গাড়ির খোঁজ করছে। কিনবে তারা।

তাছাড়া তার মনের সেই হতাশার ভাবটাও কেটে গেছে অনেকখানি। সামলে উঠে এইবার নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছে।

মোহিত জানে কোথায় গেছে মনোহর, কোন কাজে।

আজ কারখানায় সাজগোজ করে বের হয়েছে মোহিত; মনটা ভালো নেই। একা একা ঠেকে।

তাই সকাল সকাল কাজ শেষ করে সেও বের হয়েছে একটু বেড়াতে। আগেও বের হতো সে।

মনটা বেশ খুশীই রয়েছে আজ। মোহিত চেনা পথ দিয়ে এগিয়ে যায়।

খাল ধারের রাস্তায় দিনের আলোটুকু মুছে গিয়ে আঁধার নেমেছে। দিনের উত্তাপের শেষে একটু ঠাণ্ডার আমেজ এসেছে।

এদিকটায় তত লোকজনের যাতায়াত ভিড় কোলাহল নেই। রেইনট্রি গাছগুলোয় আঁধার বাসা বেঁধেছে। মাঠকোঠা বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায় সে।

ওকে দেখে এগিয়ে আসে লক্ষ্মী।

—ওমা। তুমি! কি ভাগ্যি!

ওই একটা মোড়া এগিয়ে দেয় লক্ষ্মী,—বসো।

খালপারের মাঠকোঠার ছোট একখানি ঘর, লক্ষ্মী দাদার আশ্রয়ে এইখানেই আছে। কেষ্টোকে মোহিতই তার কারখানায় চাকরীটা করে দিয়েছে সিধুবাবুকে বলে-কয়ে। সারা পরিবারটা নইলে অনাহারে অর্ধাহারে দিন

কাটাতো। মোহিত তবু তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। লক্ষ্মীকে তার ভালো লাগে।

মিষ্টি মাজামাজা রং, নিটোল স্বাস্থ্য, মুখখানাও মিষ্টি লাগে। ডাগর দু'টো কালো চোখের চাহনিতে কেমন নেশার আমেজ। মোহিত সেই নেশায় যেন মজেছে। ওকে আসতে দেখে কেষ্টোর বৌও হাতের কাজ ফেলে বের হয়ে আসে। জানে কেষ্টোর বৌ মলিনা ওই মোহিতই কেষ্টোর উপরওয়ালা। তাছাড়া রোজগার ভালোই করে। কেষ্টোই বলেছে ওর মনের বাসনাটা। যদি লক্ষ্মীকে বিয়ে করে মহাভাগ্য তাদের।

কেষ্টোর ছেলে-মেয়েগুলোও এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ওর চারিদিকে। ওরাও চেনে মোহিতকে।

মোহিত ওদের জন্য এনেছে কিছু সন্দেশ। মলিনার হাতে ওগুলো তুলে দিতে সে আমতা আমতা করে। মোহিতের অনেক অনুগ্রহ নিয়েছে তারা।

—দাদা, আপনি আবার এসব আনলেন কেন?

মোহিতের তবু ভালো লাগে। কেউ তাকে খাতির করছে এটা দেখতে চায় সকলেই। সেইটুকুই মোহিতেব গর্ব। ছেলেগুলোর মুখে হাসি দেখে নিজেও আনন্দ পায়।

মলিনা চা করতে যায়। লক্ষ্মী আর সে—দু'জনে চুপ করে বসে আছে। মোহিতের মনে হয় অনেক কিছুই বলবে বলে এসেছিল, কিন্তু সে সব কথা তার হারিয়ে গেছে। মোহিত সে কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে।

রাস্তার একফালি আলোর স্পর্শ এসে লেগেছে লক্ষ্মীর নিটোল পুষ্ট দেহে, ওর দু'চোখে সেই ভালো লাগার সাড়া। মোহিতের সারা মনে বিচিত্র সুর। সে অনেক কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে।

বলে ওঠে মোহিত,—একটা ট্যাক্সির পারমিটের চেষ্টা করছি। সবাই বলে মিস্ত্রী। গাড়ির মালিক নাহলে চলবে না আর।

লক্ষ্মীর কাছে এসব স্বপ্ন। গাড়ি-বাড়ি!

—সত্যি! তোমার গাড়ি হলে একদিন কিন্তু খু-উব ঘোরা যাবে! বুঝলে! এত ভিড় যে চলা যায় না। ট্রামে-বাসে যা ভিড়; আর লোকগুলোও কি অসভ্য। মা গো! বিশ্রী লাগে আমার।

মোহিতের কাছে সন্ধ্যাটা কোনদিকে কেটে যায়। এই সময় অন্যদিন একা একা বাড়িতে কাটতেই চায় না। নানা ভাবনা চিন্তাই ভিড করে আসে।

আজ সেই সময়টুকু কোনদিকে চলে গেল টেরই পেল না। এরই নাম ভালোবাসার স্বপ্ন দেখা কিনা জানে না মোহিত। মনে জোর আনে, ভরসা আনে। তাকে আরও বড় হবার সাধ্যি যোগায়। এমনি খানিকটা স্মৃতি জেগে ওঠে আজ, সে সব অতীতের স্মৃতি। লাবণ্যকে মনে পড়ে, সে তার কাছেও এমনি একটা জোর পেতো। কিন্তু সে সব কোনদিকে হারিয়ে গেছে আজ। একদিন সেই চিন্তা নিয়েই ডুবে ছিল, ভালো লাগতো না কিছু। আবার সহজ হতে পেরেছে সে। অনেক সহজ। তাই নোতুন করে আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখে মোহিত।

সন্ধ্যাটা আরও দীর্ঘতর হলে ভালো হতো।

—লক্ষ্মী! মোহিত ওর কথাগুলো শুনছে।

লক্ষ্মী বলে চলেছে কি আশাভরা কণ্ঠে,—তোমার গাড়ি হোক, একদিন ফাঁকায় দূরে গ্রামের দিকে বেড়াতে যাবো। কলকাতায় এই ঘিঞ্জি বস্তি আর খালধারের ওই ধোঁয়াঢাকা রাস্তায় ধুলোর চাপে যেন শেষ হয়ে গেছি।

মোহিতের ছ'চোখে নীল স্বপ্ন নামে। একফালি চাঁদ রেইনট্রি গাছের আড়ালে জেগে উঠেছে, রাত্রির আঁধারের মাঝে ওই ম্লান আলোটুকু কি নীরব আনন্দের আবেগ নিয়ে এসেছে।

—লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী ওর দিকে চেয়ে থাকে ডাগর ছ'চোখের চাহনি মেলে।

কোথায় একটা রাত-জাগা পাখী ডাকছে, খালের দিক থেকে ভেসে আসে কোন নৌকার মাঝির কণ্ঠের এক টুকরো গানের কলি—তার বন্ধু কোন পূব দেশে ধান কাটতে গিয়ে আর ফেরেনি।

ওই পাখীর ডাক, ওই উদাস কণ্ঠের গানের সুর সব মিশে মোহিতের কাছে মনে হয় জীবনে তবু আশা আনন্দ আছে।

এতদিন সে বাঁচার এ স্বপ্ন দেখেনি।

মিথ্যেই জীবনে এতগুলো দিন তার কোনদিকে হারিয়ে গেছে।

লাবণ্যকে সে ভুলতে চায়।

সে তার কাছে যেন কোন নিশীথ রাতের দেখা স্বপ্ন, যা কোনদিনই সত্য ছিল না। মিথ্যাই কল্পনার জাল বুনেছিল সে।

লক্ষ্মীর জন্য আজ সে নোতুন শাড়িও এনেছে একখানা, লক্ষ্মীর মুখ-চোখ খুশিতে ভরে ওঠে।

—এসব কেন ? না, না !

লক্ষ্মীর এই লজ্জাটুকু ভালো লাগে তার।

ওর নিটোল হাতে দু'গাছি বালা হলে মন্দ মানাবে না। কোনদিন মুখ ফুটে কিছু চায়নি লক্ষ্মী। মোহিতের মনে পড়ে সেই মধু মুহুরীর কথা। লোকটা শয়তান। তার কাছ থেকে কেবল সব লুটে-পুটে নিয়েছে, ঠকিয়েছে তাকে। অথচ তার চেয়েও অনেক গরীব এই কেষ্টো, সে তো কোনদিন এমন করেনি। তার বোনকেও দেখেছে। অন্তরের কাছে স্বভাব বিকিয়ে দেয়নি। মোহিত কথাটা ভাবছে। লক্ষ্মীর দু'চোখে খুশির আমেজ।

—কি ভাবছো ?

মোহিত ওর দিকে চেয়ে বলে,—না। কিছু না।

তবু মোহিত আজ কোন একজনের খুশীর জন্য অনেক কিছুই করতে পারে। মনও চায় তেমনি কিছু করতে। এ তার কাছে নোতুন স্বাদ।

মোহিত খুশীভরা মন নিয়েই বাড়ি ফিরেছে। খিদে তার নেই। লক্ষ্মী ছাড়েনি। তার কথায় ওদের ওখানে খেয়ে এসেছে বাধ্য হয়েই।

সামান্য আয়োজন। রুটি আর ডাল, সেই সঙ্গে গুড়। গরীবের ঘরে ওর বেশী কিছু জোটে না।

তবু মনে হয় মোহিতের তাই-ই যেন অমৃত। বেশ রান্না।

লক্ষ্মী হঠাৎ হাসতে হাসতে বলে,—হাত পুড়িয়ে রান্না করে আর কদ্দিন খাবে ?

জবাব দিল না মোহিত। তবে মনে হয় একদিন শূন্য ঘর তার পূর্ণ হবে। এমনি করে একা একা জীবনের বোঝা টানতে হবে না।

লক্ষ্মীও কল্পনা করে ওর বাসাটা সে নিজে গিয়ে সাজিয়ে দিয়ে আসবে। তাই বলে,—একদিন দেখে আসবো তোমার সংসার।

—ছন্নছাড়ার সংসার নাইবা দেখলে !

মোহিত ওকে আনতে চায় না এখন, কে জানে মনোহর যদি কোনরকম বাগড়া দেয়। তাছাড়া মনোহর এখনও লাবণ্যের কথা ভোলেনি। সে চায় মোহিতের ঘরে আসবে লাবণ্যই। অন্য কেউ নয়। ছোঁড়াটাকে চটাতে চায় না সে।

তাই ওসব ঝামেলা মোহিত পোয়াতে চায় না। জবাব দেয়,—কখন থাকি ঠিক নেই। সারাদিন তো কারখানায়।

লক্ষ্মী হাসতে হাসতে বলে,—আমায় যেচে যেতে বয়ে গেছে। থাক, থাক যাবো না।

—রাগ হল? মোহিতের কাছে ওর রাগটুকুও ভালো লাগে।

মোহিত বেশ খুশী মনে পান চিবুতে চিবুতে ফিরছে! রাত হয়ে গেছে। এতক্ষণ সে যেন অন্য জগতে মিশেছিল।

বাসার কাছে এসে দেখে মনোহর ফিরেছে। ঘরে আলো জ্বলছে, এখন তার ঘরের হালও বদলে গেছে মনোহরের দৌলতে। এমনিতে ছিমছাম থাকে সে।

বাইরের ঘরের একটা বেতের সুন্দর সোফা সেট কার্পেট পাতা। একটা ছোট গালচে। একেবারে আধুনিক কায়দায় সাজানো একটা ফ্লাওয়ার ভাস। এসব মোহিতের কাছে ভালোই লাগে। মনোহর এসব এমনিতেই পেয়েছে। কথাটা প্রথমে ভাঙেনি সে। বলে,—বহুরূপীর বক্‌শিস গো দাদা!

মোহিত বোঝে না কি করে ঘর সাজানো হল। মনোহর শোনায়,—তোমার মালিকই পৌঁছে দিয়েছে এসব।

সব কিছুই এসে গেছে সিধু মল্লিকের দয়ায়।

মোহিত ভিতরে ঢুকে দেখে মনোহর বেশ জুৎ করে একটা সোফায় বসে সিগ্রেট টানছে। মোহিতকে ঢুকতে দেখে সে চাইল।

—কি রে, খাবি না? চুপ মেরে বসে আছিস যে?

মনোহর ওকে প্রশ্ন করে,—তুমি।

—আমার খাওয়া হয়ে গেছে। জবাব দেয় মোহিত।

মনোহর ওর দিকে চাইল। একটু অবাক হয়েছে সে। কিছুদিন থেকে মোহিতকে দেখছে, তার মধ্যে কোথায় একটা পরিবর্তন এসেছে। মনোহর জিজ্ঞাসা করে,—তুমি কিন্তু আগের থেকে বদলে গেছো দাদা। প্রায়ই বাইরে খাচ্ছ এখন; এ্যাঁ! ব্যাপার কিগো?

মোহিত একটু চমকে ওঠে। ওর মনে হয় ওই ধূর্ত মনোহর বোধহয় তার সম্বন্ধে খবর কিছু পেয়েছে।

মোহিত জবাব দেয়,—মানুষ বদলাবে না? এই তুই! ছিলি গাঁয়ে পড়ে, শহরে এসে তোর ভোল বদলে গেছে না? এখানে এসে দিব্যি সাজগোজ হয়েছে, সোফায় বসছিস। সিগ্রেট খাচ্ছিস!

মনোহর হাসে,—ভুল করলে দাদা, আমি যে বহুরূপী। এ তো আমার

রক্তের সঙ্গে মিশে আছে, আসলে আমি ব্যাটা সেই মনোহরই। মনোহর বউরূপী গো।

মনোহর একটা চিঠি পকেটে রেখে উঠে পড়ে।

—খেয়ে নি গে। ঠাণ্ডা হলে পাঁইজীর রুটি আবার সুকতলা হয়ে যাবে।

মোহিত কি ভাবছে।

ট্যাক্সির পারমিটের দরখাস্ত নিয়ে তদ্বিরও করেছে মোহিত। বোধহয় পেয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা আছে। তাই বলে মোহিত,—মনোহর, যদি ট্যাক্সির পারমিট পাই কিছু টাকার দরকার হবে যে!

—টাকা! মনোহর অবাক হয়,—সে যে মেলা টাকা!

হাসে মোহিত,—তাতো বটেই।

—তা মালিবকে বলো না?

মোহিত ওর কথায় চমকে ওঠে,—বুড়ো টাকা দেবে? উল্টে বলবে পারমিটটা আমাকেই বেচে দে। ওকে চিনিস না। ব্যাটা এমনিতে দু' পাঁচ হাজার ভস্মে ঢালবে, কিন্তু ওর কাছ থেকে এমনি টাকা বের করতে পারে এমন শর্মা কেউ নেই।

মনোহর কথাটা ভাবছে। ওটা পেলে সব দিকেই সুরাহা হয়ে যায়।

মোহিত বলে,—ও টাকা দেবে না সহজে। অথচ গাড়িটা আমার চাই-ই। পারমিট হয়ে যাবে হয়তো। তখন? বুঝলি, এসব ফ্যাসাদে কেন গেলাম? গাড়িটা পেলে যা হয় একটা হিল্লে হয়। বিয়েটাও করতে পারি।

মনোহরের চোখের সামনে লাবণ্যের সেই মুখখানা ভেসে ওঠে। লাবুদির স্বপ্ন সার্থক হবে। মোহিত, লাবুদির জন্য সে অনেক কিছু করতে পারে। মোহিত ওকে দেখছে। বলে ওঠে মোহিত,—বুড়োকে তুই একটু জপা, ও বুড়ো ঠিক জালে পড়বে বুঝলি। অঢেল পয়সা ওর। তাক্ বুঝে একদিন বলে ফেল কথাটা। ঝুম্ করে দিয়ে দেবে টাকা।

মনোহর কথাটা ভাবছে খেতে খেতে। শুকনো রুটি দাঁত দিয়ে কাটা যায় না, তাই ছেঁড়বার চেষ্টা করছে সে। আর পাঁচ হাজার টাকার স্বপ্ন দেখছে।

সিধু মল্লিক জোড় হাত করে গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে আছে। রাত হয়ে গেছে। বেদম সেই কালী-কীর্তনের পর তারকানন্দ গোগ্রাসে গিলছে।

একটা বড় পরাতে অনেকগুলো সন্দেশ, বেশ খানিকটা দই, ওদিকে একটা বড় বাটিতে একরাশ মাংস, পাশে একটি বিদেশী হুইস্কীর বোতল। চেলাদের একজন গ্লাসে ঢালছে আর তারকানন্দ মাংস চিবুতে চিবুতে বলে—ওরে বাবা, একালে ছুনিয়ায় সবই ভেজাল, মায়ের প্রসাদের মধ্যেও আর ভেজাল দিস না বাবা। জল ঢেলে ওর শুচিতা নষ্ট করিস না। দে!

নীট—ওই তাজা পানীয় বেশ খানিকটা ঢক্ ঢক্ করে গিলে হুঙ্কার ছাড়ে তারকানন্দ,—তারা! তারা! তাহলে ওই করো সিদ্ধেশ্বর। বেতোড়ে গিয়ে বসন্ত দত্তের নাম বললে কাক-পক্ষীতেও দেখিয়ে দেবে। ছেলেও মহাদেব। আমার প্রিয় শিষ্য। তোমার নাতনীর সঙ্গে মানাবে ভালো।

সিধু মল্লিক ইতিমধ্যে খোঁজ-খবর নিয়েছে। হতাশ হয়েছে বরং। ভীত কণ্ঠে জানায় কথাটা,—আজ্ঞে পাত্রের বয়সও চল্লিশের কোঠায়। তাছাড়া নাকি অন্য দোষও তার আছে। জেনে-শুনে সেখানে দিতে আদেশ করছেন? অবশ্য আমার বলার কিছুই নেই।

তারকানন্দ ওর দিকে চাইল লাল চোখ মেলে। ও চেয়েছে কোনরকমে সে ওই পাজী নাতনীটাকে এবাড়ি থেকে বিয়ের নামে দূর করতে। বসন্তও তার বংশবদ শিষ্য। সেও চুপ করে থাকবে এমন পাত্রী আর কিছু টাকাকড়ি পেলে। ফাঁক থেকে তারকানন্দের আশ্রমে দেবসেবায় চলে যাবে এসব কিছু। সেটারই প্রতিবাদ করছে যেন ওই সিধু মল্লিক। সে অবশ্য গুরুদেবের লাল চোখ দেখে শিউরে উঠেছে। তারকানন্দ হুঙ্কার ছাড়লেন না, ওর কথাই শুনছেন সহজভাবেই। তাই আমতা আমতা করে সিধু মল্লিক,—মানে বয়স একটু বেশী, তাছাড়া ধরুন গুরুদেব এদিক-ওদিকে লোকটার কেমন যেন—

শুভাও সব কথা শুনেছে। দাদুর সরকারের কাছে সব খবর শুনে সে-ই দাদুকে সার কথা জানিয়েছে। টাকা থাকতে পারে লোকটার, কিন্তু তাকে বিয়ে করতে পারবে না শুভা। দাদু যেন ওখানে কথাবার্তা না বলে।

নেহাৎ ভয়ে ভয়েই কথাটা জানাতে চায় সিধু মল্লিক গুরুদেবকে। তারকানন্দ সব শুনে বিকট শব্দে হেসে ওঠে,—মূর্খ তুমি সিদ্ধেশ্বর। আমার মন্ত্রেও তোমার দিব্যজ্ঞান আসবে না? আরে উনি যে সাক্ষাৎ মহাদেব গো। মহাদেবের বয়সের গাছ-পাথর ছিল? আর উনি তো নীলকণ্ঠ, ছুনিয়ার সব পাপ কণ্ঠে নিয়েছেন। তবু তাকে পাবার জন্য উমার কি তপস্যা?

চেলারা হাতজোড় করে নামামৃত শুনছে, সকলেই চোখ বুজে আছে

ভাবের আধিক্যে! একজন চেলা যিনি গেলাসে সেই বোতল থেকে তরল অমৃত ঢালছিলেন, তিনি এই ফাঁকে বোতলেই মুখ লাগিয়ে বেশ একঢোক গিলে ফেলেছেন, কিন্তু গুরুদেব সর্বজ্ঞ।

তারকানন্দের চোখ দু'টো সহসা খুলে যায়—ঘটনাটা তার নজরে পড়েছে। দু'চোখে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে তার দিকে চাইল তারকানন্দ। গুণী শিষ্য ভয়ে শিউরে ওঠে।

পরক্ষণেই মুখে অমায়িক হাসি হেসে বলে তারকানন্দ,—আমার আদেশ, তুমি ওখানেই নাতনীর বিয়ের ব্যবস্থা করো। ভালো হবে—মঙ্গল হবে।

সিধু মল্লিক ঢোক গিলছে,—এ্যাঁ, তাই বলছেন?

ওপাশের দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে যায়। তারকানন্দ একবার ক্রুর দৃষ্টিতে ওদিকে চাইল মাত্র।

সে জানে শুভার আসার সংবাদ। তারকানন্দ বলে,—মেয়েদের স্বাধীনতা ভালো নয় সিদ্ধেশ্বর। ওকে পাত্রস্থ করো, তারপর মায়ের ছেলে মায়ের শান্তিময় আশ্রয়ে চলে এসো। তারা মা! তোর কি নির্দেশ মা! বল—বল পাগলী!

শিবনেত্র হয়ে যায় তারকানন্দের।

কিন্তু সিধু মল্লিকের অবস্থা কাহিল। একদিকে ওই কঠিন গুরুদেব অন্যদিকে তেমনি হাড়পাজী নাতনী। আদর দিয়ে তাকে মাথায় তুলেছে এতদিন, আজ হঠাৎ তাকে জোর করে এসব মানিয়ে নেওয়া যাবে না। শুভা কঠিন কণ্ঠে তার মতামত জানিয়ে দিয়েছে—ওখানে বিয়ে করবো না। এদিকে গুরুদেব তখন বিলাতি পানীয়ের তেজে কি দিব্যজ্যোতি দর্শন করছেন ভাবগ্রস্ত হয়ে।

চেলারা বাবাকে ঘিরে মায়ের নাম শোনাতে থাকে। অন্যতম চেলা বোতলের বাকীটা গেলাসে ঢেলে বলে ওঠে বাবার কানের কাছে,—কারণামৃত বাবা।

ঝেড়ে পুছে উঠে বসে তারকানন্দ বিদেশী অমৃত পান করতে থাকে।

সিধু মল্লিক বিপদে পড়েছে। তার বিপদ চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে।

এদিকে নিজের কথাটাও জানাতে সাহস করেনি গুরুদেবকে। নিজে যে প্রেমের তুফানে ওঠা-নামা করছে সে সংবাদটা গুরুদেবকে দেয়নি। ওদিকে শুভা বেঁকে বসে আছে।

গুরুদেব তারকানন্দ এবার এসে গেড়ে বসেছে। প্রতিদিন তার ভোগ-রাগ সেবার বাবদ বেশ কিছু বের হয়ে যাচ্ছে, তার উপর আছে ওই বিদেশী পানীয়ের খরচ। সে যেন হাতি পোষা, অথচ না করে পথ নেই।

প্রথম প্রথম দেশী কালীমার্কা বোতলই দিত, তারকানন্দই বলেছিল তার ব্যাপার দেখে,—এসবের চেয়ে ভালো জিনিস আনো বাবা, অমৃতে দেশী-বিদেশী সব সমান। তাই-ই আনো।

তারকানন্দের খরচাটা এইবার গায়ে লাগছে সিধু মল্লিকের। ওদিকে সেই নোতুন দিদিমণির স্বপ্নও চোখে লেগেছে।

মনে মনে তার আবার সংসারে মজবার নেশা, ওদিকে কাজ-কারবার ব্যবসাও আছে। সময়ও কম। নানা ঝামেলায় পড়েছে সে।

মোহিতকেও হাতে রাখতে চায় সিধু মল্লিক।

মোহিতই সেদিন কথাটা পাড়ে,—বোনের বিয়ে দিতে হবে মল্লিকমশাই, এদিকে একটা ট্যাক্সির পারমিটের চেষ্টা করছি, তবু কিছু বাড়তি পয়সা আসবে।

—মন্নুর বিয়ের কথা ভাবছিস?

মল্লিকমশাই ওর কথা শুনে চুপ করে থাকে। মনে হয় মন্নুর বিয়ে হয়ে গেলে তার জীবনে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

মোহিত ওর ভাবখানা দেখছে। সিধু মল্লিক বেশ মুরুব্বীর মত বলে,—বোন তো তোর গলায় লেগে নেই মোহিত। তার ব্যবস্থা সে ঠিক করে নেবে।

মোহিত বুড়োর হাসিভরা মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে। টাকা তার কিছু চাই। গাড়িখানা হাতে এসে গেলে বুড়োকে সে দেখে নেবে। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ওর হাতেই রয়েছে সে। বুড়ো কতখানি মজেছে সেটা মনে মনে আঁচ করে নেয়। বলে চলেছে মোহিত,—তবু তো বিয়ে-থা দিতে হবে?

মাথা নাড়ে সিধু মল্লিক,—তা দিবি। দেখ, গাড়িখানার পারমিট পাস কি না? এখন সেটাই দরকার। বিয়ের তাড়া এখন তো নয়!

ওর কথায় সায় দেয় মোহিত।—তা অবিশ্যি নেই।

মল্লিকমশাই জোর দিয়ে বলে,—তবে! তবে ঘরের লক্ষ্মী বিদেয় করতে চাস কেন? আর সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। তার চেয়ে যদি পারমিট একটা পাস গাড়িই কর। তাই ভালো।

মোহিত জবাব দেয়,—দেখি। যখন বলছেন আপনি।

মল্লিকমশাই সায় দেয়,—তাই দেখ।

মোহিতই কথাটা শুনিয়ে রাখে,—অনেক টাকার ব্যাপার, এত টাকা পাবো কোথায় ?

সিধু মল্লিক এমনি করে মোহিতকেও প্রলুব্ধ করতে চায়। ওকে হাতে আনতে পারলে বৃদ্ধ বয়সেও হয়তো তার একটা গতি হবে। তাছাড়া মন্থ মেয়ে হিসাবেও মন্দ নয়। দেখতে-শুনতেও ভালো, তাছাড়া চটক আছে।

সিধু মল্লিকের সারা মনে নীরব একটা তৃষ্ণা মাথা তুলছে। এই ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে মন্থকে দেখার পর থেকে। সিধু মল্লিকই বলে,—পারমিট হয়ে গেলে টাকার ভাবনা হবে না, তোর ব্যাপারটা আমি দেখবো মোহিত, তবে তোদের দোষ কি জানিস্ ? মালিকের দিকটা তোরা দেখিস না।

মোহিত অবাক হয়।

—আপনিই এই কথা বললেন মল্লিকমশাই ? কতটুকু কারখানা থেকে এতবড় করলাম। দিনরাত এইখানেই পড়ে আছি।

মল্লিকমশাই ওদিকের কথা বলতে চায়নি। তাই অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে,—আহা হা ! তাই বলেছি নাকি ? বলছিলাম সংসারের সুখ-দুঃখের কথা। একটু সেবা-যত্ন, সেগুলোর ব্যবস্থাও তো চাই ! মালিকও তো মানুষ। কি বল ?

মোহিত চুপ করে থাকে।

সিধু মল্লিক কাজকর্ম ফেলে বের হয়। মোহিত জানে ও কোথায় যাবে। সিধু মল্লিকের এই ব্যাকুলতা তার মনেও চিরন্তন ব্যাকুলতার রেশ এনেছে।

লক্ষীর কথা মনে পড়ে। গাড়িখানার ব্যবস্থা হয়ে গেলেই সেও এইবার ঘর বাঁধবে। এমনি করে ভেসে ভেসে বেড়াতে ভালো লাগে না। তাছাড়া মনোহরও রয়েছে। তার মত নেওয়া দরকার। জানে মোহিত, মনোহর এখনও তার লাবুদিকে চিঠিপত্র দেয়, টাকা পাঠায়। মোহিতের অন্য মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছাটা টের পেলে সে কি করবে কে জানে। তাছাড়া মনোহরকে এখন কোন মতেই চটানো চলবে না। সে বিগড়ে গেলে মোহিতের সব আশা-ভরসা ধূলোয় মিলিয়ে যাবে।

মনোহর জানে না সেই মফঃস্বল সহরের লাবণ্যের খবর সে রাখে না, তাকে ভুলে গেছে মোহিত।

নতুন জালে জড়িয়ে সে অতীতকে ভুলে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল একটি স্বপ্ন দেখে।

লাবণ্য তবু ভোলেনি। মেয়েরা বোধহয় এটা ভোলে না। তার

ভালোবাসায় ফাঁক ছিল না। মাঝে মাঝে টাকাও কিছু যায়, মনে হয় মোহিতই তাকে টাকা পাঠাচ্ছে। আর চিঠি যায়, সেটা লেখে মনোহরই। তার চিঠিতে থাকে আশার কথা।

দাদার সময় নেই, নোতুন গাড়ি কিনবে তারই জন্য ব্যস্ত। লাবণ্য মনে মনে খুশী হয়। ওই স্বপ্ন নিয়ে থাকে সে।

লাবণ্য বাবার বাড়াবাড়িতে অস্থির হয়ে উঠেছে।

মফঃস্বল সহরেরও রূপ বদলে গেছে। সেখানে এসেছে পরিবর্তনের ঢেউ। নতুন নতুন অফিস বসছে, অফিসার-কেরানীবাবুর দল আসছে। নানা নতুন ব্যবসা করে সহরে একটি নতুন শ্রেণী গজিয়ে উঠছে। হঠাৎ কিছু টাকা আর প্রতিপত্তি পেয়ে গেছে তারা। তারাই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, সমাজের সভ্য আদর্শ জীব। তাদের আসরে মধু মুহুরী মেয়েকে নিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে যেতে হয় লাবণ্যকে।

নাটক ও অভিনয় হয়, লাবণ্যকে তাতে পার্ট করতে হয়। মধু মুহুরী মেয়েকে এসব করতে বাধ্য করেছে।

মধু মুহুরীর মেয়ে লাবণ্য তাই সহরের মাঝে অতি পরিচিত। ঘেন্না ধরে গেছে লাবণ্যের এই জীবনে।

কিন্তু এসব কোলাহল-কলরব ভালো লাগে না লাবণ্যের। এর অন্তরালে সে দেখেছে মানুষের কদর্য রূপ; এখানে শুধু ভেসে যাওয়াই যায়—ঘর বাঁধার শান্তি নেই।

তাই হাহাকার করে সারা মন।

মনোহরের চিঠিগুলো সাগ্রহে পড়ে। মনে হয় সে নিজেই চলে যাবে এখান থেকে। বাবার মতলব তার বুঝতে বাকী নেই।

মোহিতের সেই ডাকের জন্য সাগ্রহে কান পেতে আছে সে। প্রায়ই লাবণ্যর সঙ্গে মধু মুহুরীর কথা কাটাকাটিও হয়।

লাবণ্য বাবার এই ব্যাপারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অবশ্য মধু মুহুরীর এসব দিকে নজর নেই। তার কাছে এখন অর্থের নেশাটাই বড় হয়ে উঠেছে। এত কাল কি কষ্টে দিন কাটিয়েছে একমাত্র সেই-ই জানে। কোর্টে মুহুরীগিরি করে যা সামান্য রোজগার করেছে তাতে পেট চলেনি। দিনান্ত পরিশ্রম করেছে। এর-ওর-খোসামুদি করেছে। ক্রমশঃ দেখেছে দিনবদলের পালা।

লোকের হাতে বেশ কিছু কাঁচা পয়সা আসছে, সেই সঙ্গে তারাও মেতে উঠেছে।

মধু মুহুরী সেই আসরের খোঁজ পেয়েছে। খোঁজ পেয়েছে রাতের অন্ধকারের অতলে একটা জীবনের, যেখানে আছে পয়সার ছড়াছড়ি।

রাস্তার বড় ঠিকাদার মিত্র সাহেবের আমদানীও মন্দ নয়। গাড়ি-বাড়ি সবই আছে। তিনিই এখন টাউন হলের অন্যতম পাণ্ডা। থিয়েটার-ফাংশন নাচ-গানের আয়োজন হয়। মিত্র মশায়কে সাহেব-রথী-মহারথীদের আপ্যায়নের ভারও নিতে হয়। ভেট পাঠাতে হয় সদরের প্রভুদের।

তিনিও খুঁজে বের করেছেন মধু মুহুরীকে।

ক্রমশঃ মধু মুহুরী কোর্টের সেই উপোসী ছারপোকার মত পড়ে থাকার অভ্যাসটা ছেড়ে এখন নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে।

লাবণ্যও জানে তার বাবার এই অন্ধকারের পরিচয়টা। সদরের ওপাশেই জায়গা কিনে বাড়ি করছে মধু মুহুরী। লাবণ্য জানে বাবার এই বেসাতির কথা।

সেদিন মিত্র সাহেব সদরে কি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। নিজেই আসেন তিনি মধু মুহুরীর বাড়ি।

মধু যেন হাতে স্বর্গ পায়।

—স্বয়ং উনি এসেছেন, সদরে গাইতে যেতে হবে। ওঁর গাড়িতে যাবি আর আসবি। নিদেন পঞ্চাশ টাকা দেবেই, দু'খানা গানের জন্য।

লাবণ্য জানে ওরা টাকা দিয়ে যায় তার বাবাকে। গানও গায় লাবণ্য, কিন্তু তার চেয়ে তার দেহের দিকে ওদের নজর বেশী। মিত্র মশায়ের শুকনো হাতটা ইতিপূর্বে কয়েকবারই তার দেহটাকে আক্রমণ করতে চেয়েছে। ঘৃণা আসে তার। লাবণ্য জবাব দেয়,—যাবো না। বলে দাও ওদের।

মধু মুহুরী ফোঁস করে ওঠে,—কথা দিইছি আমি।

লাবণ্য আজ মোহিতের কথা ভাবে। হয়তো এতদিনে সে সুখী হতো তার নিজের ঘরে। কিন্তু এই লোকটাই তা হতে দেয় নি। সে রাত্রে মোহিতকে সে তাড়িয়ে দিয়েছিল, লাবণ্যেরও উচিত ছিল জোর করে চলে যাওয়া, তাহলে বোধহয় এই সব অপমান-লাঞ্ছনা সইতে হতো না। সেদিন না গিয়ে ভুলই করেছিল সে। মস্ত ভুল।

আজ মনোহরের চিঠি পেয়ে সেই সাহস ফিরে আসে। বাবার কথায়

কঠিন স্বরেই জানায় লাবণ্য,—আমি যাবো না। শরীর ভালো নেই। মধু মুহুরী গর্জন করে ওঠে,—ত্যাঁদড়ামি হচ্ছে! আচ্ছা, দেখে নোব আমি।

লাবণ্যও আজ কঠিন হয়ে উঠেছে। নিজেই মোহিতকে তাই চিঠিখানা লেখে। এখানে আর থাকতে চায় না সে। মোহিত যা হয় একটা ব্যবস্থা করুক। আর কোন অমত নেই তার। মনোহরকেও অনেক আশা নিয়ে কথাটা জানায় লাবণ্য। সে যেন মোহিতকে সব কথা খুলে বলে, এ জীবন লাবণ্যের অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মনোহর চিঠিখানা পেয়েছে। ভেবেছিল মোহিতও তাকে কিছু বলবে লাবণ্যের সম্বন্ধে, কিন্তু কিছু না বলতে দেখে সে অবাক হয় একটু। তবু মনোহর নিজেই তার ব্যবস্থা করে চলেছে।

মনোহরও জানে এসব কথা। তাই ধীরে ধীরে এগোচ্ছে কি করে মোহিতকে এই পথে আনতে পারবে। লাবুদির সঙ্গে বিয়েটা হয়ে গেলে তার যেন কর্তব্য শেষ হয়! বিয়ের প্রথম পর্ব ওই ট্যাক্সির ব্যবস্থা, ওটা করতেই হবে।

মোহিতের কথাতেই সে সিধু মল্লিককে খেলাচ্ছে। মোহিত তার হাতেই, তবু গাড়ির ব্যবস্থাটা করতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়ে কথাটা জোর করে পাড়বে মনোহর।

বিকাল হয়ে আসছে।

ওবাড়িতে যেতে হবে। মনোহর সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, এক্ষুণি মল্লিকমশাইয়ের গাড়ি আসবে।

এখন তার সাহস বেড়ে গেছে। শুভার কাছে সেদিন সব পরিচয় দিয়ে ভালোই করেছে। শুভাও চায় সে দাদুকে একটু খেলাক, মেয়েটার সাহস দেখে মনোহরও অবাক হয়েছে। শুভাও বিচিত্র-রূপিণী একটি মেয়ে।

এ যেন এক খেলা। মনোহরের মনে হয় বিরাট পৃথিবীতে সবাই এমনি লুকোচুরি খেলাই খেলে চলেছে। কোন্‌টা যে তার আসল রূপ তা কেউ-ই জানে না। কেবল দিন কাটানোর তাগিদে রূপ বদলাচ্ছে সবাই।

নিজেকেই চেনে না মানুষ, নইলে সিধু মল্লিকের মত ঘড়েল ব্যবসাদার

মানুষও এক জায়গায় এত দুর্বল! শুভার মত তেজী মেয়েও মনোহরের মত একটা ছেলেকে প্রশ্রয় দেয়, তারকানন্দের মত ধূর্ত বদমাইস লোকও এমনি সাধু সেজে লোককে ঠকায়, মোহিতের সেই আগেকার ভালোবাসাটাও মনে হয় একটা ক্ষণিক দুর্বলতা। ভালোবাসতে পারে না মানুষ, নইলে এত শীঘ্রি তাকেও ভোলাবার চেষ্টা করে কেন!

চারিদিকে শুধু প্রতারণা আর রূপবদলের পালা—খেলা, মনোহরের কাছে এইটাই আজ সবচেয়ে বড় হয়ে ঠেকেছে। এত রূপবদলের মাঝে মানুষের মনও বিভ্রান্ত, কোনটাকে সে আসলে চায়, ভালোবাসে তাও জানে না। তাই বোধহয় এই দুঃখ, বেদনা।

বিকেলের আলোটুকু অন্ধকার হয়ে নামছে। সামনের রাস্তায় আলো-গুলো জ্বলে উঠছে। এমনি রাজ্য জোড়া তমসার মাঝে মানুষও যেন বিভ্রান্ত। সব সাধুচিন্তা-কল্পনা তার মন থেকে মুছে গেছে। নইলে মোহিতকে দেখেছে, লাবণ্যকে সে ভুলে গেছে একেবারে। কে জানে তার মনে এখন অন্য কোন মেয়ে বাসা বেঁধেছে কিনা? মনোহর সেটা সহ্য করবে না। এত পাপ আর প্রতারণাকে সে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে ওই একটি কারণেই। সে মত বদলায়নি, লাবুদিকে এখানে আনবে, তার ঘর বাঁধবে, তাই এসব করে চলেছে। রূপ বদলালেও সে মত বদলায়নি অন্য সকলের মত।

কড়া নাড়ছে। নিজে দরজাটা খুলে দেয়। সিধু মল্লিক ঢুকছে। ওর দিকে চেয়ে থাকে মল্লিকমশাই। দরদভরা কণ্ঠে বলে,—এত মনমরা হয়ে আছো কেন, মনু?

মেয়ে-বেশী মনোহার ওর দিকে ডাগর দু' চোখ মেলে চাইল। সিধু মল্লিক একটা ভেলভেট মোড়া বাক্স বের করে বলে,—দেখ দিকি এটা তোমায় কেমন মানায়!

সুন্দর একটা সোনার ব্যাণ্ড দেওয়া লেডিজ রিষ্টওয়াচ। মনোহরের হাসি জাগে। সেও লাস্যময়ী ভঙ্গিতে ঘড়িটা নিয়ে হাতে পরে বলে ওঠে;—চমৎকার হয়েছে কিন্তু!

সিধু মল্লিকের দু' চোখে রাজ্য জয়ের নেশা।

—চোখ আমার আছে মনু। চলো একটা ছবি দেখতে যাবো আজ। খুব ভালো বিদেশী ছবি।

—ছবি! ওদিকে শুভা বসে থাকবে। মনোহর জবাব দেয়।

—থাকুক একটু, ছবি দেখেই না হয় একবার যাবে। বুঝলে, বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় আর টিকতে পারি না!

—কেন?

সিধু মল্লিক গদগদ কণ্ঠে বলে,—তোমার কথাটা মনে পড়ে। তাছাড়া ওই বাড়িতে কালীকেত্তনের হুঙ্কার আর গর্জন ভালো লাগে না। কি ঝামেলা বল দিকি!

বলে মনোহর,—আমারও বিশ্রী লাগে আপনার গুরুদেবকে। কবে যাবেন উনি? অনেকদিন এসেছেন, এইবার যান।

সিধু মল্লিকও তাই চায়। খরচার মাত্রা বেড়ে চলেছে, তারপর তারকানন্দের আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা শুনে মনে মনে প্রমোদ গনেছে সে। আপদ বিদায়ও হয় না, গেলে এইবার নতুন করে আবার সংসার পাতবে সিধু মল্লিক। তাই বলে,—দেখা যাক্ কবে যায়! শুভাও তাই বলছিল।

—চলো, ওদিকে দেরী হয়ে যাবে। মানে ছবি আরম্ভ হয়ে যাবে। একটু ছবি দেখে তারপর না হয় যাওয়া যাবে ও বাড়িতে।

মনোহর মনে মনে হাসে। রূপবদল করে সে মানুষের অন্ধকার অতলের দিকটাকেই জেনেছে, সে আসলে লোভী—ভণ্ড আর মেকি। আসল রূপ টুকু দেখেছে, ত বেদনা আর দুঃখে বিবর্ণ।

মনু উঠে দাঁড়াল, বলে চলেছে,—এভাবে আর ভালো লাগে না!

সিধু মল্লিকের মনের কথা সে বোধহয় জেনেছে। সিধু মল্লিকের মুখে হাসির আভা জাগে। বলে চলেছে,—আর ক'টা দিন সবুর কর মনু, ভগবানের ইচ্ছা হলেই আমাদের দু'হাত এক হয়ে যাবে। শুভারও একটা বিয়ে লাগিয়ে দিই, ব্যস তারপর—

মনু বলে,—কিন্তু দাদার একটা ব্যবস্থাও করা দরকার। একটা ট্যাক্সি করবো বলছিল, ওটা না করে, বিয়েই করবে না সে। তাকে ফেলে যাই কি করে?

মনু পাকা মেয়ের মত কথা বলছে। সিধু মল্লিকের কাছে এসব নস্যি! অতি সহজ ব্যাপার। কোথায় কোনখানে তেল দিলে চাকা সচল হবে তা জানে সে। ওর কথায় সিধু মল্লিক বলে,—ওসব হয়ে যাবে মনু। ট্যাক্সি মাহিতের করে দেবো। তুমি বলছ, তোমার দাদার গাড়ি হবে না? পনেরো দিনের মধ্যেই গাড়ি হয়ে যাবে। টাকাটা দিয়ে দেবে ব্যস! চালাক না ট্যাক্সি।

মন্থ ওর দিকে আশাভরা চোখ দিয়ে চেয়ে থাকে, ওকে কাছে টেনে নেব চেষ্টা করে বুড়ো।

মন্থ-রূপী মনোহর মধুর ভঙ্গীতে বলে,—ছবির বুঝি এখন দেরী হয় না?

সিধু মল্লিকের বাঁধানো দাঁতে হাসি ফুটে ওঠে! দু'জনে বের হয়ে গেল

মোহিতের মনে সেই সুরটা আবার জেগে উঠেছে। এতদিন পর তার মনে হয়েছে আবার নতুন করে ঘর বাঁধবে সে। তাই সারা মনে নীরব একটি সাড়া জাগে, কল্পনার জাল বোনে সে একজনকে কেন্দ্র করে, সে লক্ষ্মী!

কেষ্টোও খুশী হয়েছে মনে মনে। তবু তার বোনের বিয়েটা যদি হয়ে যায় তারই সুবিধা হবে। এখন তার কাজ ছাড়াও ওভার-টাইমও জুটছে। কেষ্টোর বাড়িতেও তাই অভাবের ছায়াটা সরে গেছে। একটু শান্তি নেমেছে। ছেলেগুলো এখন খেতে-পরতে পায়। লক্ষ্মীই বড় ভাইপোটাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে, নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে যায়। মলিনা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। এতদিন অভাবের কালোছায়াটা তাদের সবকিছু গ্রাস করেছিল। এখন সেটা কেটে গেছে। কেষ্টোও খুশি মনে বাড়ি ফেরে, সেই বকাবকি চীৎকার নেই এখন। বাড়িতে একটা শান্ত পরিবেশ গড়ে উঠেছে। কথাটা মনে মনে ভাবে সে। একদিন সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। লক্ষ্মীর তাই কদর বেড়েছে এবাড়িতে। কিন্তু মনের অতলে কেষ্টোর বৌ মলিনা তবু মনে মনে লক্ষ্মীকে কোথায় হিংসা করে। এটা নারীমনের সহজাত অসূয়া।

লক্ষ্মী এমনিতেই একটু স্বাধীন প্রকৃতির। এর আগেও সে বাড়ির অভাবের জন্য নিজের হাতের কিছু জামা, ফ্রক ইত্যাদি দোকান থেকে কাপড় এনে তৈরী করতো, সেগুলো আবার তাদের দিয়ে আসতো, মজুরী বাবদ যা পেতো তাতেই চলে যেতো তার নিজের খরচ। এখনও নিজে বসে থাকে না।

এখনও বের হয় সেই সব কাজের চেষ্টায়। লক্ষ্মীর লাস্যময়ী রূপ যে কোন দোকানদার বা তার কর্মচারীদের মনে ঢেউ তোলেনি তা নয়। তার ছোঁয় এবাড়িতেও এসে লাগতো। এখনও অনেকেই মালপত্রের তাগাদার অছিলায় আসে এখানে।

মলিনা গজ গজ করে।

—এসব কেন বাবা! কত জনকে ঘোরাবি লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী হাসে বৌদির কথা শুনে।

—আমি কি ওদের ঘোরাই? ওরা যদি নিজে থেকেই ঘোরে আমি কি করবো?

—মোহিতবাবুকেও কি ঘোরাচ্ছিস?

লক্ষ্মী খিলখিলিয়ে হাসে। এ হাসির অর্থ বোঝে না মলিনা। সর্বাঙ্গ তার জ্বালা করে। বলে সে,—এত হাসিস্ না! লোকে কি বলে শুনেছিস্?

লক্ষ্মীর রূপের ঐশ্বর্য আছে—স্বাস্থ্যের নিঁলোটতায় তা পূর্ণ। তাই ওসব কথা হেসে উড়িয়ে দেয় সে। মলিনা তবু সাবধান করে,—একটু সহবৎ শেখ!

লক্ষ্মীর মনের অতলেও এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও মোহিতের জন্য একটু ঠাঁই রয়ে গেছে। সেও দেখেছে এ ঘোরার শেষ নেই। শাস্তি নেই এ পথে। তাই একটু শাস্তিময় আশ্রয়ের স্বপ্ন দেখে সে মোহিতকে কেন্দ্র করে। জীবনে সেইটুকুই তার সবচেয়ে বেশী পাওয়া।

মোহিতও এমনি সময়ে না এসে পারে না। মাঝে মাঝে মোহিতের মন খুশীতে ভরে ওঠে। ওদিকে ট্যাক্সির পারমিট হয়ে যাবে এইবার। মল্লিকমশাই নিজেই ব্যাপারটায় হাত দিয়েছে। মোহিত আজ সন্ধ্যায় লক্ষ্মীকে নিয়ে একটু বেড়াতে বের হয়েছে।

ক'দিন থেকে কথাটা ভাবছিল, বলার সময় পায়নি। আজ কোনরকমে অবকাশ করে বের হয়েছে দু'জনে। মোহিতের কাছে এ একটা বিলাস, তার একক শূন্য জীবনের এই শূন্যতাটা আজ ওকে দিয়ে পূর্ণ করতে চায়।

ঘরের মধ্যে শুধু দারিদ্র্যের প্রকাশ। অভাব আর অভাব। বাইরে তবু প্রাচুর্যের ঝলক চোখে পড়ে, মনে হয় বাঁচা যায় তবু এত বড় পৃথিবীতে।

মাঝে মাঝে তারা বের হয়। আলো ঝলমল জগৎ। এখানে অভাব নেই। প্রাচুর্য আর তারই সদম্ভ প্রকাশ। মোহিতও আজ দম্‌কা কিছু খরচ করে বসেছে।

লক্ষ্মীর ভালো লাগে।

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে তারা—লক্ষ্মী আর মোহিত। তারা আজ অন্য জগতের মানুষ।

লক্ষ্মীর সাজবেশও বদলেছে, মোহিতই তাকে জোর করে ভালো শাড়ি জামা জুতো কিনে দিয়েছে।

লক্ষ্মীও তাই পছন্দ করে সেজেছে। কায়দা করে সেও আজকাল ছুরি কাঁটা ধরতে শিখেছে রেস্তোরাঁয় বসে। দু'চোখে হাসির আভাস।

মোহিত বলে চলেছে।

—গাড়িটা হলে বাঁচি। চাকরী আর ভালো লাগছে না।

লক্ষ্মী হিসেব করে সব কথাই বলে,—হুট করে চাকরী ছাড়বে না কিন্তু শুনেছি অনেকেই তো একখানা ট্যাক্সী করে তার থেকে দু'খানা কেনে তোমার তো চেনা ড্রাইভার আছে তাকে দিয়ে চালাবে।

মোহিতের মনেও কথাটা সাড়া তোলে। মোহিত সেই স্বপ্ন দেখে। খান দু'য়েক গাড়ি হলেই গুছিয়ে নেবে সে। মোহিত বলে।—দেখি। টাকার ব্যবস্থা করে জমা দিয়ে দিতে পারলেই ব্যস! চাকরী অবশ্য এখন করতেই হবে।

লক্ষ্মী বলে গলা নামিয়ে,—বৌদি, দাদা এদের কিন্তু এসব জানিয়ো না। বৌদিটা কিন্তু ভারি হিংসা করে মনে মনে। আরে বাপু, কাউকে যদি ভালো-বাসলাম, তোর তাতে কি!

মোহিতের মনে লক্ষ্মীর ওই আপনকরা কথাগুলো ভারি মিষ্টি ঠেকে। কানের কাছে সুর ওঠে।

লক্ষ্মী বলে চলেছে,—তোমার ভালো হোক এটা ও চায় না। আমার তাতে ভালো হবে যে! বুঝলে না?

রেস্তোরাঁর ওপাশে লোকজনের কর্মব্যস্ততার ছবি ফুটে উঠে। বাতাসে ওঠে মাংস রান্নার মিষ্টিগন্ধ। কেউ দামী শাড়ির আঁচলটা নামেমাত্র গায়ে ফেলে চলেছে। ওদের দেহের সব রেখাগুলোই প্রকট হয়ে ওঠে কামনার উন্মত্ততায়।

লক্ষ্মীর এসব ঠিক ভালো লাগে না।

—দেখেছো ওদের কাণ্ড!

মোহিত হাসছে ওর কথায়।

—তুমি বড্ড সেকেলে।

—তাই ভালো। তুমি কি ওসব পছন্দ করো নাকি?

মোহিতের মন যেন ওই লক্ষ্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। ও তার একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। লক্ষ্মীও মোহিতের দিকে চেয়ে থাকে। বলে চলেছে লক্ষ্মী,—মনে হয় ওবাড়িতে দম বন্ধ হয়ে আসবে আমার।

মোহিতের হাতখানা ওর হাতে। দু'জনে কি যেন স্বপ্ন দেখছে। একটি নীড়ের ছবি।

সিধু মল্লিক আর মনু-রূপী মনোহরও ছবি দেখে এইখানের একটা কেবিনে এসে ঢুকেছে। মনুর দিকে চেয়ে থাকে সিধু মল্লিক। বয়স হয়েছে তার। এসব গুরুপাক কাটলেট্, ফ্রাই সহ্য হয় না। এক গ্লাশ লাইমজুস নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে, মনুর প্লেটে একটা বড় কাটলেট্! ওপাশের প্লেটে স্যালাড।

মনোহর মোহিতের গলাটা চিনতে পারে ওপাশের কেবিনে।

মোহিত আর একটি মেয়ে, দু'জনে নিভৃতে একটি রেস্তোর াঁয় কি যেন আলাপ করছে তন্ময় হয়ে। মনোহর চমকে ওঠে, ওদের কথারও কিছুটা কানে আসে তার। মনোহর এ ব্যাপারটা জানতো না। মোহিত তাকে কিছুই বলেনি।

সিধু মল্লিকও কথাটা শুনেছে। মনে মনে চটে উঠেছে সে। বিপদেও পড়েছে এখানে এসে।

গজ গজ করে সিধু মল্লিক,—প্রেমালাপ হচ্ছে! মজা দেখাচ্ছি!

উঠতে যাবে, মনুর হাতের ছোঁয়া পেয়ে থেমে গেল সে। মনু বলে ফিসফিস্ করে,—আপনিও আমাকে নিয়ে বের হয়েছেন! যদি দেখে ফেলে দাদা!

থেমে গেল সিধু মল্লিক। মনোহর কান পেতে ওদের কথাগুলো শুনে চলেছে। সে এতদিনে বুঝতে পারে মোহিতের এই মত বদলাবার কারণ। ওই মেয়েটার জন্যই সে লাবণ্যকে ভুলতে পেরেছে। তার কথা সবই বলেছে মনোহর। মোহিত তবু কোন জবাব দেয় নি লাবণ্যের সম্বন্ধে।

মোহিতের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ওপাশের কেবিন থেকে। উৎকর্ণ হয়ে শুনছে মনোহর সেই কথাগুলো।

—এভাবে আর তোমাকে পড়ে থাকতে হবে না লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী পাকা মেয়ের মত সহজ স্বরেই বলে,—তারই ব্যবস্থা কর বাপু!

স্তব্ধ হয়ে গেছে মনোহর। তার কাছে আজ মোহিতের মনের বিচিত্র একটা দিক প্রকাশিত হয়। ওই মেয়েটিকে নিয়েই সে আজ নতুন করে ঘর

বাঁধার কথা ভাবছে। আর মনোহরকে সেই কাজের জন্য এই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে হচ্ছে। এসব জানলে মনোহরও এত দূর এগোতো না। মনে হয় মোহিতই তাকে ঠকিয়ে চলেছে, এ তার অন্য রূপ। ওদের কেবিন থেকে ওরা দু'জনে চেয়ার ঠেলে উঠলো। বের হয়ে যাচ্ছে খাওয়া-দাওয়ার পর। পরদার একপাশ থেকে মনোহর মেয়েটিকে দেখতে পায় একনজর। ওর সাজবেশ ওর ভালো লাগে না। হাসছে মেয়েটি। সহজভাবেই ওরা দু'জনে বের হয়ে গেল।

সিধু মল্লিক গজ গজ করে,—এই সব হচ্ছে মোহিতটার!

মনোহর হাসছে। মল্লিকমশাই জিজ্ঞাসা করে,—হাসছো যে!

—বা রে! হাসবো না! কাউকে প্রেম করতে দেখলেই আমার হাসি পায়! বুঝলেন বড্ডো হাসি পায়!

—কেন?

মনোহর হাসিভরা স্বরেলা কণ্ঠে বলে,—মনে হয় কেমন মিথ্যা কথাগুলো সহজভাবে বলেছে। কত স্বপ্ন—সব কিছু মিথ্যা!

মল্লিকমশাই ওর হাতখানা ধরে বলে,—তোমায় কিন্তু মিথ্যে কথা বলিনি মনু, সিধু মল্লিক এমন ফেকলু পার্টি নয়। আর একটা কাটলেট্ দিক্? একটা ফ্রাই!

মাথা নাড়ে মনোহর।

—না! না! চলুন ওদিকে শুভা আবার কি ভাববে?

সিধু মল্লিক বলে ক্ষুণ্ণ মনে,—আমার চেয়ে ওই শুভার কথাই বেশী ভাবো দেখছি মনু! ওকেই মনে পড়ল এখন?

—না! না! মনোহর হাসি চেপে বুড়োকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে,—কাজের কথা কিনা, আপনি আবার কাজ খুব ভালবাসেন; তাই বলছিলাম। চলুন।

গাড়িতে উঠে চলেছে, ভিড়ের মধ্যে ওদিকের ফুটপাথে দেখা যায় মোহিত আর সেই মেয়েটি একটা পানের দোকানে পান কিনছে।

মনোহর মেয়েটিকে দেখেছে, অজানতেই তার লাবণ্যের কথা মনে পড়ে। অসহায় একটি মেয়ে কোন অন্ধকারে দূর শহরে কি কষ্টের মধ্যে পড়ে আছে। আজও সে মোহিতের কথাই ভাবে।

অথচ মোহিত তাকে ভুলে গেছে একেবারে।

মনোহর মনে মনে শক্ত হয়, মোহিত ভুল করছে। ওই মেয়েটির মধ্যে

আজ কি আছে জানে না, তবে মনে হয় মনোহরের, সামান্য কিছু নিয়ে মেয়েটি সুখী হবে না, ওর চোখে-মুখে এই উজ্জ্বল শহর-জীবনের প্রতি মুগ্ধ স্তব্ধ দৃষ্টি, সে চায় অনেক কিছু।…

লাবণ্যদির তুলনায় সে অনেক তুচ্ছ। তার মুখে দেখেছিল মনোহর তৃপ্তির আভাস। মোহিতের পয়সার লোভেই জুটেছে ওই মেয়েটি। মোহিতও ঠকবে। ওই মেয়েকে নিয়ে সুখী হবে না সে। মোহিতের এ ভুল সে ভাঙবে একদিন। কিন্তু লাবণ্যদি! তার কথা মনে পড়ে।

—কি ভাবছ মনু?

সিধু মল্লিক ওর কাছে এগিয়ে এসেছে। রাস্তার আবছা আলো পড়েছে বুড়োর মুখে।

মনোহরের বিরক্তি লাগে। কিন্তু উপায় নেই। গাড়িতে সরে বসল সে, জবাব দেয়,—কই না তো! ময়দানের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। কি মিষ্টি রাত! খুব সুন্দর, না?

সিধু মল্লিক বাঁধানো দাঁত বের করে হাসে—সত্যি!

আজ সবই তার কাছে সুন্দর লাগে।

শুভার ভালো লাগে না সন্ধ্যাটুকু। এতবড় বাড়িতে সে একা। ওদিকে তারকানন্দের দল মহাসমারোহে কালী-কীর্তন চালিয়েছে। তারই উদ্দাম শব্দ কানে আসে।

শুভার দিন কাটে বিরক্তির মধ্যে, তবু সন্ধ্যার সময় মনোহর আসে। ছেলেটিকে প্রথম দিন থেকেই কেমন ভালো লাগে তার।

সহজ সরল একটি তরুণ, তেমনি সুন্দর চেহারা। শুভার ওই সময়টুকু কোনদিকে কেটে যায় জানে না। সারাটা দিন ওই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে থাকে। বাইরে বড় একটা বের হয়না সে। সিধু মল্লিকের এসব দিকে কড়া নজর। মেয়েরা ধেই ধেই করে রাস্তায় বেরুবে এটা সে চায় না। এ নিয়ে শুভাকে অনেক হিতোপদেশ দিয়েছে সে। শুভারও ভালো লাগে না বেরুতে। জীবনে অনেক কামনাই তার ছিল। হঠাৎ সেই কল্পনা-রঙ্গীন মন নিয়ে ওই মনোহরকে সে আবিষ্কার করে। শুভার মত মাথাসোজা মেয়ের কাছে ওরা ভালোই।

মনোহরের রূপ আছে—বাধা নেই। বিনয়ী ভদ্র একটি ছেলে। জীবন সম্বন্ধে সচেতন, অথচ কথাবার্তায় একটা মিষ্টি ভাব ফুটে ওঠে, শুভার ভালো লাগে। নিজেকে আজ চিনেছে সে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে যেন কোন কারাগারে বন্দিনী রাজকন্যা। তার মনের শূন্যতাটাকে আজ বড় করে দেখে।

প্রাচুর্য আছে, অভাব নেই।

তবু ভালো লাগে না এই বন্দী জীবন। মুক্তির আশ্বাস এনেছে ওই মনোহর তার মনের কানায় কানায়।

নিজেরই হাসি পায় যেদিন প্রথম তাকে দেখে। আশ্চর্য হয়েছিল তার সাহস দেখে, কিন্তু তাকে সে প্রতারণা করেনি।

শুভা হঠাৎ কার ডাকে বের হয়ে এল তার ঘর থেকে। বারান্দায় কে ডাকছে তাকে।

তারকানন্দের চেলা একজন এসে বলে,—বাবা আপনাকে যেতে আদেশ করলেন ওর কাছে।

কথাটা শুনে বিরক্ত হয় শুভা। লোকটাকে সে সহ্য করতে পারে না। তার আদেশ মান্য করতেও তার কোন তাড়া নেই। তবু প্রশ্ন করে শুভা,—কেন?

ভক্ত সবিনয়ে নিবেদন করে,—বেতোড় থেকে তাঁর একজন ভক্ত এসেছেন, মহাদেবের অবতার।

শুভা কথাটা শুনেছিল, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে ওই দানবটার অত্যাচারে।

জবাব দেয়,—আমার যাবার সময় হবে না, দাদু নেই। তিনি এলে যাবো। যান, আপনার গুরুদেবকে বলেন গে।

তারকানন্দ কথাটা শুনে গুম হয়ে কি ভাবছে। সে নিজেই তোড়জোড় করে বেতোড়ের সেই ভক্তটিকে আনিয়েছে; একবার চেষ্টা চরিত্র করে সিধু মল্লিকের বাড়ি থেকে নাতনীটাকে তাড়াতে পারলেই সে এখানে জুড়ে বসবে, সেই মতলবেই এসব কাজ করে চলেছে।

কিন্তু চেলা ফিরে এসে কথাটা জানাতেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে তারকানন্দ। —এলো না মেয়েটা?

রাগলে তারকানন্দের চোখ দু'টো টান দেওয়া গাঁজার কলকের মত দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার থেমে যায়। রাগটা প্রকাশ করে না। সাপের চেয়ে ক্রুর সে, রাগের জ্বালাটা মনে মনে পোষে, মুখে শুধু হুঙ্কার ছাড়ে।

—তারা, ব্রহ্মময়ী মা! সিধু বাবাজী আছে বাড়িতে?

চেলা নতমস্তকে জানায় সে নাতনীর ওই জবাব শুনে মল্লিকমশাইয়ের খোঁজ করতে গিয়েছিল, কিন্তু দেখেছে তিনিও বাড়িতে নেই। কথাটা নিবেদন করতে তারকানন্দের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।

—সিধুও নেই!

সারা ঘরে একটা স্তব্ধতা জাগে। তারকানন্দ চুপ করে কি ভাবছে। মহা ধুরন্ধর লোক, তার কাছে সবই কেমন উল্টো-পাল্টা ঠেকে এবার।

সিধু মল্লিকের ক'দিন থেকেই ভক্তির অভাব দেখেছে তারকানন্দ। সকাল সকাল বাড়িও ফেরে না, তাছাড়া সেবার দিকেও নজর নেই। খাওয়ার তোড়-জোড়ও কমে এসেছে। সব দিকেই সিধুর নীরব অবহেলার ভাব ফুটে উঠেছে।

তার উপর ওর নাতনীর এই কথা শুনে চটে আগুন হয়ে ওঠে তারকানন্দ। একটা হেস্ত-নেস্ত সে করতে চায় আজ। এমনি সময় সিধু মল্লিকের আবির্ভাব।

সিধু মল্লিক বেশ খুশী ভরা মন নিয়েই ফিরেছে। তারকানন্দের ঘরের সামনে আসতেই তারকানন্দ বেশ গম্ভীর স্বরে হাঁক দেয়।

—সিদ্ধেশ্বর! শুনে যাও।

ক্ষুণ্ণ মনে সিধু মল্লিক ঘরে ঢুকতেই তারকানন্দ বলে ওঠে,—তোমার নাতনীর মতিচ্ছন্ন ঘটেছে। তারই বা দোষ কি! তোমারও দেখছি দেব-দ্বিজে-গুরুতে ভক্তি নেই। বলো—তাহলে তোমার মঙ্গলচিন্তা ছেড়ে শ্মশানেই ফিরে যাই। এখানে থাকার দরকার কি? হঠাৎ শিবনেত্র হয়ে বলে চলে,—কি পাগলী—হাসছিস? বল তোর কি মত, বল?

তারকানন্দ শিবনেত্র হয়ে অদৃশ্য সেই মহাকালীকে প্রত্যক্ষ করে কথাবার্তা বলতে চায়। চেলারাও জোড়হাত করে বসে আছে।

সিধু মল্লিকও ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে—গুরুদেব!

হাসছে তারকানন্দ,—এ্যাঁ! সইবো? বলছিস? বল, কত সইবো পাগলী! এর চেয়ে শ্মশানেই যে আনন্দে থাকি মা। গৃহে শান্তি নেই। সিদ্ধেশ্বর তুমি সাবধান হও!

সিধু মল্লিক জীবনে অনেক কিছু পেয়েছে অন্যায়ভাবেই। তার আশাতীত ভাবেই পেয়েছে সে। তাই স্বভাব তার ভীরু। সে ত্রুটি শোধরাবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে।

বলে সে,—ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বাবা। ওরে—বাবার প্রসাদের জন্য মাংস আন, আর বিলাতী কারণ দু'বোতল। তারকানন্দ হাসছে।

—পাগলী! তুই দয়াময়ী। যাঃ বললি—ক্ষমা করলাম সিধুকে। ছেলে-মানুষ। তবে সিদ্ধেশ্বর—তোমার নাতনীকে সাবধান করো।

সিধু মল্লিক সে কথাটা জানে। তাই বলে,—আমার কথা যে শোনে না বাবা।

তারকানন্দ বলে ওঠে,—ওই তো রোগ। না শোনে জোর করে শোনাও। তার মাথায় কু-গ্রহ ভর করেছে। মতিভ্রম হয়েছে, তুমি তাকে পথ দেখাও।

সিধু মল্লিকও আজ নাতনীকে বিয়ে-থা দিয়ে এ বাড়ি থেকে সরাতে চায়। কিন্তু মত করে না শুভাই। তারকানন্দ বলে,—ও কিন্তু তোমাকে অনেক বেগ দেবে। পরের ঝামেলা কত বইবে সিদ্ধেশ্বর? মা বলছেন ওকে বিদায় করে তুমি শান্তি পাবে।

সিদ্ধেশ্বর মল্লিক কি ভাবছে। তারকানন্দ যেন অন্তর্যামী। বলে চলেছে সে,—বেশ তো, তোমার কামনা-বাসনা থাকে, ওকে বিদায় করে পূরণ করো। আমার আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়ে যাক—ততদিনে তুমিও সংসারের সাধ মিটিয়ে নিয়ে, মায়ের কোলে ফিরে আসবে। তবে আপাততঃ ওই বোঝাটিকে সরাবার ব্যবস্থা করো।

শুভাও আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে জানে তারকানন্দ রেগে আছে তার উপর। দাদু আসতেই তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি কথা বলছে তাই শোনার জন্যই ওপাশে দাঁড়িয়েছিল সে।

কথাগুলো কানে যেতেই শুভার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে।

দাদুর উপরও রাগ হয়, কেন মুখের উপর বলতে পারলো না সে—যে তারকানন্দই এ বাড়ি থেকে চলে যাক! সব চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনল মাত্র দাদু।

শুভাই যেন এ বাড়ির বোঝা! মা-বাপ মরা মেয়ে। এতদিন আদরেই লালিত-পালিত হয়েছে, আজ বাইরের ওই ছন্নছাড়া লোকটা তাকে এইসব কথা শোনাবে এটা শুভার নিজেরই কাছে বিশ্রী ঠেকে।

সরে এল নিজের ঘরে।

তখনও গানের দিদিমণি সেই মেয়েবেশী মনোহর আসেনি।

সিধু মল্লিক আর সে এক সঙ্গে বাড়ি ঢোকে না। সে আগেই এসেছে।

শুভা একা চুপ করে বসে আছে, সিধু মল্লিককে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইল। সিধু মল্লিক জিজ্ঞাসা করে শুভাকে,—কি বলেছিলি গুরুদেবকে? চটে গেছেন উনি।

শুভা অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে,—কোথাকার কে আসবে তার সামনে
মাকে যেতে হবে ? না গেলেই আমি খারাপ ? আর তোমাকেও বলি
মার গুরুদেবই বা আমাকে যখন তখন, যার তার সামনে ডেকে পাঠাবেন
ন ? তার সেবার কোনো তো ত্রুটি হয়নি।
সিধু মল্লিক নাতনীর দিকে চেয়ে থাকে। রেগে উঠেছে সে। এসব
লো লাগে না সিধু মল্লিকের।
—তাই বলে অপমান করবি ?
—অপমান করিনি। বলেছিলাম পরে যাবো, তুমি এলে। আর
মাকেও বলি, আমার সম্বন্ধে যা-তা বলবে, তুমি একটি কথাও বলবে না ?
বাড়িতে কার জোর বেশী—আমার না ওই গুরুদেবের তাও বুঝেছি। বেশ।
সিধু মল্লিকের তবু রাগ যায় না। বলে সে,—তবু আমার মুখ রেখে
বার গিয়ে শুনতে হবে কথাটা।
শুভা চটে ওঠে,—যদি না শুনি ?
—এ বাড়িতে থাকতে গেলে আমার কথা মানতে হবে। এই আমার
কুম, তোকেও বলে দিলাম।
সিধু মল্লিক বেশ কড়া হবার চেষ্টা করে। শুভাও চটে ওঠে। জবাব দেয়।
—এতই যদি বোঝা ঠেকে বল আমার পথ আমিই আমিই দেখে নোব।
মার গুরুদেবকে নিয়ে তুমি থাকো।
কথাগুলো শুনেছে মনোহরও। সেও ঘরে ঢুকে পড়েছে এই সময়। পরণে
র মেয়েছেলের পোষাক।
দাদু-নাতনীর কথাগুলো শুনছে সে। সিধু মল্লিকও কড়া স্বরে তখনও
র্জাচ্ছে।
—আমার কথা তবু শুনতেই হবে !
আরও কি যেন বলবে সে, মনুকে দেখে থামল। সহজ হবার চেষ্টা করে
ধু মল্লিক। এ যেন অন্য মানুষ।
—এসেছো তুমি ! দেখ যদি গানটান শেখে। ভালো কথা তো মেয়ে
বে না ? তুমি একটু বুঝিয়ে বলো মনু।
চুপ করে থাকে শুভা। মুখচোখ তার রাঙা হয়ে উঠেছে।
মল্লিকমশাই বের হয়ে গেল। শুভার যেন কান্না আসে। আজ মনে হয়
পৃথিবীতে সে একা। বাবা মা তার কেউ নেই। তখনও বাইরে

থেকে তারকানন্দের কালী-কীর্তনের বিকট হুঙ্কার ভেসে আসে। ওরা শুভাকে আজ ব্যঙ্গ করছে ওই গর্জন তুলে।

সিধু মল্লিকের নিবেদন করা মাংস আর বিলাতী কারণ-বারির প্রভাবে নতুন উদ্যমে সে লেগেছে আবার।

সিধু মল্লিকও মনে মনে ভরসা পেয়েছে। গুরুদেব তাকে প্রকারান্তরে অভয় দিয়েছে। সে আবার নোতুন সংসারও করতে পারবে সেই কথাও বলেছে।

তাই ভক্তি-যুক্ত হয়ে এসে আসরে বসেছে। কালী-কীর্তনেও যোগ দেয় বেসুরো গলায় চীৎকার করে। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ওই তারকানন্দ। তার কথা ফলে গেলে সিধু মল্লিক ঘটা করে আশ্রম বানিয়ে দেবে। কীর্তন করছে তবু মনে মনে সে ভাবছে মন্থুর কথাই। কি সুন্দর কাজল পরা দু'টো চোখ!...

মনোহর ব্যাপারটা অনুমান করেছে। সিধু মল্লিকও আজ শুভাকে কত কথা জানিয়ে গেল। এতদিন মিশে মনোহর শুভার মনের অতলের বেদনাটাকে চিনেছে। এতবড় পৃথিবীতে ও একা অসহায় একটি মেয়ে। দুঃখ হয় ওর জন্য মনোহরের। বেদনা এখানে সর্বত্র।

—শুভা!

মনোহর ওকে ডাকছে। শুভার দু'চোখে আজ জল নেমেছে দাদুর ওই কথায়। মনে হয় দাদুও আজ তাকে অবহেলা করে।

শুভা বলে,—সবই তো শুনলে। ওই গুরুদেবই ওর কাছে সব। বোঝা মাত্র। আমার মা বাবা যা রেখেছেন তাও কম নয়; মনে হয় যাব বেনারসে, সেখানে বাবার ভিটেতেয় দিন চলে যাবে।

মনোহর ওর দিকে চেয়ে থাকে। শুভা বলে,—মা বাবা যার নেই তার কেউ নেই!

মনোহরও ওকথা বিশ্বাস করে। বলে,—তবু বেঁচে থাকতে হবে শুভা ভালোভাবে বাঁচতে হবে। তারই চেষ্টা করে মানুষ।

শুভা চুপ করে থাকে। ওর জন্য বেদনা বোধ করে মনোহর। শুভা বলে,—ওই তারকানন্দের জন্যই আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। ওই দৈত্যটা দাদুকে নানা রকম কথা বলেছে, আমাকে সেও তাড়াতে চায়। ওর সুবিধে হবে।

মনোহর বসে ভাবছে। হঠাৎ বলে সে,—তারকানন্দকেই এ বাড়ি থেকে দূর করে দিতে পারি।

শুভা ওর দিকে চাইল। অবাক হয়েছে সে।—পারো? দাদু তো ওকে কিছু বলবে না।

—বলার দরকার নেই। আপনিই পালাবে। দাদু বললেও থাকবে না তখন। এ তো অতি সাধারণ ব্যাপার।

শুভা ওর হাতটা আবেগ ভরে চেপে ধরে। তার সব সমস্যার সমাধান হবে, তার অপমানের জবাব দেওয়া হবে! ব্যাকুল হয়ে বলে শুভা,—পারবে তুমি!

মনোহর হাসতে থাকে,—এ আর এমন কঠিন কাজ কি! আজ রাত্রেই দেখা যাক!

শুভা পরম আশা ভরে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

তারকানন্দ আজ বেদম উৎসাহে কালী-কীর্তন সুরু করেছে। অমাবস্যার রাত্রি! তাছাড়া ভোগ রাগের ব্যবস্থাও জোর করেছে সিধু মল্লিক। বেতোড়ের সেই মহাদেবের অবতারও গাঁজায় দম দিয়ে চোখ কপালে তুলে বসে আছে এককোণে।

আজ তাকে এনেছিল তারকানন্দ শুভাকে দেখাবার জন্য। দেখেছেও সে। সুন্দরী একটি মেয়ে। দেখার পর থেকেই দত্ত-কুল-তিলক কেমন ট্যারা হয়ে গেছে। গুরুদেবের পাদপদ্ম আর ছাড়ে না। প্রসাদের মাত্রাও বেড়ে গেছে, আর ভক্তদের আসার খবর পেয়ে সিধু মল্লিকও গুরুদেবের ভোগের বিরাট আয়োজন করেছে অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে।

সমারোহে চক্র অনুষ্ঠান করেছে তারকানন্দ। মধ্যরাত্রি। বাড়ির সব আলো নেভানো।—তারকানন্দ শিষ্যদের সামনে পদ্মাসনে বসেছে। মা অবতীর্ণা হবেন।

ঘরে ধূপ ধুনার গন্ধ উঠেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ।

তারকানন্দের হুঙ্কার শোনা যায়,—মা! কোথায় গেলি মা! আয়—

হঠাৎ ওপাশের বড় জানালাটা খুলে যায়। আবছা আলো অন্ধকারে

একটা দীর্ঘ কালো হাত বের হয়ে আসে, ক্রমশঃ দেখা যায় বীভৎস বিকট একটা মূর্তি। জিবটা তার লাল, অনেকখানি ঝুলে গেছে। এক হাতে একটা খাঁড়া, তাতে রক্তের দাগ, অন্য হাতে একটা নরমুণ্ড ঝুলছে। ওই বীভৎস মূর্তির ছু'চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। ভীষণা মূর্তিটা এগিয়ে আসছে।

ভয়ানক মূর্তি দেখে ঘরশুদ্ধ লোক আর্তনাদ করে ওঠে। ভয়ে কাঁপছে। কেউ বা চীৎকার করে জ্ঞান হারায়।

লাফ দিয়ে উঠেছে তারকানন্দ। মূর্তিটা বিকট স্বরে বলছে,—এখানে ফের এসেছিস? আমার এলাকায়! ভণ্ড কোথাকার!—আমি মায়ের ভৈরবী। তোর মত পাপীকে বলি দিতে মা পাঠালেন। আজ মায়ের রক্তক্ষুধা মিটবে।

তারকানন্দের শিষ্য ভক্তবৃন্দ পালাবার চেষ্টা করছে, এ-ওর গায়ে পড়ে। তাদের উপর দিয়ে টপকে পালাবার চেষ্টা করছে তারকানন্দ। মূর্তিটার চোখ তার উপরই। খাঁড়াটা শূন্যে তুলেছে—তার ঘাড়েই পড়বে—তারকানন্দ সেইখানেই পড়ে গোঁ গোঁ করতে থাকে বিরাট আর্তনাদে!

আলোটাও নিভে যায় এই সময়েই।

একটা আর্তনাদ ওঠে। কে কোথায় রয়েছে তার ঠিক নেই!

সিধু মল্লিক ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কাঁপছে ঠক-ঠকিয়ে।

আলোটা জ্বালতে দেখা যায় সারা ঘরে তাণ্ডব বয়ে গেছে। ছত্রাকার করে ভোগ রাগ ছড়ানো। মূল্যবান মদটা বোতল ভেঙ্গে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওদিকে তারকানন্দের বিকট লাশ মুক্তকচ্ছ অবস্থায় পড়ে আছে।

মুখে চোখে জল দিতে থাকে চেলারা। তাদেরও মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক দেখছে, কে জানে মায়ের সেই ডাকিনী এখনও ধারে কাছে আছে কিনা তাই দেখছে। জলটল দিতে জ্ঞানহীন দেহটা নড়ে ওঠে। পিট্ পিট্ করছে তারকানন্দের ছু'টো চোখ। পড়ে পড়েই চিঁ চিঁ করে কি বলবার চেষ্টা করছে সে। তারকানন্দ সভয়ে এদিক-ওদিক চাইছে। গলা শুকিয়ে গেছে। বলে তারকানন্দ একটু সুস্থ হয়ে,—এ বাড়িতে আর থাকা সম্ভব হবে না সিদ্ধেশ্বর।—মা এখানে হাঁপিয়ে উঠেছেন।

ব্যাপারটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে তারকানন্দের মনে। তার কালীসাধক সাধুর মুখোস খসে পড়েছে। অজানা ভয়ে কাঁপছে সে। এখানে থাকতে আর সাহস হয় না।

একটা দমকা বাতাসে বন্ধ জানালাটা খুলে যেতেই তারকানন্দ অস্ফুট

র্তনাদ করে আবার নেতিয়ে পড়ে। কে জানে ভৈরবী আবার হাজির র কিনা!

এতদিনের সাজা সন্ন্যাসীর মুখোসটা খসে পড়ে। শিষ্যরা মাথায় মুখে জল য়ে বাতাস করতে থাকে। অস্ফুট কণ্ঠে চিঁ চিঁ করছে তারকানন্দ,—দরজা নালা বন্ধ করে দে। ওরে বাবা!

শুভা হাসিতে ফেটে পড়ে। বন্ধ দরজার আড়ালে হাসছে সে। ওদিকে নাহর মুখোস, রং করা টিনের খাঁড়া সেই ভাঁজ করা দীর্ঘ হাতগুলো গুটিয়ে টা ট্রাঙ্কে পুরছে। শুভা বলে হাসতে হাসতে,—মা কালীর চেলা কি ছে?

—মা কালীর চেলা! ডাকিনী দেখেই ভয়ে মূর্চ্ছো গেছে, মা কালীর রূপ খলে তো হার্টফেল করতো! ওর মুখোস খুলে গেছে। বললাম না আমার ত সবাই বহুরূপী। আমি সাজি, ওরাও সাজে। তবে শেষরক্ষা করতে পারে। ধরা পড়ে যায়।

শুভা অবাক্ হয়ে থাকে ওর দিকে চেয়ে, বলে,—খুব বিদ্যে শিখেছো যা াক!

মনোহর বলে,—এই বিদ্যে শিখে ফল হল কি জানো? নিজে আমি কি ধরতেই পারলাম না। তবু কারো উপকার হয় এই আনন্দেই এসব করি! নে হয় মানুষগুলো কত মেকি!

শুভা ওর কাছে এগিয়ে আসে। হঠাৎ বাইবের জানালা দিয়ে চেয়ে বলে ঠে,—দেখছো!

দেখা যায়, ওই রাতের অন্ধকারেই সিধু মল্লিকের গাড়িতে করে তারকানন্দ লাচ্ছে। এ-বাড়িতে আর থাকা চলবে না—এই কথাটাই জেনেছে। তোড়ের দত্ত-তনয়ও পালাতে গিয়ে পা মুচকে পড়েছে। একজন চেলার াধে ভর দিয়ে সে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গাড়িতে উঠছে। শুভাও স্বস্তির নিশ্বাস ফলে। এবাড়ি থেকে আপদ বিদায় হলো এইবার।

তারকানন্দের সব আশা ভরসা আজ রাতেই নির্মূল হয়ে গেছে। প্রাণভয়ে ীত একটি লোভী মানুষ এবাড়ি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে।

হাসছে শুভা। সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে থেকে থেকে মনোহরের গায়ে াসির আবেশে লুটিয়ে পড়ে।

মনোহর সরে দাঁড়াল। তার মনেও যেন চকিতের জন্য ঝড় ওঠে। নিজে

সে জীবন-নাট্যের দর্শক, তাছাড়া কোন ভূমিকা তার নেই। তাই বলে, রাত্রি হয়ে গেছে। আমি চলি! ওরা ব্যস্ত আছে, এই বেলা বের হয়ে যাবে

শুভা ওর দিকে চাইল,—এত রাত্রে?

—রাত-বিরেতে ঘোরা অভ্যাস আছে। পথের মানুষ পথে তাদের ভয় নেই শুভা।

শুভা লোকটাকে তবু অজান্তে কেমন ভালবেসে ফেলেছে। তার চিন্তাও করে সে, ব্যাকুলতা বোধ করে।

নিজের কাছেই নিজের এসব বিচিত্র ঠেকে। শুভা বলে,—কাল স্যুটকেস পাঠিয়ে দোব।

—না হলে আসবো কি করে? পোষাক তো এরই মধ্যে!

হাসতে থাকে মনোহর।

বের হয়ে এসে দেখে তারকানন্দের ভক্তবর্গ তখনও মালপত্র নিয়ে গুরুদেবের অনুগামী হচ্ছে। তাদের ভিড়ে মিশে মনোহরও বের হয়ে এল পথে

পথে আঁধারে কোথায় বেরিয়ে যায় মানুষটা।

মোহিত তখনও ঘুমোয় নি। মনোহর এত রাত করে না! থিয়েটার থাকলে বলে যায়। আজ হঠাৎ ওর রাত্রি করা দেখে ভাবনায় পড়েছে মোহিত। মনোহরকে তার দরকার। এখনও কথা সারা হয় নি। ওই ছেলেটা তার ভাগ্য বদলে দিয়েছে।

আকাশে মেঘ নামছে—ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। মোহিত জানালার বাইরে চেয়ে থাকে। গাড়ির পারমিট পেয়ে গেছে—টাকা জমা দিতে হবে। বুড়ো সিধু মল্লিকের হাত থেকে টাকা বের করা চাট্টিখানি কথা নয়।

মনোহরকে তার দরকার। কথাটা চুকিয়ে ফেলেই গাড়ি বের করে আনবে। প্রথম দিনই সে আর লক্ষ্মী যাবে কালীঘাটে পূজো দিতে। গাড়িখানাকে লাল জবা ফুলের মালায় সাজাবে, দু'জনে পাড়ি দেবে সহর থেকে কোন পল্লী অঞ্চলের দিকে। রাত অনেক হয়ে গেছে। মনোহরের তখনও পাত্তা নেই। ছেলেটা গেল কোথায়, কে জানে! না বলে কয়ে কেটে পড়ল কিনা তাও তা

লেই সর্বনাশ! কূলে এসে মোহিতের নৌকা ডুবে যাবে। উঠে বসল হিত। সন্ধ্যার মনোরম স্মৃতিও মুছে যায় তার মন থেকে। সব স্বপ্ন তার হয়ে যাবে যদি মনোহর না ফেরে। ছোঁড়াকে তার ভয় হয়। কেমন ালী সে।

কে জানে যদি বেঁকে বসে। হঠাৎ কড়াটা নড়ে ওঠে। মোহিত গিয়ে জা খুলে দিতেই মনোহর ভিতরে ঢোকে। মোহিতের ভাবনা দূর হয় মন ক।

—এত রাত্রি হল?

হাসে মনোহর,—জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলাম। খাওয়া হয়েছে তো? মোহিত জবাব দেয়,—খেয়েছি। তুই বলে যাসনি—খাবারও নেই। এখন করা যায়?

হাসে মনোহর,—আছে দাদা।

একটা প্যাকেট খুলতে থাকে; বেশ কিছু লুচি আর মোটামোটা কয়েক স মাংস, সেই সঙ্গে কয়েকটা বড় সন্দেশ, সব চটকে একাকার দই হয়ে গেছে। হিত অবাক হয়।

—এসব কি রে? লুচি মাংস—

মনোহর গিলতে গিলতে জবাব দেয়,—তারকানন্দের ভোগ, ব্যাটা খালি টেই পালালো দাদা। খুব মা মা করতো। ব্যাটা ভণ্ডকে মায়ের একটু না দেখাতেই ব্যাটার চোখ ছানাবড়া। তোমাদের সিধু মল্লিকের গুরুদেব ! ধড়িবাজ লোক যা হোক!

মোহিত অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে। ওকে ঠিক ঠিক চিনতে রেনি আজও। বলে চলেছে মনোহর খানিকটা জল কোঁৎ-কোঁৎ করে ল,—বুঝলে, সবাই বহুরূপী; তবে ভণ্ড! আমি ব্যাটা বহুরূপী বটি ভণ্ড । মিথ্যাবাদী, তবে ঠক্ নই।

মোহিতের নিজের চিন্তা, সে জিজ্ঞাসা করে,—হ্যাঁরে বলেছিলি বুড়োকে ার কথাটা? দু' একদিনের মধ্যে যে চাই।

হাড় চুষতে চুষতে বলে মনোহর,—হয়ে যাবে। তবে দাদা, দুনিয়ার সবাই লোক তুমি হয়ো না। প্রথম দিনই সেই অন্ধকার শহরে তোমাকে দেখে হয়েছিল, তুমি সাচ্চা আদমী। সেই ধারণাটা যেন বজায় থাকে দাদা।

মনোহর মোহিতের মুখের দিকে চাইল। ও আজ সন্ধ্যার সেই মেয়েটির

সঙ্গে ওকে দেখেছিল, মোহিতকে সেই সম্বন্ধেই কিছু আভাস দিতে
লাবণ্যকে একদিন আশা দিয়েছিল মোহিত। মনোহর সেকথা ভোলে
তার এসব কাজ করা সেই একটি কারণেই। কিন্তু মোহিত এখন বদলে গে
তার কাছে টাকাটাই বড় হয়ে ওঠে। তার জন্যই এত ব্যাপার, মোহিত জা
মনোহরও তাই চায়। একটা ভাগ চায় ও।

মোহিত বলে,—আধাআধি বখরা দোব তোকে।

হাসে মনোহর, ওই কথাটা যেন হাসির আবেগে উড়িয়ে দেয়।
মনোহর,—গুরুর নিষেধ দাদা ; এ বিদ্যে দিয়ে লোক ঠকিয়ে পয়সা নিতে নে
বকশিস নিই। তাও দু' এক টাকা পেট খরচা মাত্র। ভাগ টাগ নোব না

—তবে ! মোহিত অবাক হয় ওর কথায়।

—একজনকে উদ্ধার করতে হবে। অবশ্য সে সব আমিই ঠিক করে দো
কঠিন কাজও কিছু নয়। সে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি মত দেবে যা
অবশ্য মত তোমার থাকবেও। উঃ, তোফা রেঁধেছে। কিন্তু কোর্মাটা।
করবে না ? পেট ভরে আছে দাদা কাট্‌লেট খেয়ে ?

চমকে ওঠে মোহিত। তার কাটলেট্ খাবার কথা ও জানলো কি ক

মনোহর বলে চলেছে,—তা চীনেরা ভালোই রাঁধে, কাটলেট্, ফ্রাই
বলো দাদা ?

মোহিত ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে। কে জানে আজকের স
ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে বোধহয়। লক্ষ্মীকে ও তাহলে দেখেছে।

মোহিত ছেলেটার উপর মনে মনে চটে ওঠে, একটু আগের ওই কথাটা
অর্থ বোঝে। লাবণ্যকে এখনও মনে আছে মনোহরের।

কিন্তু মোহিত এখন তাকে চটাতে চায় না। তাই আপাততঃ কথাটা
দিতে চায় সে।

—শুয়ে পড় রাত অনেক হয়েছে।

মনোহর হাসতে হাসতে এঁটো কাগজখানা তুলে বাইরে ফেলে
সোফাগুলো সরিয়ে একটা সতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়ে। সে তক্তপে
বিছানায় শোয় না। বলে,—ওতে অব্যেস খারাপ হয়ে যায়।

মোহিত বলে,—তুই সেই তেমনিই থেকে গেলি।

মনোহর জবাব দেয়,—বহুরূপী জানে সব রূপবদলই মিথ্যা। তাই
সত্য সেই সামান্যটুকুকেই বড় করে দেখে দাদা। আমার সতরঞ্চিই ভা

খাট-পালংক ছিল না, পরে থাকবে কিনা জানি না, তবে এটা কেউ নিতে পারবে না। এই ভূমিশয্যা। মা শেষদিনেও তো এই শয্যাই কায়েম থাকবে দাদা। কি বলো?

মোহিত ওর কথাগুলো শুনছে মাত্র। জবাব দিল না। আজ মনে হয় ছেলেটা তার এখানকার ব্যাপার সবই জানে। লক্ষ্মীকেও দেখেছে, তাই ওই কথাগুলো ঠুকলো একটু। মনোহরের ওসব কথা ভাবার সময় নেই। টানটান হয়ে একটা চাদর মাথা অবধি ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ে। মশারিও টাঙায় না সে। তার চামড়ায় বোধহয় মশাও বসে না। পুরু চামড়া।

সিধু মল্লিকের মনে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

কাল শুভাকে যা-তা বলেছে কিন্তু তার চোখের সামনে একটা কঠিন সত্য পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। দেখেছে এ সংসারে সবই অনিত্য। ভক্তে ভরে গেছে চারিদিক। তার বিষয়ের দিকেই সবার লোভ। তাই ওরা আসে।

এবার নিজেই সংসার করতে চায় সে। বৃদ্ধ বয়সে আপনজন একটি তার চাই-ই।

শুভাকেও যা-তা কথা বলেছে, মনটাও ভালো নেই সিধু মল্লিকের। অন্যায় করেছে সে?

সকালেই তাই বাড়ির আবহাওয়া আজ বদলে গেছে, শুভা দাদুকে দেখে অবাক হয়। একসঙ্গে আজ চা খাবার আয়োজন করেছে শুভা অনেকদিন পর।

দোতলায় বারান্দায় বসেছে তারা। নীচের বাগানে সকালের আলো ফুটে উঠেছে। পাখী ডাকছে। শুভার মন থেকে কালকের রাতের কথাগুলো মুছে যায় নি। এই জীবনের মধ্যে অনুভব করেছে, সে নিতান্ত অসহায় এবং একা।

তারকানন্দ চলে গেছে, কিন্তু শুভার চোখের সামনে সে দাদুর মূর্তিটাকে চিনিয়ে দিয়ে গেছে। তবু সিধু মল্লিক নিজেও অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে,—ওসব কথায় কিছু মনে করিস না দিদি।

শুভা সাড়া দেয় না। সহজভাবেই চা পরিবেশন করে। মনের বেদনা চেপে রেখে হাসবার চেষ্টা করে সে। সিধু মল্লিক বলে চলেছে,—বুড়ো বয়সে তুই আর কদ্দিন দেখবি আমাকে? একদিন তো পরের ঘরে যেতেই হবে।

শুভার এত বেদনাতেও হাসি আসে। বলে,—একটা নোতুন দিদিমাই আনো না হয়। বুড়ো বয়সে দেখবার লোক তো চাই।

হাসে সিধু মল্লিক,—রসিকতা করছিস ?

শুভা জানে দাদুর ব্যাপারটা। তাই বলে,—না না। সত্যি বলছি। সিধু মল্লিক নাতনীর কথায় মনে মনে খুশী হয়। তাহলে ওরাও মনে মনে চায় দাদু আবার একটা ঘর-সংসার পাতুক, তারকানন্দও সেই আশীর্বাদ করেছিল। তার মনের জড়তা কেটে গেছে। মনে হয় সে একটি তরুণ। অতীতের সেই দিনগুলো যেন আবার ভিড় করে আসে—সেই যৌবনের রঙীন কল্পনা-মুখর দিনগুলো। শুভা দাদুর মুখে চোখে সেই কামনার উচ্ছলতাটুকু দেখে বলে,—কিই বা তোমার বয়েস ! সিধু মল্লিক শুভার দিকে চেয়ে থাকে। কথাটা যেন তার মনে ধরেছে। তবু বলে,—তোর বিয়ে থা হোক, তারপর। মানে তোর গতি হোক আগে—

শুভা হাসতে থাকে,—যদি না হয় ?

সিধু মল্লিক জবাব দেয় বেশ দাপটের সঙ্গে।

—কত ব্যাটা হুমড়ি খেয়ে এসে পড়বে। একি সিধু মল্লিকের বিয়ে ? তার নাতনীর বিয়ে। সোনায় মুড়ে দোব না ? পাত্রের আবার অভাব !

মনটা বেশ খুশীই রয়েছে সিধু মল্লিকের।

কারখানাতেও কাজ পুরোদমে চলেছে। কাজের শেষ নেই। মোহিত কাজে ফাঁকি দেয় না। এদিকে সে বেইমান নয়। কাজকর্ম তদারক করে মল্লিকমশাই এসে বসেছে ঘরে, মোহিতকে খাতাপত্র নিয়ে অফিস ঘরে ঢুকতে দেখে সিধু মল্লিক ওর দিকে চাইল।

মোহিত খাতাপত্র সই করিয়ে দিয়ে কথাটা পাড়ে। সে তার নিজের সেই গাড়ির কথা ভোলে নি।

—আজ ভাবছিলাম ওটা জমা দিয়ে দিই।

—টাকাটা !

সিধু মল্লিকের চোখের সামনে মন্থুর সুন্দর মুখখানা ভেসে ওঠে। তার জীবনের একটি নির্ভর। মল্লিকমশাই বাড়িতে শুভারও মত নিয়েছে। তার নিজের কথাই ভাবছে সে। মনে হয় কোনদিক থেকে কোন বাধাই আসবে না।

মন স্থির করে ফেলেছে। সিধু মল্লিকই কথাটা পাড়ে এই সুযোগে,—তোর বোনের, ওই মন্থুর তো বিয়ে দিতে হবে ! তাই বলছিলাম পালটি ঘর

-আর তোরা ছাড়া আমার কে আছে বল! চেনা[illegible], তার আর কিই বা ...ল আমার বল? তাই কথাটা ভাবছিলাম।

মোহিত মল্লিকমশাইয়ের দিকে চাইল। মোহিতও ধূর্ত হয়ে উঠেছে লোভের ...গিদে, মল্লিকমশাইয়ের বিয়ের কথায় গম্ভীর ভাবে বলে সে।

—ওর মতামত দরকার, আমার তো এখুনিই মত রয়েছে, এতো ভাগ্যের ...খা! মহাভাগ্য ওর—

হাসে সিধু মল্লিক।

—ওসব পরে হবে। তাই বলে ভাবিস না যে ওই জন্যেই তোকে এ ...কা দিচ্ছি। তুই নে! তবু আমার চেষ্টায় একজনকে দাঁড় করালাম এইটাই ...ই কম কথা! আমি সকলের জন্য ভাবি, বুঝলি মোহিত, দুনিয়ার সকলেই ...কলের জন্য ভাবলে দুনিয়ার হাল বদলে যেতো। কিন্তু তা হয় কই?

মোহিত চুপ করে থাকে। ওর হঠাৎ এই পরোপকার করার মহৎ ঔদার্যের ...থা ভাবছে সে। এর পিছনে যে অলিখিত সর্ত আছে সেটার কি ব্যবস্থা হবে ...ানে না। পরে ভাববে সে কথা। মোহিত এখন মাথা নাড়ে,—ঠিক ...লেছেন।

সিধু মল্লিক বলে চলেছে,—শুধু একটা কাগজ করা থাকবে মাত্র। বুঝলি ...সব কোম্পানীর টাকা—তবে শুভকাজ হয়ে গেলে তখন তো আপনজন। ...কাম্পানীকে ফিরিয়ে দিবি ধীরে সুস্থে।

চেকটায় সই করে দেয় সিধু মল্লিক।

—নে। তবে বুঝছিস তো সংসার বুঝে নিতে হবে। মন্নুকে বল সামনের ...াসেই যেন শুভকাজ হয়ে যায়। বুঝলি শুভস্য শীঘ্রম্। এসব কাজে দেরী ...রা মঙ্গলের নয়।

মোহিত চেকটা নিয়ে কোনরকমে সরে পড়তে পারলে বাঁচে। আজই ...্যাস করিয়ে টাকা জমা দিয়ে দেবে। লক্ষ্মীকেও খবরটা দিতে হবে। আর ...নিছক মিস্ত্রী সে নয়—আজ থেকে গাড়ির মালিক সে। গাড়িও যাতে শিগ্রী ...ায় তার পথও করে রেখেছে।

মোচিত সব ব্যবস্থা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরে গেল মল্লিকমশাইয়ের ...র থেকে।

তার শুভকাজে সে আর দেরী করবে না। মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। ...খুনিই ব্যাঙ্কের দিকে ছুটল।

মনোহর এসব চাওয়া পাওয়ার বাইরে। আপন আনন্দে সে মগ্ন। তা
বোধহয় জীবনে সে শান্তি পেয়েছে। দেখেছে তার চারিপাশে ব্যাকুল মানুষে
যন্ত্রণা।

কি খেয়ালবশে আজ গান নিয়ে বসেছে মনোহর। এমনিতেই গলাও তা
মিষ্টি। বেশ দরদ দিয়ে গাইছে গানটা। তার শূন্য জীবনের সব বেদনা যে
আনন্দে পরিণত হয়েছে!

—জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো।

কতক্ষণ জানে না, তন্ময় হয়ে গাইছে সে। হঠাৎ চোখ মেলতেই সামনে
শুভাকে দেখে চমকে ওঠে।

—তুমি! কতক্ষণ এসেছো! ওসব আবার তুমি কেন আনতে গেলে?

শুভার হাতে সেই রংচটা স্যুটকেশটা। শুভা একটা সোফায় বসে বলে,—
তোমার প্রসাধন সামগ্রী, ওটা নাহলে আজ যেতে কি করে ওখানে?

—তাই নিজেই দিতে এলে?

শুভা বলে,—নইলে এ গানও শুনতে পেতাম না। সত্যি বলতো গানটা
মন দিয়ে শিখলে না কেন? কি চমৎকার তোমার গলা!

মনোহর বিড়িতে শেষ টান দিয়ে যেন মেজাজের সঙ্গে পা নাচাতে নাচাতে
বলে,—পারতাম তো অনেক কিছুই, কিন্তু আসলে আমি যে কে, কি বা
সেইটাই চিনতে পারলাম না। সুতরাং সেই মানুষটার আসল রূপ কি সেটাও
জানতে পারলাম না, তা না হলে বুঝলে, বড় হয়ে ইস্তক দেখলাম এত বড়
দুনিয়ায় আমি একা, কেউ নেই আমার। শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খাবারে
সন্ধানেই সব সময় চলে গেল, নিজেকে চিনলাম না; সুতরাং কোন আমির বি
আসল চাওয়া, তাই বা চিনবো কেমন করে বলো, তাই সবই হলো কিছু
কিছু! ভালো কিছুই হলো না।

শুভা লোকটির দিকে চেয়ে থাকে। আজ ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে সে বের
হয়েছে। এতদিন দাদুর কথাই মানতো সে। কাল রাত থেকে সেই মন
ভেঙ্গে গেছে। আজ সে তার নিজের পথের সন্ধান করে।

বলে শুভা,—দুপুরে চল কোথাও ঘুরে আসি।

অবাক হয় মনোহর,—সেকি! হঠাৎ এত সাহস হলো তোমার? এই নিদারুণ সাহস!

শুভা আজ নিজেকে চিনতে চায়। বলে,—এতদিন ভেবেছিলাম সবই আমার হাতে আসবে, কিন্তু দেখলাম কি জানো, পেতেও সাধনা করতে হয়। বাইরের বিরাট পৃথিবীর মাঝে আমি নিজেকে তাই নোতুন করে চিনে নিতে চাই অনেকের মাঝে।

হাসে মনোহর,—এসব তত্ত্বকথা আমার জানা নেই।

শুভা থামিয়ে দেয়,—ও তোমার বুঝেও দরকার নেই। চলো, ওঠো। যা বলছি তাই শোন।

শুভা নিমেষের মাঝে বদলে গেছে। আজ তার ব্যাকুল মনে তার অজানতেই মনোহর বিচিত্র একটা সুরের রেশ তুলেছে। মনোহর জানায়,—চাই তো অনেক কিছুই শুভা, কিন্তু যা চাই তা ভুল করেই চাই আমরা। তোমার আসল আমি যে কি চায় তা কি জেনেছো? সেই রূপটিকে কি কোন দিনই দেখেছো?

শুভা আজ খুশীর আবেগে সব হিসাব মন থেকে মুছে দিতে চায়। তাই বলে,—এত হিসাব করে চাওয়া যায় না, মনটা তো ব্যবসাদার সিধু মল্লিক নয়। সব পাওয়াকেই মন খুশী ভরে নিতে চায়। চলো—ওঠো বলছি।

মনোহর তবু ওর জেদেই বের হল। বলে,—পোশাকটা বদলে নিই! মানে—ছেলের পোশাকে তোমার সঙ্গে বের হবো?

হাসে শুভা,—না আজ তুমিই যাবে আমার সঙ্গে মনোহর, তোমাকেই চিনি আমি, সেই সাজা রূপটাকে নয়। যাকে নোতুন করে চিনেছি, জেনেছি—সেই লোকটিকেই আজ সঙ্গে চাই। ফাঁকি দিয়ে নয়—মূল্য দিয়েই সত্যকে আজ মেনে নিতে চাই আমি।

শুভার কথায় চমকে ওঠে মনোহর। ওর দু'চোখের সেই সদ্যজাগর কামনাময় চাহনি! মনোহর জানতো না একটি নারীর এই বেদনার কথা। তবু বলে সে,—বিপদ তাতে বাড়বে বই কমবে না, এই আর কি! শুভা আজ বিদ্রোহ করতে চায়। মনের এই বিদ্রোহই বোধহয় ভালবাসার চিহ্ন! আজ শুভাও এগিয়ে আসতে চায়।

দু'জনে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। শুভার মনে সুর জাগে।

সহরের সীমানা ছাড়িয়ে সবুজ গাছগুলো মাথা তুলেছে, ময়দানের ছায়াঘন ঘাসের বুকে পা ফেলে তারা এগিয়ে চলেছে কোন নিরুদ্দেশের দিকে।

সিধু মল্লিক আজ খুশী মনে খবরটা নিয়ে আসছে মোহিতের বাড়ির দিকে। মন্নুকে এখুনিই জানাবে সে খবরটা। বেশ কয়েক হাজার টাকা, সিধু মল্লিক তার কথাতেই দিয়েছে ওই মোহিতকে।

সিধু মল্লিক মনে মনে এইবার স্বপ্ন দেখছে। মনোহর তার দাদাকে এই টাকা দিয়ে গাড়ি করে দেবার ব্যাপারে খুশীই হবে। মন্নুর সেই সুন্দর খুশী খুশী মুখখানার ছবি বুড়োর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মিষ্টি রোদের আলোয় চারিদিক ভরে গেছে। ভাল লাগে সিধু মল্লিকের এই সবকিছু।

সিধু মল্লিক এমনিতেই কাউকে ঠকায় না। মোহিতকেও ঠকাবে না। মন্নুকে ভালো লেগেছে তাই ওর দাদাকে খুশী হয়েই টাকাটা দিয়েছে, থিতু করে দিয়েছে। এবার মন্নু তার কর্তব্য করুক।

অনেক কষ্টের অর্জিত টাকা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আজ ওকে দিয়েছে। কথাটা শুনে খুশী হবে মন্নু!

সিধু মল্লিক এ বাড়িতে এসে দরজাটা বন্ধ দেখে অবাক হয়। মন্নু কোথায় যেন গেছে। দরজায় তালা বন্ধ। সব উৎসাহ কেমন যেন মিইয়ে যায় বুড়োর। কত আশা করে এসেছে, মন্নুকে নির্জনে কাছে পাবে। তাই ক্ষুণ্ণ-ই হয়েছে সে।

বাড়ির দিকে একাই ফিরে চলেছে। মনে নানা ভাবনা জাগে। কে জানে মন্নু কি বলবে। তাকে রাজী করাতেই হবে। এই সময় দেখা হলে কথাটা পাড়তো, কিন্তু তা হল না।

বুড়ো মন খারাপ করে বাড়ির দিকে ফিরছে।

বেলা পড়ে আসছে। তখনও দুপুর আর বিকালের মাঝামাঝি সময়, অলস দিনটা ঢিমিয়ে চলেছে।

হঠাৎ ময়দানের কাছে রাস্তায় শুভাকে দেখে অবাক হয় সিধু মল্লিক। শুভা বড় একটা বের হয় না।

কিন্তু মনে হয় শুভা তাকে মিথ্যা কথাই বলেছে। সিধু মল্লিক অবাক হয়ে চেয়ে দেখে শুভা আর একটি ছেলে দু'জনে একটা বেঞ্চে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বোধহয় চিনেবাদাম না-হয় অন্য কিছু খাচ্ছে আর হাসছে। শুভার এমন হাসি দেখে নি সে।

সিধু মল্লিকের মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে।

তাকে ধাপ্পা দিয়েছে শুভাও। তার আড়ালে বাড়ি থেকে বের হয়ে রীতি-মত প্রেমালাপ করে চলেছে একটা বাইরের ছেলের সঙ্গে। মনে হয় অনেক-দিনই এসব করছে।

কাউকে বিশ্বাস নেই। সিধু মল্লিক দু' দশ দিনের মধ্যেই যেভাবে হোক শুভাকে পাত্রস্থ করবে। দত্তবাগানের ঘোষেদের ছেলেটিকেই পাকা কথা দেবে। ও পাপ আর ঘরে পুষবে না। রেগে উঠেছে সে।

—ড্রাইভার!

সিধু মল্লিকের ডাকে ড্রাইভার তার দিকে চাইল। সিধু মল্লিক হুকুম করে, —গাড়ি ঘোরাও। চল দত্তবাগান। এখুনিই চল।

তখনও দেখা যায় শুভা আর ছেলেটা মশগুল হয়ে গল্প করছে। কোন-দিকে ওদের নজর নেই। দুনিয়ার সবকিছু তারা ভুলে গেছে। সিধু মল্লিক এইবার শুভাকে একবার দেখে নেবে, বিয়ে দিয়ে দূর করে দেবে পরের মেয়েকে। ওসব ঝামেলায় আর থাকবে না। নিজের ব্যবস্থা আবার করতে হবে তাকে। গাড়িটা দত্তবাগানের দিকে চলেছে। সিধু মল্লিক রাগে গরগর করছে মনে মনে।

বিকাল নামছে। দাদু কারখানা থেকে বাড়ি ফেরবার আগেই শুভা বাড়ি ফিরে গেছে। আজকের একটি দিন তার কাছে স্মরণীয়। মনে হয় জীবনে পাবার অনেক কিছুই আছে! সে শুধু নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

শুভার মন তাই মনোহরের কাছে আজ নির্ভর খোঁজে। তার সব কথাই আজ শোনায় শুভা। বলে,—কাশীতেই ফিরে যাবো। সেখানে বাড়ি, দেহাতে অনেক জমিজারাত রেখে গেছেন বাবা। তাছাড়া আমারও বেশ কিছু আছে।

শুভাও মনে মনে তার নিজের জীবনের একটা ছক এঁকে ফেলেছে। সুন্দর স্বপ্নময় একটি জীবন। একজনকে নিয়ে সে সুখী হবে, ঘর বাঁধবে। দাদুর আশ্রয়ের চেয়ে সেটা হবে অনেক আনন্দের। শুভা বলে,—যা রোজগার হবে তাতে বেশ চলে যাবে। বাড়ি ভাড়াই আসে মন্দ নয়।

মনোহর ওই খেয়ালী মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে।

শুভার দু'চোখে কল্পনার ছবি ফুটে ওঠে। মনোহরের হাতটা তার হাতে। শুভার কাছে মনে হয় এইটুকুই তার সবচেয়ে বড় চাওয়া।

—চুপ করে আছো যে ?

মনোহর ভাবছিল। এ তার বহুরূপের একটা রূপ না এই রূপের অতলে কোন পরম সত্য আছে কিনা তাই ভাবছিল সে, মাঝে মাঝে সব তার মনের মাঝে ঘুলিয়ে যায়। কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে তাও জানে না সে। সে কি কোনদিন একটা রূপকে আঁকড়ে ধরে সাধারণ মানুষ হয়ে যেতে পারবে ?

সব একাকার হয়ে গেছে।

শুভার কথায় ওর দিকে চাইল মনোহর, তার নিজের মনেই একটা ঝড় উঠেছে। জীবনে এমনি করে কেউ কোনদিন নীরব আকুতি নিয়ে তার সামনে আসেনি। শুভার এই আহ্বানে সাড়া দেবার যোগ্যতা তার নেই।

হাসবার চেষ্টা করে মনোহর। কথাটা সহজ করবার জন্য বলে,—কই, কিছুই ভাবছি না।

শুভার বিদ্রোহী মনও সায় দেয়। অনেক কিছু পেতে চায় সে।

—ভাববার কি আছে ? আজ সন্ধ্যায় আসছো তো ?

মনোহর মাথা নাড়ে। তার শূন্য জীবনে এই স্বপ্নটুকুই সত্যি। ক্ষণিক পাওয়ার এই মাদকতাটুকু তার মনকেও আচ্ছন্ন করেছে। শুভা বলে,—আমি চললাম। দাদু ফেরার আগেই বাড়ি পৌঁছতে হবে। যেও কিন্তু সন্ধ্যাবেলায়।

ময়দানের ঘাসের উপর দিয়ে শুভা বড় রাস্তার পানে চলে গেল। অপরাহ্ন নামছে। গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়ে আসে। পাখীর কলরব ওঠে।

ময়দানে লোকের ভিড় জমছে। উপছে-পড়া লোকের ভিড়।

মনোহর উঠে বাড়ির দিকে চলছে, তার মনে চিন্তার সাড়া। কি যেন একটা জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে।

এতদিন নিরপেক্ষ দর্শকের মতই সবকিছু দেখছিল সে, চারিদিকে তার জীবন-নাট্যের অভিনয় চলেছে।

কিন্তু নিজেকে যে এমনি ভাবে একজনের জীবনের সঙ্গে নিবিড় করে জড়িয়ে ফেলবে তা ভাবেনি সে। জগতে চলার পথটাই এমনি, অনেক ভিড়, অনেক জটিলতায় ভরা। সেখানের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে মনোহর দেখেছে শুধু বেদনা আর বঞ্চনা। সকলেরই মনে তার স্পর্শ, কেউ পূর্ণ নয়, সুখী নয়। সুখী হতে পারেনি। কেন পারেনি তাও মনে হয়েছে। ওরা অনেক চায়, এ চাওয়ার শেষ নেই, মাকড়সার জালের মত নিজেদের চারিপাশে মিথ্যা চাওয়ার জাল বুনে চলেছে। আর দুঃখও বেড়েছে সেই সঙ্গে।

নিজের চাওয়া তার কিছুই নেই, আজ মনে হয় সেটা মস্ত ভুল তার। সেও কিছু চায়।

রূপবদলের খেলার মাঝে তার নিজস্ব একটা রূপ, একটা ব্যক্তিত্ব আছে। সই চাপা পড়া মানুষটা কি পরম আশা ভালবাসা আর কামনা নিয়ে জেগে উঠেছে। এই সদ্যজাগর সত্বাকে চেনেনি এতদিন মনোহর, সেও তাহলে এ পৃথিবীতে ভালবাসতে চায়, আশ্রয় চায়—অনেক কিছু পেতে চায়। একথা আজ হঠাৎ জেনেছে সে।

হাসি আসে, নিজের মনেই হাসছে সে এই বিচিত্র আবিষ্কারে।

মোহিতের মনটা খুশীতে আজ ঝলমল।

টাকাকড়ি জমা দিয়ে এসপ্লানেডের ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রামের জন্য। একটা কাজ সে করেছে। অনেক দিনের আশা আজ পূর্ণ হতে চলেছে।

বিকালের আলো নামছে। কর্ম-চঞ্চল এসপ্লানেডের মোড়ে লোকজনের ভিড় বাড়ছে ক্রমশঃ। অফিস-ফেরতা বাবুদের ভিড়।

হঠাৎ মনোহরকে দেখে ওর দিকে চাইল মোহিত।

মোহিত এ সময় বাড়ি ফিরবে না, কারখানাতে যেতেও ভালো লাগে না আজ। মনটা হাল্কা।

একজনের কাছে ছুটে যেতে মন চায়। লক্ষ্মীকে এই শুভ সংবাদটা জানাবে সবার আগে। মনোহরও দেখেছে ওকে।

—দাদা!

মোহিত ওকে দেখে এগিয়ে আসে। মোহিত বলে,—টাকাটা জমা পড়ে গেল, তবে বুড়োর কাছে গাড়িটা কাগজে-কলমে বন্ধক থাকবে, টাকা শোধ দিলে গাড়ি হবে আমার।

—তাই নাকি! বেশ বেশ।

মনোহরও খুশী হয়। মোহিতকে আজ সে গাড়ির মালিক করছে, যাক কাজ মিটে গেল।

—বাড়ি যাবে না?

মোহিত জবাব দেয়—একটু কাজ আছে, ফিরতে রাত হবে। তুই খেয়ে নিস্ :

ঘাড় নাড়ে মনোহর, ও জানে মোহিতের কাজটা কি। মনোহর চুপ ক
ট্রামে উঠে বাড়ির দিকে এগিয়ে যায় ভালো ছেলের মত।

দেখে মোহিত বারো নম্বর ট্রামে উঠেছে। মনোহরের হিসাব ভুল হয় না
ও জানে মোহিত চলেছে উল্টাডাঙ্গার সেই খাল পারের কেষ্টোর বাড়ির দিকে
সেখানে যাবার কারণটা সে জেনেছে, কিছুদিন আগে হোটেলে দেখেছি
কালো একটি নধর মেয়েকে। মোহিতদা আজও চলেছে সেখানে। জালে পা
দিয়েছে সে।

মনোহরের মনে মনে এইবার তার বদমাইসী বুদ্ধিটা মাথা চাড়া দিয়ে
উঠেছে। দরকার হয় লাবণ্যদিকে সে নিজে গিয়ে আনবে। এখানের কাজ
তাড়াতাড়িই শেষ করতে হবে তাকে। বেশ বুঝেছে নইলে আরও জড়িয়ে
পড়বে সে নিজে।

বাসায় ফিরে চুপচাপ বসে আছে মনোহর। চুলগুলোও উস্কো-খুস্কো
সিগ্রেট টানছে আর পায়চারী করছে। হঠাৎ কড়াটা নড়ে ওঠে।

সিধু মল্লিক দত্তবাগানে কথাবার্তা একরকম পাকাই করে এসেছে। ভালো
ঘর বর, তাছাড়া সিধু মল্লিকের নাতনীকে বিয়ে করবার লোকের অভাব সত্যই
নেই। বুড়োর অঢেল পয়সা, নাতনীরও পৈতৃক সম্পদ বেশ কিছু আছে।
আর মেয়েও ভালো। অনেকেই রাজী হবে।

সিধু মল্লিক ওদিকে কথা দিয়ে এইবার নিশ্চিন্ত মনে ফিরছে। ফেরার মুখে
একবার দেখা করে সব কথা জানিয়ে যেতে চায় মন্নুকে। মোহিতকেও বলেছে
কথাটা। সামনের সপ্তাহেই সিধু মল্লিক সব পাকাপাকি করে ফেলবে।

তাহলে পাকা দেখা আশীর্বাদী সব সেরে ফেলবে সিধু মল্লিক। খুশী মনেই
এ বাড়িতে এসে কড়া নেড়েছে সে।

এখুনিই মন্নু এসে দরজা খুলে দেবে হাসিমুখে।

দরজাটা খুলে যায়; সিধু মল্লিক বেশ আদরভরা কণ্ঠে ডাকে,—মন্নু! মন্নু!

হঠাৎ সামনেই একটা ছেলেকে দেখে অবাক হয় সে। পায়জামা পরা
লক্কা-মার্কা একটি ছেলে সিগ্রেট টানতে টানতে তাকে দরজা খুলে দিয়েছে।

অসময়ে সিধু মল্লিককে দেখে মনোহর চমকে উঠেছে। সর্বনাশ হয়ে গেল
বোধহয়। পরক্ষণেই মনোহর তার হকচকানি ভাব এমন কি গলার স্বর পর্যন্ত
বদলে ফেলে জিজ্ঞাসা করে সে,—কাকে চাই আপনার? কিস্‌কো মাংতে
হেঁ!

সিধু মল্লিক বিরক্তি ভরা স্বরে জবাব দেয়,— মন্থ আছে? মোহিতের বোন মন্থ।

ঘাড় নাড়ে ছোকরা,—নেই।

—তুমি কে হে বাপু? এ বাড়িতে নোতুন দেখছি।

হাসে মনোহর। নিশ্চিন্ত হয়েছে সে। সিধু মল্লিক তাকে চিনতে পারে নি এই সত্যকার রূপে। মনে মনে ভরসাও পায় সে। বুড়োকে নিয়ে মজাটা জমবে ভালো। মনোহরকে দেখছে সিধু মল্লিক। মনোহর সিগ্রেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছে একেবারে মল্লিকমশাইয়ের মুখের সামনে। মল্লিকমশাই চটে ওঠে,—আরে মলো, তুমি কে হে বাপু, এ বাড়িতে এসেছো, চিনি না তো!

মনোহর জবাব দেয়,—আমি মোহিতবাবুর গ্রামেরই ছেলে। বোম্বাই-এ থাকি, ফিল্মে নামি! সাইড হিরো! হিন্দী ফিল্ম দেখেছেন? দোঘড়ি কা মৌজ, প্যার করো, মোহব্বৎ, জানদিয়া মহব্বৎ কিয়া—হ্যা।

সিধু মল্লিক অবাক হয়,—তা এখানে কি করতে এসেছো? মোহিতের বাড়িতে?

—এমনিই। মোহিতবাবু আমাকে ভালবাসেন, ওর বোন মন্থ ভি আমাকে প্যার করে। তাই কলকাতা এসেছিলাম ভেট করে যাচ্ছি!

সিধু মল্লিক বলে,—তাই যাও। এখানে আর ওই যে মোহব্বত, প্যার করো—তোমার ফিল্মী প্যাঁচ কষো না। আর শোনো, মন্থ ফিরলে বলো—আজ যেন মল্লিকমশাইয়ের নাতনীকে গান শেখাতে যায়। বুঝলে! মনে থাকবে তো?

—জরুর। মনোহর মাথা নাড়ে। মল্লিকমশাই চলে যেতেই দরজাটা বন্ধ করে হাসিতে ফেটে পড়ে সে; সবই তার কাছে বিচিত্র ঠেকে।

মল্লিকমশাই খুব রেগে গেছে। সব কেমন ফেঁসে যাচ্ছে। মন্থকে আজ দেখে নি—ও ছোঁড়াটাকেও ভালো লাগে না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মনোহর আজ ব্যাপারটা সেখানে গিয়ে দেখতে চায়, তাই সাজগোজ নিয়ে বসে। আজ মনোহর নিখুঁত ভাবে সেজেছে। এইবার বের হবে, হঠাৎ দরজাটায় কে যেন কড়া নাড়ছে। এগিয়ে এসে দরজা খুললো মনোহর।

লক্ষ্মী আজ দুপুরে বের হয়েছিল তার কাজে। ক'টা দোকানে কিছু অর্ডারী

মালপত্র দেবার কথা আছে। সেগুলো দিয়ে এখানে ওখানে একটু ঘুরে ফিরে কি মনে করে লক্ষ্মী আজ মোহিতকে চমকে দেবার জন্যই তার ঘরে এসেছে। হাতে কতকগুলো ফুল রয়েছে।

দরজাটার কড়া নাড়ছে এসে, লক্ষ্মী মোহিতকে চমকে দেবে। নিজেরই ঘর হবে কিছুদিন পর, মনে মনে লক্ষ্মী অনেক স্বপ্ন দেখে মোহিতকে নিয়ে।

তাই কি এক দুর্বার আশা নিয়েই সে এসেছে এখানে; দরজাটা খুলে দিয়ে মন্থু সরে দাঁড়াল। লক্ষ্মীর মুখে আলোটা পড়েছে।

মন্থুরূপী মনোহর চিনতে পারে সে রাতের দেখা মোহিতের সঙ্গের সেই মেয়েটিকে। একে কেন্দ্র করেই মোহিত স্বপ্ন দেখেছে, লাবুদিকে ভুলেছে!

মনোহর ওকে দেখছে। লক্ষ্মীও এখানে নোতুন একটি মেয়েকে দেখে অবাক হয়েছে। তার মুখেও একটা বিবর্ণতা নামে। মেয়েদের মনের এই চিরন্তন দুর্বলতার সংবাদ জানে মনোহর। আজ লাবুদির জন্য সে সব কিছুই করবে। তাই বুদ্ধিটা তখনই মাথায় গজিয়ে যায়। নিজের এই রূপবদলের খেলায় সে অনেক কিছুই দেখেছে। মানুষের মনের অতলের অনেক রূপ। আজও দেখা ফুরোয় নি।

মনোহর নিখুঁত অভিনয় করে চলেছে। লক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা জানায়,—আসুন! কাকে চান?

লক্ষ্মী জানতো এ বাড়িতে মোহিত একাই থাকে। কোন নারী এখানে নেই। হঠাৎ মোহিতের ঘরে একটি মেয়েকে দেখে অবাক হয়েছে সে।

কথাটা ঠিক বিশ্বাসও করতে পারে না, কিন্তু না করারও উপায় নেই। মেয়েটি তাকে বসিয়ে রেখে ওপাশের ঘরে গেছে। লক্ষ্মী অবাক হয়ে ভাবছে।

মেয়েটি ফিরে এসে সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করে—,ওঁকে চান.?

লক্ষ্মীর দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার ধারণা তাহলে সত্যিই। মেয়েটির সিঁথিতে সিন্দুর হাতে শাঁখা। লক্ষ্মীর পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

এতদিন তাহলে সে মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছে। মোহিত তাকে ধাপ্পা দিয়েছে। ঠকিয়েছে। আর লক্ষ্মী সেই মিথ্যা ধাপ্পায় বিশ্বাস করে এতদিন তার কল্পনার জাল বুনেছে। লক্ষ্মীর পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

মনোহর বলে উঠল,—উনি ফেরেন রাত্রে, নোতুন কলকাতা এসেছি আমি, উনি তো এতদিন বাসাই পান নি। আমার দিদি কলকাতা ভালো লাগছে

না। বাপরে, এখানে মানুষ থাকে? কি করে থাকে জানি না, দম বন্ধ হয়ে আসছে। আপনারা তো কলকাতার লোক! নয়?

লক্ষ্মীর মুখ বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেছে। কোন কথা বলার সাধ্যি তার নেই।

মনোহর ভাগ্যিস সেজেগুজেই ছিল, এই ফাঁকে এই অভিনয়টুকু করার জন্য সিঁথিতে খানিকটা লাল রং লাগিয়েছে আর দু হাতে শাঁখা পরে এসেছে ওঘরে গিয়ে।

আড়চোখে সে লক্ষ্মীর বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে থাকে। লক্ষ্মী ওর কথার কোনরকমে জবাব দেয়।

—হ্যাঁ। কলকাতাতেই থাকি।

—আপনার নাম কি দিদি? ওঁর খুব চেনা আপনি, না?

লক্ষ্মী সরে যেতে পারলে বাঁচে। তবু মনোহর গায়ে পড়ে আলাপ করে,—আমার নাম লাবণ্য। বুঝলেন, আমাদের ওখানেই উনি কাজ করতেন, বাবার খুব চেনাজানা। সেইখানে বিয়ে-থা করেন। তারপর কলকাতায় কাজ নিয়ে এলেন, কাজ তো হল বাসা আর মেলে না, ওখানে বিয়ের পর বাপের-বাড়িতে আর কতদিন থাকি, তাই বাসা পেতেই নিয়ে এলেন এখানে।

লক্ষ্মী ওকে দেখবার চেষ্টা করে। আবছা একটু আলোয় মনে হয় মেয়েটি সুন্দরীই। তার চেয়ে অনেক সুন্দরী।

লক্ষ্মী উঠে পড়েছে। এখানে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। বলে কোনরকমে,—আমি যাই।

—উনি এলে কিছু বলবো?

রুদ্ধ অভিমানে আর অপমানে লক্ষ্মীর যেন চোখ ফেটে জল আসবে। তার সব সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে।

মাথা নাড়ে সে। কথা বলবার সামর্থ্য তার নেই। কোনরকমে বের হয়ে এসে রাতের অন্ধকার রাস্তায় অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে লক্ষ্মী।

এতদিন মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছিল সে। মোহিত তাকে ধাপ্পা দিয়েছে। জীবনে অনেক আঘাত আর ব্যর্থতা সয়েছে সে, কিন্তু এ আঘাত তাকে কঠিন করে তুলছে।

তখনও হাসছে মনোহর ঘরের মধ্যে। এ তার কাছে কেবল অভিনয়ই। রূপবদল করে মানুষের সব দুর্বলতা তার কাছে জানা হয়ে গেছে।

মনে হয় সবই মিথ্যা, হাসছে সে সেই নিষ্ঠুর কথাটা ভেবে। আবার রূপ-

বদলের পালা। সিঁথির সিন্দুর তুলে শাঁখা খুলে কুমারী মন্থর বেশ বদল ক
সে বের হয়ে পড়ে।

মোহিত খাল পারের মাটকোঠায় যখন পৌছেছে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ
গেছে। দু'একটা মিটমিটি বাতি জ্বলছে।

মলিনাই অভ্যর্থনা জানায় ওকে।

—আসুন মোহিতদা।

মোহিত এদিক ওদিকে চোখ মেলে কাকে খুঁজছে। হাসে মলিনা।
জানে কাকে খুঁজছে মোহিত। বলে সে,—লক্ষ্মী সেই বিকালে বের হয়েছে
দোকানে কি সব অর্ডার আছে তাই দিতে গেছে, একটুক্ষণের মধ্যেই ফির
এইবার! বসুন, চা এনে দিই।

মলিনা হাসতে হাসতে আরও বলে,—আমার হাতের চা কি মি
লাগবে? কি করব বলুন, সে তো নেই।

মলিনাই কথাটা পাড়ে,—ওকে এইবার বুঝিয়ে বলুন, এই ঘোরাঘুরি ব
করুক। আর কেন?

মলিনা হাসতে থাকে।

মোহিতও এসব কথা ভেবেছে। লক্ষ্মী কি করে নিজের সব খরচ চা
তা সে জানে, নিজেই পরিশ্রম করে ঘুরে ঘুরে অর্ডার আনে।

তবু মুখের হাসিটুকু তার মিলোয় নি এই অভাবের মধ্যেও। লক্ষ্মী
যৌবন উছল দেহটাতে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নি। সে নিজের জগ
আবদ্ধ আছে। মোহিত আর সে এইবার ঘর বাঁধবে। কথাটা আজই বল
তাকে। তাদের দু'জনের চেষ্টায় তারা সুখী হবে।

মোহিতও স্বপ্ন দেখছে। হঠাৎ দরজার কাছে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত লক্ষ্মী
দেখে মোহিত ওর দিকে চাইল।

লক্ষ্মী বৌদির কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছে। আজ সে অনেক বদ
গেছে।

—এ ঘোরাঘুরি আমার বন্ধ হবে না বৌদি। হল আর কই?

লক্ষ্মীর ক্লান্ত দেহটা যেন হতাশায় ভেঙে পড়েছে।

—কেন? মোহিত ওর দিকে চাইল।

লক্ষ্মী লোকটাকে আজ ঘৃণা করে সারা মন দিয়ে, এত কাণ্ডের পরও নিঃ
অভিনয় করে চলেছে সে! মোহিতের কথায় এতক্ষণের চাপা পড়া 'আগু

করে জ্বলে ওঠে। লক্ষ্মী জবাব দেয় বেশ ঝাঁঝালো স্বরে,—কেন জানেন
' এতদিন তো জেনেও বলেন নি।

মোহিত লক্ষ্মীর কঠিন মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়। লক্ষ্মীর এ কণ্ঠস্বর
র অচেনা। প্রশ্ন করে লক্ষ্মী,—লাবণ্য কে? বলুন তাকেও কোনদিনই
নেন না?

চমকে ওঠে মোহিত। এতদিন পর এতদূরেও যে তার কথা এসে পৌছবে
জানে না। বলে ওঠে মোহিত,—সে তো বহুদিন আগেকার কথা?

লক্ষ্মী শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে,—তা অবশ্যি সত্যি, যে বিয়েটা অনেক আগেই
রেছেন সেটা পুরোনো হয়ে গেছে, না? তাই নতুন খুঁজছেন?

—কি বলছ তুমি! মোহিত চমকে ওঠে।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে লক্ষ্মী বলে চলেছে,—আমরা গরীব হতে পারি, দাদাকে
াপনিই কথা দিয়েছেন তাও সত্যি, তাই বলে আমাদের মান-সম্মান নেই?
ামাদের ঠকানোর দাবী আপনার আছে নাকি?

মোহিত এসবের কিছুই বোঝে না। জিজ্ঞাসা করে,—ওসব মিথ্যা কল্পনা
রে কেন এসব বলছ লক্ষ্মী? বিশ্বাস কর।

লক্ষ্মীর কঠিন স্বর আজ তার সব কমনীয়তাকে ছাপিয়ে উঠেছে। গভীর
দনা পেয়েছে সে। লক্ষ্মী শোনায়,—নিজের চোখে যা দেখে এসেছি তারপর
ার কোন কথা আপনার না বললেও চলবে। সবাই এ দুনিয়ায় শুধু ধাপ্পাবাজ!
ন আপনাকে চিনতে পারি নি। ছিঃ ছিঃ!

লক্ষ্মীকে থামাবার চেষ্টা করে মলিনা।

—লক্ষ্মী! কি যা তা বলছিস?

লক্ষ্মী বৌদির দিকে চাইল, বৌদি জানে না ওই মোহিতবাবুর আসল স্বরূপ,
জানে না তার ঘরে সে আজ ওর স্ত্রীকে দেখে এসেছে। সুন্দরী স্ত্রী।
য়েটি তাকে মিথ্যা কথা বলে নি, সেও চেনে না লক্ষ্মীকে।

ওই মোহিতবাবু তার স্ত্রীকেও ঠকাতে চায়, ঠকিয়েছে লক্ষ্মীকেও। লক্ষ্মীর
আশা আজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। নিজের পরিশ্রমেই সে তার শূন্য জীবনের
াঝা বইবে, তবু এই অপমান সইবে না। লক্ষ্মী বলে ওঠে,—তুমি থামো

মোহিতবাবু, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি এখন আসুন।
হয় এ বাড়িতে আর না এলেই আপনি ভালো করবেন। আমরা গরীব
—গরীবই থাকবো। তবু ধাপ্পা দিয়ে আর ভোলাতে আসবেন না।

মোহিতের হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা যেন পড়ে যাবে। সারা মন তার জ্বালা করে ওঠে।

আজ সব তার ভণ্ডুল হয়ে গেল : গাড়ি কিনেছে সে খবরটাও দিতে অবকাশ পেল না। লক্ষ্মীর ওই কঠিন মূর্তির সামনে থেকে সরে এল বিস্মিত অপমানিত মোহিত। লক্ষ্মী হঠাৎ এসব কথা শুনলো কি করে তা জানে না কোথায় যেন একটা কাণ্ড বেঁধেছে ঠিক ঠাওর করতে পারে না। ' চুপ করে কি ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ফেরে মোহিত। মনে হয় মনোহরই সব কিছু বলেছে লক্ষ্মীকে।

মনে মনে চটে উঠেছে মোহিত মনোহরের উপর।

এমনি করে সে তার ব্যক্তিগত জীবনেও অশান্তির সৃষ্টি করবে এটা সে কোনমতেই সহ্য করবে না।

সিধু মল্লিক বেশ রেগেই বাড়ি ফিরেছে।

সারাটা দিন তার ঝামেলায় কেটেছে। বেশ কিছু টাকা দিয়েছে মোহিতকে, কিন্তু সারাদিন তার বোন মন্টুর সঙ্গে দেখা হয় নি। তাছাড়া ওই খালি বাড়িতে মোহিতের গ্রামের সেই সিনেমা-করা ছেলেটাকে দেখেও ভাবনায় পড়েছে সে। কে জানে মেয়েটার মনে কি আছে! বাজে ছেলেদের প্রতি মেয়েদের একটা আকর্ষণ থাকে।

বুড়ো সিধু মল্লিককে পছন্দ করার কোন কারণই মন্টুর মত মেয়ের থাকতে পারে না। তবু পয়সার জোরেই মন্টুকে সে ঘরে আনতে চায়।

এরই মধ্যে ওই লক্কা পায়রার মত ছোঁড়াটাকে ওবাড়িতে দেখে সে ঘাবড়ে গেছে। বেশীদিন এভাবে ঝুলে থাকতে রাজী নয়। বুড়ো পুরোহিত ঠাকুরকে বলে কয়ে সামনের দু'চার দিনের মধ্যেই সে আশীর্বাদ সেরে নেবে। সম্ভব হলে বিয়েটাও সারতে হবে তাড়াতাড়ি।

তার জন্য শুভার বিয়েই দিয়ে দিবে শীগ্‌গীর।

চারিদিকে কেবল ধাপ্পাবাজিই চলেছে। শুভা এতদিন কেন বিয়ে করতে চায় নি সে কথাটাও বুঝেছে সিধু মল্লিক। আজ ময়দানে দেখেছে শুভাকে একটি ছেলের সঙ্গে। হাসি গল্প করে চলেছে তারা।

মল্লিকমশাই এসব সহ্য করবে না। সবদিক দিয়েই মনটা খিঁচিয়ে আছে। আজই শুভাকে সে তার শেষ কথা জানিয়ে দেবে, দত্তবাগানেই তার বিয়ের পাকা কথা করে এসেছে।

শুভাকে আজ দুপুরে ময়দানে একটি ছেলের সঙ্গে দেখেই এ পথ নিয়েছে। এসব সে চুপ করে মেনে নেবে না।

সিধু মল্লিক তাই সন্ধ্যার পরই নাতনীর ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছে।

শুভা দাদুর দিকে চাইল। মুখটা ওর থমথমে। সিধু মল্লিক বলে বেশ গম্ভীর স্বরে,—আজই তোর বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে এলাম।

শুভার মনে আজ নোতুন সুরের রেশ। মনোহর তার মনে অজানতেই একটা আসন পেতেছে। শুভাও মনে মনে কঠিন হয়ে উঠেছে। দাদুর কথায় জবাব দেয়,—আমার পথ আমি নিজেই দেখে নোব। আমি তো বোঝামাত্র, কাউকে আমার কথা ভাবতে হবে না।

চটে উঠে সিধু মল্লিক,—তা কেন ভাববো; এখন যে রাসলীলা করতে শিখেছো। কিছুই দেখি না, না? ছানি পড়েছে বলে আমার দৃষ্টি নেই?—ওসব নাটুকেপনা এখানে চলবে না। মেয়েমানুষ হবে আদর্শ চরিত্রবতী সতীসাধ্বী!

শুভা দাদুকে মুখের মতই জবাব দিতে পারতো, তা দিল না। চুপ করে থাকে। মনে মনে সে চটে উঠেছে। শুভা বলে বেশ অভিমান আর রাগ মেশানো স্বরে,—আমাকে না তাড়ালে তোমার পথ পরিষ্কার হবে কেন? তাই যত তাড়াতাড়ি, না?

সিধু মল্লিক আজ পরিষ্কার জানায়,—আমার পথও দেখতে হবে। নিজের সেবা যত্নের লোকও চাই। তোদের উপর আর ভরসা করি না।

এমন সময়ে মনুকে ঢুকতে দেখে সিধু মল্লিকের মুখটা খুশীতে ভরে ওঠে। আজ তার উপর যেন মল্লিকের একটা অধিকার জন্মে গেছে। তাই ওকে ঢুকতে দেখে বলে,—এসো, এসো। তাই বলছিলাম শুভাকে। এইবার—আমার পথ আমি দেখে নেবো। একটা সঙ্গিনী তো চাই। কি বল? একটা সেবা যত্ন করার লোক—

শুভা হাসবার চেষ্টা করে।

বুড়ো জানে না কি মরীচিকার স্বপ্ন দেখছে সে। সিধু মল্লিকের কাছে দুনিয়াটা অনেক স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। গুরুদেবও সব হাতিয়ে নিতে চেয়েছিল। শুভা ভাবে তার নিজের কথা, দাদুকে দেখবার সময় তার নেই। মেজাজও বদলে গেছে তার। ওদিকে মোহিতও গাড়ি কিনে এইবার সরে পড়বে। দুনিয়ায় কোথাও কেউ আপনজন নেই সিধু মল্লিকের। তাই সেও

নিজের জন্য আজ ব্যবস্থা করতে বাধ্য, বলে ওঠে বেশ সতেজ কণ্ঠে।—আরে বাপু কারো হিংসা, চোখ টাটানিকে আমি ডরাই? লোকের চোখের উপর দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে আমার ঘরের লক্ষ্মী আনবো এইমাসেই।

মনু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সলজ্জ ভঙ্গীতে, সিধু মল্লিক ওকে শোনায় কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে,—তোমার দাদাকে টাকাটা ধারই দিলাম, কিন্তুক একটা ট্যাক্সি। হাজার হোক আপনজন, তাদের দেখতে হবে বৈকি। বসো তুমি। আমি বরং একটু ঘুরে আসি। মোহিত বাড়িতে থাকবে তো?

মনু ঘাড় নাড়ে।

—বোধহয় ফিরেছে এতক্ষণ!

সিধু মল্লিক যাবার সময় শুভাকে বেশ কড়া স্বরেই বলে,—ওসব বেচাল-গিরি, কোন ছেলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি আমি সইবো না। তোমাকে দূর করার ব্যবস্থা এইবার করেছি।

শুভা জবাব দেয়,—ভয় দেখাচ্ছো? ভয় আমি পাই না!

সিধু মল্লিক লাঠি ঠুকে ধমকায়,—ওসব আমার ঢের দেখা আছে, আরে বাপু—মেয়ের মেয়ে! পর পরই। পরের বোঝা আর বইতে পারবো না, ব্যস। তাই বিয়ে দিয়ে বিদেয় করবো। প্রেম,—দুপুরে বাড়ি পালিয়ে প্রেম! যত্তোসব নাটুকেপনা। এসব সইবো না।

বের হয়ে গেল সে। শুভা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বুড়ো বের হয়ে যেতেই শুভা মনোহরের কাছে এগিয়ে এসে বলে,—দেখলে তো কাণ্ডখানা, নিজে এই বয়সে হাবুডুবু খাচ্ছেন, এরা আবার নীতিবাক্য আওড়ান! ছিঃ-ছিঃ!

মনোহর বেশবাস খুলে ফেলে হাসতে থাকে। শুভা আজ বেদনাহত কণ্ঠে বলে,—তুমি হাসছো? এমনি করে থাকা যায় না আর।

মনোহর ওর দিকে চাইল। শুভার সারা মনে একটা কাঠিন্য জাগে। সব বাধা সে মনে মনে উত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়েরা এক জায়গাতে সব দুর্বলতা উত্তীর্ণ হয়ে কঠিন হতে পারে। সে বোধহয় প্রেমের ক্ষেত্রেই।

তাই আজ কঠিন হয়ে উঠেছে শুভা। মনোহরের কাছে এগিয়ে এসে বলে,—সব ঠিক করে ফেলেছি আমি। তোমাকেও রাজী হতে হবে। আমাদের দিন ঠিক চলে যাবে, নিজের যা আছে তাও কম নয়। তুমি চলো।

শুভা এতদিন দাদুর আশ্রয়ে ছিল মাত্র। দাদুর অন্তরের নীচতার যা

পরিচয় পেয়েছে তারপর আর তাকে মানবার কোন তাগিদই সে মন থেকে পায় নি। বলে চলেছে শুভা,—তুমিই আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারো; আমার যা আছে টাকাকড়ি, গহনা; তাও কম নয়। কাশীতে খানতিনেক বাড়িও আছে। একটা ব্যবসা-পাতি করলে দাঁড়াতে পারবে তুমি। আমাদের দিন চলে যাবে। তুমি আমাকে এই অপমান থেকে বাঁচাও মনোহর।

শুভা আজ কান্নাভরা কণ্ঠে ওর কাছে আবেদন জানায়। সেও বাঁচতে চায়। মনোহরের হাতে শুভার প্রকম্প হাতখানা। রাতের আঁধার নেমেছে চারিদিকে। এমনি অন্ধকারের অতলে মনোহরের মনও আজ বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখে। তার শূন্য রিক্ত জীবনে এমনি করে প্রেম আসবে তার সব বর্ণ সুষমা নিয়ে, তার জীবনপাত্র ভরে দেবে কি মাধুর্যে এ কথা কোনদিনই ভাবেনি সে। আজ এ তার বিরাট কিছু পাওয়া। নিজেকে কোনদিন এভাবে দেখেনি। আজ মনে হয় এই পৃথিবীতে বাঁচার আশ্বাস আছে, আছে ভালবাসা। একটা মন আজ অনেক কিছু পেতে চায়, চকিতের জন্য সে লোভী হয়ে ওঠে। এ যেন অন্য কোন মনোহর।

—শুভা!

তবু কি যেন বলতে চায় মনোহর। তার কোন সামাজিক পরিচয় নেই, আশ্রয় নেই। নেহাৎ পথেরই মানুষ সে। কিন্তু প্রেম তাকেও বড় করে তুলেছে। শুভার সামনে তার ঠাঁই অনেক উঁচুতে। বলে শুভা,—সব গুছিয়ে নিচ্ছি। দুপুরেই বেনারসের গাড়িতে বের হবো আমরা। তুমি ষ্টেশনে চলে এসো।

মনোহরের সামনে বিচিত্র কি এক অদৃষ্টের হাতছানি। শুভা ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদছে। মনোহরের কাছে মনে হয় এসব বোধহয় স্বপ্ন। তবু এই স্বপ্ন-জগতের এতটুকু আনন্দ স্বপ্ন তার মনকে কি এক বিচিত্র আলোড়নে আলোড়িত করেছে। তবু সব কথা বলতে চায় সে,—শুভা।

—না-না-না!

শুভা আজ কাঁদছে। সবকথা তার হারিয়ে গেছে।

মনোহর কি ভাবছে। আজই সে লাবুদিকে চিঠি দিয়েছে। কাল না হয় পরশুর মধ্যেই কলকাতায় মোহিতদার ওখানে চলে আসতে। ওদিকের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু সব তার কেমন গোলমাল হয়ে যায়। শুভার কান্না থামে না, তার

জন্য দুঃখ বেদনাবোধ করে মনোহর। শুভারও কেউ নেই। বাবা মাও নেই তার। সব হতাশা তাই কান্নায় প্রকাশ পায়।

—শুভা! কাঁদে না ছিঃ!

মনোহরের বুকে মুখ রেখে কাঁদছে একটি মেয়ে, এইখানেই যেন একটু নির্ভরতা পেতে চায় সে। শুভার মনে আজ একটু স্বপ্ন, বিদ্রোহ করেই জীবনের সব কিছুকে ছিনিয়ে নেবে সে।

তারা ঘর বাঁধবে, সে আর মনোহর।

…মোহিত গুম হয়ে বসে আছে বাসায় ফিরে।

মনোহরের পাত্তা নেই। বোধহয় সে মল্লিকের বাড়িতেই গেছে। একবার এলে আজ সে একহাত দেখে নেবে ওকে। এমনি করে তাকে বিব্রত করবে ভাবে নি মোহিত। আজ মনে হয় ওই ছেলেটার অনেক অত্যাচার সে সহ্য করেছে। পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে আজ কলকাতায় ঠাঁই করে দিয়েছে তাকে। আর সেই মনোহরই তাকে চরম অপমান করেছে। লক্ষ্মীকে সেই-ই বলেছে লাবণ্যর কথা। তার মন বিষিয়ে তুলেছে। তাই লক্ষ্মীও আজ তাকে বাড়িতে পেয়ে চরম অপমান করেছে। তার সেই কঠিন মুখখানা যতই ভেসে ওঠে, মোহিত ততই চটে ওঠে মনোহরের উপর। এসব সে নীরবে সইবে না।

হঠাৎ গাড়ি থামার শব্দে উৎকর্ণ হয় মোহিত। দরজাটা ঠেলে ঢুকছে সিধু মল্লিক স্বয়ং। মোহিত মালিককে তবু আপ্যায়ন করে মনের সেই জ্বালা চেপে,—আসুন। আসুন।

মল্লিকমশাই এদিক ওদিকে চাইছে। সেই ফিল্ম মার্কা ছেলেটাকে না দেখে খুশী হয় মনে মনে। মোহিত সিধু মল্লিককে খবর দেয়,—টাকাটা জমা দিলাম

সিধু মল্লিক যুৎ করে সোফায় বসে বলে,—ভালোই করেছিস। শোন, মন্টুর মত নিলাম। আরে তার আবার মত থাকবে না কেন? পুরুত-ঠাকুরকেও বলেছি। আগামী পরশু মাহেন্দ্রক্ষণ আছে বেলা বারোটায়। ওই সময় মন্টুকে আশীর্বাদ করে যাবো। আর বিয়েটা সামনের সপ্তাহেই সেরে ফেলতে চাই। সব ব্যবস্থা করে ফেলবো।

চমকে ওঠে মোহিত। এখনও সবদিক দিয়ে ও মল্লিকমশাইয়ের কাছে

বাধা। চাকরী ট্যাক্সি সব কিছুই ওর দয়ায়। এতদিন ধরে ওকে যে শুধু খেলিয়েছে এই কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে যে রক্ষা থাকবে না, তা জানে মোহিত।

মামলাবাজ লোক সিধু মল্লিক তার নামে চিটিং কেসই করে দেবে। সব যাবে মোহিতের। পথে দাঁড়াবে এইবার।

সিধু মল্লিক ওর চিন্তা জড়ানো মুখের দিকে চেয়ে বলে,—খরচার কথা ভাবছিস? সে সব ভাবতে হবে না। মোট কথা, ভালো করে উদ্যোগ আয়োজন করবি! নে, টাকা কিছু রাখ।

পকেট থেকে শতখানেক টাকা বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দেয় মল্লিকমশাই।

তার কাজ এগিয়ে গেছে, আর থাকলে যদি কোন ঝগড়া তোলে তাই মল্লিকমশাই উঠে পড়ে বাকী কথাগুলো বলে,—চল্লাম। আশীর্বাদী সার, বিয়ের খরচ পরে হিসাব করে একটা ফর্দ দিবি। তাহলে এই কথাই রইল, পরশু বেলা বারোটায় আমি আশীর্বাদ করতে আসছি। হ্যাঁ, কথাটা গোপন রাখবি।

উঠে পড়ে সিধু মল্লিক। বের হয়ে গেছে সে।

মোহিত চুপ করে বসে ভাবছে। খেলা করতে করতে এমনি জালে নিজের অজানতেই জড়িয়ে পড়বে ভাবতে পারে না সে। আজ নিজের চারিদিকে জাল বুনেছে; ওই সিধু মল্লিককে ঠকাতে গিয়ে সেই জালেই নিজেও জড়িয়ে গেছে। এখন মুক্তির পথ কোনদিকে তা ও বুঝতে পারে না। এসব লোভ করতে গিয়েই বিপদে পড়েছে, মনে হয় তার সামান্য চাকরী নিয়েই খুশী থাকলে ভালো করতো সে। লাবণ্যকেই নিয়ে আসতো, তা নয়, নানা মোহ আর লোভে জড়িয়ে পড়ে তার সামান্য আশ্রয়টুকুই এবার যেতে বসেছে।

তার সব চাল ব্যর্থ হয়ে যাবে। বেশ ছিল আগে, কাজকর্ম করে খাচ্ছিল। ওই বহুরূপী মনোহরকে ভালবেসে আশ্রয় দিয়ে নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। মনোহরকে মনে হয় তার জীবনে একটা গ্রহ।

রাত হয়ে গেছে। মনোহরকে ফিরতে দেখে মোহিত ওর দিকে চাইল। মনোহরের মনেও আজ একটা ছায়া এসে পড়েছে। জীবনে সে কাউকে স্বার্থের জন্য ঠকাতে চায় নি। নিজে শুধু বহুরূপীর নির্দোষ খেলা খেলেছে মাত্র। শুভাকেও ঠকাতে চায় নি কোনদিন। কিন্তু শুভার সেই কাতর আবেদন তার মনকে স্পর্শ করেছে। নিজের মনকে চেনবার চেষ্টা করেছে মনোহর।

এ তার সদ্য-জাগর কোন নোতুন মন, তার লালসা দেখে শিউরে উঠেছে মনোহর। সে চায় শুভার ওই ডাকে সাড়া দিতে। লোভী মন আজ সুখী হতে চায়।

ভালোবাসা!…হাসি আসে মনোহরের; তার মত বহুরূপীর অন্তরে একটা মানুষ আছে যে ভালবাসতে চায়, বুক ভরে পেতে চায় অনেক কিছু। এটা ভেবেই আশ্চর্য হয়েছে সে।

কিন্তু সে জানে এ অধিকার তার নেই। এ ভালবাসা নয়, প্রবঞ্চনারই নামমাত্র। তাতে তার অন্তর সায় দেয় না।

মোহিতের কথায় ওর দিকে চাইল মনোহর। বেশ কড়া স্বরে কথা বলে মোহিত।—কি বলেছিস লক্ষ্মীকে?

মনোহর হাসতে থাকে। ভালবাসা! ওদের ভালবাসা যে এত ঠুনকো তা মনে করেই হাসি পায়।—কেন?

—সে এসেছিল, একটি মেয়েকে দেখে গেছে। তার নাম বলেছে লাবণ্য! কেন যা তা বলেছিস ওকে?

মোহিত গর্জে উঠেছে। অসহ্য রাগে ফেটে পড়ে। উত্তেজনার আবেগে উঠে এসে মনোহরের গালে একটা চড় কষে দেয়। মনোহর চমকে ওঠে। মোহিত গর্জাচ্ছে,—এইসব ধ্যাষ্টামো তোর সইবো?

—দাদা! মনোহর ভাবতে পারে না মোহিত তাকে মারবে।

মোহিত বলে,—থাম! কে তোর দাদা! লাথি মেরে পথের মানুষকে পথেই বের করে দোব। খুন করে ফেলবো তোকে!

মনোহরের সামনে মোহিতের সত্যকার রূপটাই পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। লোভী স্বার্থপর নীচ একটা মানুষ। মনোহরও চিনতে পারেনি ওকে। ওর সেই লোভকে সে বাধা দিয়েছে; তাই আজ হিংস্র হয়ে উঠেছে মোহিত। মনোহর ওই লোভী শয়তানের জন্য এইসব করেছে। আজ গাড়ির মালিক করেছে তাকে। মোহিত গর্জে ওঠে,—জবাব দে,—নয়তো খুনই করবো।

মনোহরের কথা বলবার সামর্থ্য নেই—সে অবাক হয়ে গেছে।

মোহিত লাফ দিয়ে উঠে এগিয়ে আসে।

ওর গলাটা টিপে ধরেছে মোহিত। কিভাবে ছেড়ে দিল। রাগে কাঁপছে মোহিত চোট খাওয়া পশুর মত।

মনোহর চমকে উঠেছে। তার কাছে মনে হয় মানুষের এই কদর্য রূপটাও

দেখার দরকার ছিল। বহুরূপের এও একটা প্রকৃত রূপ। স্বার্থে ঘা লাগলে নিমেষের মধ্যে আমূল বদলে জানোয়ার হয়ে ওঠে মানুষ। শোনায় মনোহর,—মোহিতদা! চলেই আমি যেতাম। এখুনিই চলে যেতাম। গেলে তোমার কি হতো তা ভালোই জানো! সিধু মল্লিক তোমায় চিটিং কেসে ফেলে ঘানি টানাবে। রাজী থাকো আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

মোহিত চমকে ওঠে। কথাটা সত্যি। তবু গজ গজ করে,—তোর জন্যেই তো এইসব ঝামেলায় পড়লাম।

মনোহর জবাব দেয় পরিষ্কার কণ্ঠে,—গাড়ি, মাইনে, এই বাড়ি সোফা কোচ আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না নিশ্চয়। সেগুলো তোমারই থাকবে। নিজের স্বার্থেই এসব করিনি।

ফোঁস করে ওঠে মোহিত,—এখন এসব যে শাল হয়ে উঠেছে। ওদিকে সিধু মল্লিক বলে তারও আশীর্বাদ হবে। এখন যাই কোথায়?

মনোহর আশ্বাস দেয়,—তোমার কোন ভয় নেই। বেরুবার পথও আমি করে রেখেছি।

মনোহর কি ভাবছে। তার মাথায় প্যাঁচটা আসে,—আমাকেও দেখেছে সিধু মল্লিক, পরিচয় দিয়েছিলাম বোম্বেতে থাকি, মোহিতদার গাঁয়ের ছেলে। সেখানে ফিল্মে নামি।

মোহিত বিরক্ত হয় আরও।—কৃতার্থ করেছো। এইবার?

মোহিত কথাটা ভেবে চমকে ওঠে। সব কথাই প্রকাশ হয়ে পড়বে। সিধু মল্লিককে ঠকিয়েছে মোহিত। মনোহরের আর কি! সে ব্যাটার তো চাল চুলো নেই, রাস্তার মানুষ আবার রাস্তাতেই ফিরে যাবে। কিন্তু মোহিতকে ছাড়বে না মল্লিকমশাই, থানা-পুলিশ-কোর্ট ঘর করিয়ে ছাড়বে।

মনোহরের উপরই রাগটা জমে মোহিতের। বলে ওঠে,—নিজের আবার ওই রূপ দেখাতে গেলে কেন? এখন ঠ্যালা সামলাও। ওদিকে মনু সেজে তো মন ভুলিয়েছে বুড়োর, তাকেই বা কি করে থামাই। এদিকে আবার নিজেও তার সামনে সশরীরে হাজির হয়েছো। পরিচয় দিয়েছো ফিলিমের হিরো—

মনোহর আজ তার বেরুবার পথ ঠিক করে নিয়েছে। এখানে আর থাকা যায় না, এতদিন যেভাবে ছিল সেই বাঁধনটুকু মোহিত নির্মম আঘাতে ছিঁড়ে দিয়েছে।

মোহিতকেও চিনেছে মনোহর। চিনেছে তার এই বাইরের রূপের আড়ালে আসল রূপটিকে, তাকে আর মেনে নিতে পারে না।

মোহিত ভয় পেয়েছে,—আমাকে গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়ে পালাবিই তো! নইলে শত্রু কাকে বলে?

মনোহর জবাব দেয়,—কোন ভয় নেই তোমার। বেরুবার সব পথ করে দোব, এখান থেকে যাবার আগে তোমাকে জড়িয়ে যাবো না।

মোহিত মুখ বিকৃত করে বিরক্তিতে,—দয়া করে তাই করো।

মনোহর তবু মোহিতকে আজ ও কথাটা বলে,—কিন্তু একটা অনুরোধ, লাবুদিকে তুমি ফিরিয়ো না। তোমার সব হয়েছে—তোমার পথ চেয়ে আজও সে বসে আছে। হয়তো এখানেও ছুটে আসবে। আমার মত তাকে রাস্তায় বের করে দিও না। তাকে সুখী করো—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

মোহিত ওর কথাগুলো শুনেছে, মনে হয় মনোহর মাঝে মাঝে ঠিক কথাই বলে। মনোহর বলে চলেছে,—তোমার মনু আর এই মনোহর দু'জনের কেউ এবাড়িতে থাকবে না, তোমার সিধু মল্লিককে কথাটা বলো।

মোহিত কথাটা শুনে অবাক হয়। মনোহর এত সহজে যে সমস্যাটা সমাধান করে দেবে বুঝতে পারেনি। খুশীতে ভরে ওঠে মোহিতের মুখ। সব ঠিক হয়ে যাবে। মনোহর সরে গেল ওঘরে। ঘুম আসে না তার। রাত হয়েছে।

মোহিতকে আজ এইভাবে দেখবে কল্পনা করেনি সে। মনোহরের চোখ ফেটে জল আসে। আজ রাত্রে খাওয়া হয় না। কেউ তাকে খেতে বলেনি। কলসীর জলই গ্লাস দু'য়েক খেয়ে শুয়ে পড়ে।

জেগে আছে মনোহর। চোখের সামনে বারবার শুভার সেই কান্নাভরা দু'চোখ ভেসে ওঠে। জীবনে এমনি একটি সুর সে শোনেনি। কিন্তু সে হত-দরিদ্র পথের মানুষ। তার জন্য কোথাও কোন আশ্রয় নেই, থাকতে পারে না।

মোহিতের ভালবাসা মিথ্যা। লক্ষ্মীর সঙ্গে ওর মন দেওয়া নেওয়াও তুচ্ছতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। সিধু মল্লিকের প্রেম শুধু চোখের নেশাই। চারিদিকে যা দেখছে তার মূলে সত্য কতটুকু!

দুনিয়ার কোথাও বোধহয় কোন সত্য নেই। এই বুকভরা অসত্যের মাঝে শুভার ভালবাসাও গ্লানি আর বেদনায় মলিন হয়ে উঠবে। তাকেও অপবিত্র করবে সে।

দু'দিন পরই তাকে ভুলে যাবে শুভা, আবার সহজভাবেই জীবনকে মেনে নেবে। জীবনের বৈচিত্র্যের মাঝে হারিয়ে ফেলবে নিজেকে।

আজকের ক্ষণিক ভুল তার জীবনকে বেদনার জ্বালায় চিরদিনের জন্য ভরে তুলুক তা চায় না মনোহর। সেই কথাই জানিয়ে দেবে তাকে।

মনোহর শুভার এ দান নিতে পারে না। সাধ্য তার নেই।

রাত্রি হয়ে আসছে। তমসার মাঝে আকাশের বুকে জাগর তারাগুলো কি দুঃসহ বেদনায় কাঁপছে। বাতাসে তাই জাগে কান্নার সুর।

মনোহরের মনে হয় ক'টা মাস কোনদিকে কেটে গেল। কলকাতার দিন তার শেষ হয়েছে। মনটা অকারণেই বেদনাময় হয়ে ওঠে।

সকালে মোহিতের ঘুম ভাঙে।

দেখে ওপাশের ঘরে মনোহর নেই। কাল রাত্রে তাকে মারধোর করে নিজেরই মন খারাপ করে।

এসব না করলে পারতো। আজ ঠাণ্ডা মাথায় ভাবে মোহিত। মনোহর চলে গেছে—কিছুই নিয়ে যায়নি সে। শুধু তার সাজের বাক্সটাই নিয়ে গেছে, আর নিয়েছে তার ময়লা সেই ছেঁড়া সতরঞ্চিখানা। ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না মোহিত। এখানে তবু আরামেই ছিল, পথে পথে ঘুরতো হয়তো একমুঠো অন্নের জন্য, টাকাও পেতো বেশ কিছু। কিন্তু এমনি নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে এক কথাতেই ছেলেটা আবার পথের ভিখারীর পর্যায়ে নেমে যেতে পারবে তা ভাবেনি মোহিত। মনে হয় ওদের ধরা যায় না, ওরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাই কোনকিছুই ওদের মন ভোলাতে পারে না। ওরা সব ফেলে পালায় আর হারিয়ে যায়।

ছেলেটার কথা মনে পড়ে। আজ মোহিত ওকে নতুন করে চেনে।

নিজেদের জন্য সে কিছুই করেনি। এদিক ওদিক খুঁজতে বের হলো কতকগুলো চিঠি আর মনিঅর্ডারের রসিদ নিয়ে। প্রতি মাসে মোহিতই যেন লাবণ্যকে টাকা পাঠাচ্ছে। সেগুলো লাবণ্যের সই বুকে নিয়ে ফিরে এসেছে।

মোহিত স্তব্ধ হয়ে গেছে। লক্ষ্মীর অপমান সে ভোলেনি। লোভই করে-ছিল সে।

জীবনে লোভ আর লালসায় পড়ে সে মনোহরকে চরম অপমান করেছে, তাকে ও চিনতে পারেনি।

চারিদিকে খোঁজ করে, কিন্তু মনোহর যেন কোন শূন্যে কর্পূরের মত উবে

গেছে। কোথাও তার কোন চিহ্ন নেই। এদিকে কালই মল্লিকমশাইয়ের আসার কথা।

ভাবনায় পড়েছে মোহিত। তাকে বিপদ থেকে বের হতেই হবে।

মনোহরের কথাগুলো মনে পড়ে। সে বের হবার পথও বাত্‌লে দিয়ে গেছে। তবু সিধু মল্লিককে কথাগুলো জানাতে হবে মোহিতকে।

একজন তার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে, সে শুভা। মনে মনে সে তৈরী হয়েছে। আজই চলে যাবে সে। দাদুকে ও কাল থেকেই ব্যস্ত দেখছে বুড়ো পুরুত-ঠাকুরকে নিয়ে কি সব করে চলেছে।...নিজেই কি সব কেনা-কাটাও করেছে দাদু। শুভাও তার নিজের গোছগাছ করে নিয়েছে।

...শুভার সঙ্গে একবার দেখা হতে তেমন কথাবার্তাও বলে না। শুভাও এড়িয়ে যায় দাদুকে। আজ তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদের একটা পাঁচিল গড়ে উঠেছে।

বেলা হয়ে আসছে। আজই শুভা চলে যাবে কাশীতে। দু'জনে চলেছে এখান থেকে দূরে শান্ত একটি পরিবেশে। সে আর মনোহর।

...বেলা বেড়ে চলে।

দাদু বের হয়ে গেল। আজ সাজগোজও তার বিচিত্র। গরদের পাঞ্জাবি, কোচানো ধুতি, পায়ে পামসুতে বুড়োকে মানিয়েছে চমৎকার। শুভা ফিরেও চাইল না।

বুড়ো সিধু মল্লিক তাকে শুনিয়ে বলে,—হিংসে, হিংসেতেই জ্বলে ম'ল সবাই! হবে না? আমি যে সকলের ভাতে হাত দিতে যাচ্ছি।

..বের হয়ে গেল সিধু মল্লিক। এই সুযোগই খুঁজছিল শুভা। বুড়ো বে.. হয়ে যাবার পরই সেও এ বাড়ি থেকে চলে যাবার আয়োজন করছে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাওড়া স্টেশনে ঘড়ির নীচে তার পথ চে দাঁড়িয়ে আছে মনোহর। তাকে দেখামাত্র হেসে উঠবে, মিষ্টি একটু হাসি

ট্রেনখানা ছাড়লে তারা গুছিয়ে বসবে। চলন্ত ট্রেনের দু'পাশে ফুটে উঠে ধান ক্ষেত, ছোট্ট গ্রামসীমা। তারা এগিয়ে যাবে এই কোলাহলমুখ মহানগরীকে পিছনে ফেলে তাদের স্বপ্নে গড়া দুনিয়ার দিকে।

…হঠাৎ বুড়ি-ঝিকে একটা চিঠি নিয়ে আসতে দেখে ওর দিকে চাইল শুভা। তার নামেরই চিঠি, হাত পেতে নিয়ে সেখানা খুলে পড়তে থাকে। চমকে ওঠে শুভা। তার পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। বিশ্বাসই করতে পারে না সে। সব আশা, সব স্বপ্ন তার ব্যর্থ হয়ে যায়।

মনোহরের চিঠি! মনোহরের উপর তার অনেক আশা, তার কুমারী মন সেই বিচিত্র তরুণকে নিঃশেষে ভালবেসেছিল। তাকে সঙ্গী করেই সে জীবনের স্রোতে ভাসতে চেয়েছিল।

কিন্তু মনোহর তাকে নিদারুণভাবে ব্যর্থ করেছে। সে জানিয়েছে দেবতার পূজার ফুল শুভা। দেবতার পূজার সেই ফুল দিয়ে একটা অমানুষকে পূজা করা যায় না।

শুভার যোগ্য সে নয়। শুভা একটা মস্ত ভুলই করতে চলেছিল, সে নিজেই তাই তার জীবন থেকে সরে গেল।—শুভা তাকে ভুলে যাবে, শান্তি পাবে জীবনে।

শুভার দু'চোখে জল নামে। তার জীবনের একটি পরম সম্পদ হেলায় হারিয়ে যাবার বেদনায় কাঁদছে সে।

তবু বের হয়ে পড়ে। মনোহরের সামনে দাঁড়িয়েই সে এই কথাগুলো সত্য কিনা প্রশ্ন করবে। শুভা কি দুর্বার আকর্ষণে বের হয়ে পড়ে। জানে—মনোহর তাকে ফেরাতে পারবে না। তার বাড়ির দিকে চলেছে শুভা।

সিধু মল্লিক গাড়ি থেকে নেমে হৈ হৈ করে এগিয়ে যায়। মোহিত ওকে নামতে দেখেছে গাড়ি থেকে।

বুড়ো পুরোহিত আবার চোখে দেখে না। তাকে ধরে নিয়ে চলেছে সিধু মল্লিকের একজন কর্মচারী। পিছনে আর একজন নিয়ে চলেছে সন্দেশের বাক্স, ফল, ধান, দূর্বা, ফুল। পিছনে আর একজন চলেছে দই-এর হাঁড়ি আর একটা নধর রুই মাছ নিয়ে, তাতে আবার সিন্দুর লাগানো! সিধু মল্লিকের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই।

ঘরে ঢুকতেই মোহিত সামনে এসে দাঁড়াল। উস্কো-খুস্কো চেহারা, চোখমুখ বসে গেছে। ওপাশে একজন পুলিশের লোক, মোহিত ডায়েরীও করিয়েছে।

তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। চোখে-মুখে সেই ভয় আর অপমানের কালোছায়া।

—কইরে মোহিত? সব আয়োজন হয়ে গেছে তো? দেখ বাবা, অমৃত-

যোগ তো অল্পক্ষণের জন্যই, এসো এসো ঠাকুরমশাই। ওরে ওগুলো সব এনে রাখ।

সিধু মল্লিককে শোভাযাত্রা করে ঘরে ঢুকতে দেখেই মোহিত কঁকিয়ে উঠে একেবারে টাউরি খেয়ে সিধু মল্লিকের পায়ের উপরই আছাড় খেয়ে পড়ে। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে মোহিত।

—আমাকে মেরে ফেলুন মল্লিকমশাই, এ কালোমুখ আর আপনাকে দেখাবার সাহস আমার নেই। এই ছিল আমার কপালে? এর আগে মরণও হল না?

চমকে ওঠে সিধু মল্লিক। মোহিত মেজেতে কপাল ঠুকছে।

ছানিপড়া চোখ নিয়ে পুরুত এগিয়ে এসে বলে,—এতো মহাভাগ্য। পাত্রী নিয়ে এসো। কই, গন্ধ পুষ্প দাও।

…এতৎ দধিপতয়ে গন্ধপুষ্পং লগ্নপতি গণেশায় নমঃ। সালঙ্কারা কন্যাং—পুরোহিত ফুল চন্দন নিয়ে আন্দাজে পুলিশ অফিসারের মাথাতেই ছুঁড়তে থাকে। লাফ দিয়ে উঠে পড়েন ভদ্রলোক।

—কি করছেন মশাই? চোখেও দেখেন না?

থেমে গেল পুরোহিত ওই পুরুষ কণ্ঠের গর্জনে।

মোহিত কান্না জড়ানো স্বরে বলে চলেছে,—এতটুকু থেকে মানুষ করলাম, মেয়ে কিনা আজ উড়ে গেল। বলে, ফিলিম করতে যাচ্ছি বোম্বাই-এ। সেই গ্রামের ছোঁড়াটার সঙ্গে এত ভাব—তখন জানি না যে সর্বনাশ করবে সেই-ই। একেবারে গায়েব হয়ে গেল!

সিধু মল্লিকের চোখের সামনে সেদিনের দেখা লক্কা-মার্কা ছেলেটার কথা মনে পড়ে। গর্জে ওঠে মল্লিকমশাই,—তখনই জানতাম এমনি একটা কিছু হবে। যদি টেরই পেয়েছিলি তবে তাকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলি কেন? শয়তান—

মোহিত বুক চাপড়াতে থাকে।—যা বলবেন বলুন। কালই থানায় ডায়েরী করেছি, চারিদিকে টেলিগ্রাম করেছি।

মল্লিকমশাই গর্জে ওঠে,—কিস্যু হবে না। তারা উড়েছে। এখন ধরা দেবে না। ছিঃ ছিঃ। আমার এতগুলো টাকা জলে গেল!—একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়ে ছাড়ল। তুই-ই এসবের মূল,—তোকে কোর্টে নিয়ে যাবো! জেল খাটাবো—

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে শুভাকে ঢুকতে দেখে মল্লিকমশাই ওর দিকে চাইল। শুভা খুঁজতে এসেছে মনোহরকে। কিন্তু তাদের বাড়িতেই সেজে-গুজে দাদু আর পুরোহিতকে দেখবে তা ভাবে নি। মোহিতও রয়েছে; শুভা বেশ বুঝতে পারে মনোহর এখানে নেই। দাদুর গর্জন শুনেছে বাইরে থেকে। শুভা জেনেছে মনোহরকে কেন্দ্র করেই এসব চলেছে। সিধু মল্লিক শুভাকে দেখে ভেবেছে সেই-ই এ বিয়েতে অমত করেছিল। বোধহয় মনুর চলে যাবার ব্যাপারে তারও হাত আছে। সিধু মল্লিক তাই গর্জন করে,—তুইও কি মজা দেখতে এসেছিস এখানে?

—দিদিমণি নেই? শুভা মনোহরের কথাটা চেপে যায়।

সিধু মল্লিক তীব্রস্বরে জবাব দেয়,—দিদিমণি মনের মানুষ পাকড়ে ফিলিম্ করতে গেছে। যত্তোসব! এ্যাই বুধনা, ফেক্ দেও উসব সামান:

আশীর্বাদ করতে মালা ফুল চন্দনগুলো এনেছিল, মেঝেতে নামিয়ে রেখেছিল ফল, মিষ্টি। সেগুলো ছত্রাকার করে ছিটিয়ে ফেলতে থাকে। কতক ঘরে পড়ল কতক পড়ল জানলার বাইরে রাস্তায়।

লাবণ্য এবার মনস্থির করে ফেলেছে। মধু মুহুরীও জানে না মেয়ের মনের খবর। লাবণ্যর মাও সায় দেয় মেয়ের কথায়। মনোহরের চিঠিখানা মাও দেখেছে, বলে,—তুই চলে যা বাছা। এ ডাক এড়াতে বলবো না তোকে।

লাবণ্য অনেক আশা নিয়েই কলকাতায় আসছে। আজ আর তাকে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে না। এইখানেই সে তার ঘর বাঁধবে। মোহিত তাকে ভোলে নি, মনোহরও রয়েছে। ছোট ভাই-এর মত সেই ছেলেটি তাকে সব দিক দিয়ে সাহায্য করেছে।

দিনবেলাবেলিই কলকাতায় এসে পৌছেছে লাবণ্য। লিখেছে শিয়ালদ ষ্টেশন থেকে বেশী দূরের পথ নয়। লাবণ্য নিজেই একটা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে। দুপুরের রোদ তখনও ম্লান হয় নি। লাবণ্যর সুন্দর মুখে তারই মিষ্টি আবেশ। মনের আশা আর আনন্দ তার মুখশ্রীকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

বাড়িটা চিনতেও দেরী হয় না। গাড়োয়ানই দেখে বলে,—এহি মকান্ জি—

লাবণ্য গাড়ি থেকে নেমে নোতুন জায়গাটার এদিক ওদিক দেখছে। দরজাটা খোলা, ঘরে কান্না রয়েছেন। হঠাৎ লাবণ্যকে দেখতে পেয়েছে মোহিত। সেও চমকে ওঠে। একা অসহায় একটি মানুষ, আজ লাবণ্যকে দেখে সে মনে সাহস ফিরে পায়। এগিয়ে আসে মোহিত। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, —তুমি !

—মনোহরের খবর পেলাম, চলে এলাম তাই।

লাবণ্য এসে প্রণাম করে মোহিতকে। বয়োজ্যেষ্ঠ মল্লিকমশাইকে দেখে তাকেও প্রণাম করে লাবণ্য।

গণ্ডগোল থেমে গেছে, অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে মল্লিক-মশাই। ওর মিষ্টি মুখখানা ভাল লাগে তার।

—কে রে মোহিত ?

মোহিত সলজ্জকণ্ঠে বলে,—আমার বউ হবে, সংবাদ শুনে সেও ছুটে এসেছে।

মল্লিকমশাইও ভুলটা বুঝতে পেরেছে। তার বিয়ের বয়স নেই। ওদের দেখে কথাটা মনে হয়।

কি ভেবে বলে ওঠে পুরোহিতকে মল্লিকমশাই,—ওহে ভটচাজ, আমার না হয় না হোল—মোহিতের বৌকেও তো আশীর্বাদ করতে পারি। যাকৃগে যা হবার হয়ে গেছে। তা মোহিত ভালোই করেছিস ওকে এনে। দাও, ধানদুব্বো দিই ! তবু একটা শুভ কাজ তো করে গেলাম।

মোহিত যেন বিশ্বাসই করতে পারে না।

—দাদু ! অবাক হয় শুভা।

মল্লিকমশাই হাসছে।

—দেখলাম বিয়ে করে ঠকার থেকে, ধরে ধরে বিয়ে দিয়ে জব্দ করাই এখন দরকার।

শুভাও দাদুর ব্যবহারে খুশী হয়েছে। বলে,—তাহলে বিয়ে করার সখ মিটেছে ?

হাসে সিধু মল্লিক,—ছ্যা-ছ্যা ! ও কাজ মানুষে করে ? তাও এই বয়সে ? তাই এবার সব ক'টাকেই দূর করবো। এইবার তোর পালা। তোকে বিয়ে দিয়ে তবে থামবো।

শুভা চুপ করে থাকে। মনোহরকে মনে পড়ে। সিধু মল্লিক বলে,—সব

টাইট করে দোব এইবার। বলতো ভটচাজ্—মন্তরটা বলো। তারপর চল একবার সোজা দত্তবাগানে।

শুভা চুপ করে থাকে। আজ তার প্রতিবাদ করার শক্তি নেই।

মোহিত অবাক হয়ে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে।

শুভাও অবাক হয়েছে। মানুষ কি চায় তা সেই-ই হয়তো জানে না। হঠাৎ আবিষ্কার করে কি পরম মুহূর্তে সেই খবর।

তবু মনে পড়ে হারিয়ে যাওয়া একজনের কথা।

এই উৎসবে মনোহর নেই। লাবণ্যও তার কথা বার বার মনে করে। মোহিত মনোহরের কোন খবরই জানে না। শুভাও জানে না।

উৎসব শেষে বের হয়ে আসছে সিধু মল্লিক, শুভা; পিছনে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে এসেছে মোহিত।

...ফুটপাথের ওপাশের এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে সন্দেশের বাক্স, দু' একটা ফল—কিসমিস ইত্যাদি। একটা পাগলা ময়লা পোষাক দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেছে, ফুটপাথ থেকে সেগুলো কুড়িয়ে চলেছিল। হঠাৎ ওদের গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায়।—একটি পয়সা। একটা দশ নয়া—

হাসছে পাগল আপন খেয়ালেই। মল্লিকমশাই সরে গেল। শুভাও ওর দিকে একবার চেয়ে একটি সিকি ব্যাগ থেকে বের করে ছুঁড়ে দেয়।

পাগলা হাসছে। শুভা একবার চাইল মাত্র!

গাড়িখানা বের হয়ে গেল ওদের নিয়ে।

মোহিতকে ফাঁকি দিতে পারেনি মনোহর। পাগলার হাতটা ধরেছে মোহিত। আবেগ কম্পিত স্বরে ডাকে,—মনোহর। তুই!

চমকে ওঠে পাগলা। দু'চোখে তার হাসির আভা। মনোহর ওর দিকে চাইল। মোহিত বলে,—ঘরে চল। লাবু এসেছে।

মনোহর জবাব দেয়,—পথের মানুষের পথে থাকাই ভালো মোহিতদা, ঘরে গেলে বিপদই বাড়ে। তোমরা সুখী হও। তাতেই খুশী।

মোহিত অবাক হয় ওর কথায়। ওর কণ্ঠস্বরে কোথায় সারা মনের বেদনা ঝরে পড়ে।

মোহিত বলে,—তুই! তুই কোথায় যাবি?

—বহুরূপী সেজে সেজে নিজের আসল রূপটাই হারিয়ে ফেলেছি দাদা, ঘরে তাই ঠাঁই হল না। কি চাই তা-ও জানলাম না। আমরা তাই

ঘরবাদী পথের মানুষ। নিজেকে হারিয়ে সে পথে পথে শুধু খুঁজেই বেড়ায়। তাই পথই আমার সব।

মোহিত বলে,—মনোহর!

মনোহর ওর কথার জবাব দিল না। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বের হয়ে গেল। মোহিতের মনে হয় ও যেন অনেক—অনেক বড়। ছোট্ট ঘরের চেয়ে অনেক বড়। ওদের ফেরানো যায় না। পথের মনোহর পথেই আবার রূপবদলের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

তবু ঘরছাড়া ওই পথের মানুষগুলোর জন্য জল আসে মোহিতের চোখে।

মনোহর আর ফেরেনি। দুনিয়ার রূপের হাটে সে বোধহয় হারিয়ে গেছে।